প্রথম প্রকাশ —১৩৫৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক ঃ
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান
গভীর শ্রদ্ধাস্পদেষু

শব্দ।

শব্দের পর শব্দ।

শব্দের পর শব্দের পর শব্দ।

থামো।

ফের গোড়া থেকে শুরু করো।

শব্দ।

না। আরও গোড়া থেকে।

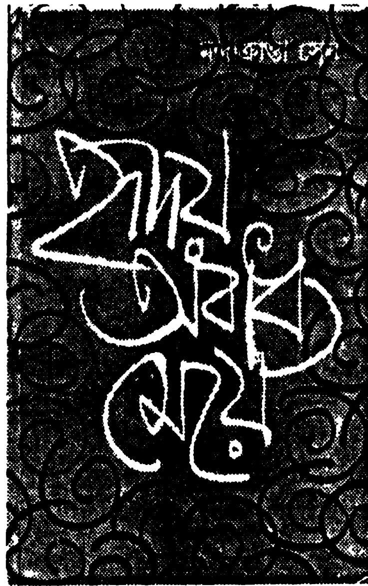
ধ্বনি।

ধ্বনির ভেতরে ধ্বনি।

ধ্বনির ভেতরে ধ্বনির ভেতরে ধ্বনি।

কী পেলে?

গ্রন্থসূচি



হৃদয় অবাধ্য মেয়ে

সূচি

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
ওকে কোনও পড়া বুঝিও না
বইখাতা ছিঁড়ে একশা, থুতু দিয়ে ঘষে
মুছে ফেলছে গাঢ় বিধিলিপি।
নীল ব্যাকরণের পাতায়
লিখে রাখছে ছেলেদের নাম...
এমনকী, ছবিও!

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
তাকে কী শাস্তি দেবে, দিও

বাগানী

রক্তজবার গোড়ায় খুঁড়ছি মাটি
তোমার মন কি মাটির ভিতরে আছে?
আমার জবা যে আপাতত চারাগাছ
কিছু বড় হোক, যাব যুবকের কাছে।

রক্তজবার গোড়ায় ঢালছি জল
জলের মতোন সমতল হোক প্রাণ
রক্তজবা যে চলল যুবক হতে
ওর যৌবনে আমারও কি সম্মান?

রক্তজবার পাপড়ি দেখব কবে
কবে ছুঁতে পাব গভীর কোমল চোখ
মাটি খুঁড়ে যাই, জল ঢেলে যাই আমি,
আমার বালক আমার যুবক হোক।

গুহাচিত্র নও

তুমি কোনও গুহাচিত্র নও
তাই উঠে আসো জানলার গ্রিলে
যদিও তোমার মুখে প্রাচীন মেঘের ধ্বংসস্তূপ
ওই মেঘে বৃষ্টি নেই বলে
জানলায় ভেসে থাকো বিমর্ষ শুষ্ক জলবায়ু।
তোমার কপাল জুড়ে
সমতলে প্রথম শস্যের গন্ধ
লোভনীয় ঝলসানো পশু, পাখি, সৎ উপার্জন
কিছু নেই, ছিল শুধু, দীর্ঘ সে অতীত,
চোখের সমস্ত জল চলে গেছে সিন্ধু ও নীলে।
আরও কী কী যেন অভিজাত স্রোত
তুমি সেই জলবাহ নও

ধুলোর শরীর নিয়ে বসে আছ আমার শিয়রে
জানলায় জানলায় টাঙিয়ে রেখেছ তৃষ্ণা,
কেন শুধু আমারি জানলায়?

দুটো একটা সভ্যতায় দেখা হয়েছিল
যদিও কখনও কোনও নাম জানা হয়নি আমার
তুমি সেই বিখ্যাত গুহাচিত্র নও
শুধু তার কেমন আদল

তোমার ডেনিম শার্ট তারও চেয়ে অনেক পুরনো..

নির্জন

সে নিছক জল আর জল
কতকাল ভালো লাগে এমন অতল
হঠাৎ নতুন করে একা একা বোধ হলো আজ
আঁকলাম কাঠের জাহাজ।

জাহাজে মাস্তুল ছিল কি না
মনে করে বলতে পারছি না
বোধহয় ছিল না ভালো জাহাজের যা যা থাকে সব
শুধু একটা হীন অবয়ব।

চারদিকে জল শুধু জল
দিগ্‌ভ্রম হচ্ছেই কেবল;
আকাশেও অন্ধকার, তারাদের দোকানপসার
জমেনি তেমন করে, মেঘের ছাউনিমাত্র সার।

কাঠের জাহাজ ডুবে যাবে
ডুবোজাহাজের স্মৃতি তোমাকে কাঁদাবে?
অন্ধকারে হয়ে ছিলে পর
কালকে তুমিও হবে পরিত্যক্ত ভাঙা বাতিঘর।

সবুজ, ধূসর

সবুজ বাড়ি

তোমার সবুজ বাড়ি, সবুজ বাড়ির চারপাশে
অনেক বছর ধরে জলের সবুজ গন্ধ ভাসে
তোমার আপত্তি নেই, মনোযোগও নেই
একা কোনও নদী ছিল ঘরের সামনেই।

সবুজ উদাস বাড়ি, পর্ণমোচী বাগান পেরিয়ে
যাওয়া আসা করো রোজ ধুলোপায়ে
ধুলো মুখে নিয়ে
কী হবে! হঠাৎ দ্যাখো বাড়ি ফিরে যদি
তোমার উঠোনে বসে চুলখোলা নদী!

ধূসর পাঞ্জাবি

ধূসর পাঞ্জাবি মেঘলা পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি
মেঘ নামায়
এখনই রোদ ছিল, লজ্জাবোধ ছিল, হঠাৎ ঝড় এল
আকাঙ্ক্ষায়
কৃষ্ণচূড়া গাছে বৃষ্টি নেমেছিল, উষ্ণজমি থেকে
তীব্র ভাপ
আমার বুকে এল, তোমার মুখে এল, গভীর সুখে এল
প্রবল কাঁপ
ধূসর পাঞ্জাবি মেঘলা পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি
বোতামহীন
হঠাৎ কী যে হলো আকাশ নীচে এল অথৈ ভিজে গেল
বর্ষাদিন।

কোনও এক বাগানের কথা

নিত্যদিন জল দিতে এসে
নিত্যদিন ফিরে যাও শুকনো ডালপালা জড়ো করে
কতটুকু সরল আগুনে
তোমার ও-অন্ন রাঁধো, মালী?

আমাকে রোদ্দুর দাও রোজ
নিয়মিত মৃৎকলসে জল দাও সকাল বিকেল
নিয়মিত হিসেবি সোহাগ
নই তো আমি মন্দকপালী।

ঝরাপাতা কতদিন নেবে?
আমার সবুজ দ্যাখো, এই সব সবুজ তোমার,
নিকোনো উনুনে ছাই, আমি
রোজ রোজ দেব না জ্বালানি।

শিকড় গভীর হয়ে গেছে
তুমি ভাবো শিকড়ের টানে আছে সংসারের মাটি...
উপড়ে তুলে এই গৃহস্থালী
চলে যাব বাগানপালানী।

সম্ভবত সে-কারণে

এইসব মুহূর্তেরা এত তীব্র, আমি ভালো নেই
ভালো নেই এ মুহূর্তে, যতক্ষণ তুমি আশেপাশে
ছড়িয়ে রেখেছ হাসি, দৃষ্টিসোনা, তোমার নিঃশ্বাসে
ছাতিমের চেনা বাস, সম্ভবত সেই কারণেই...

সম্ভবত সেইজন্য উঠে আসি ভীত পরিত্যাগে
কবিতার খাতা ছেড়ে, তোমার মায়াবী শব্দময়

তীরগুলি এইবার বিঁধে যেতে পারে মনে হয়
আরও কত মনোহর তীর আছে ঐ কাঁধব্যাগে?

ছড়িয়ে রেখেছ চুল কপালের কাছে অগোছালো,
এ কেমন বদভ্যাস সহজেই মথিত হবার
অপূর্ব! অসাধারণ! একই কথা বললে কতবার
এ সমস্ত ভালো নয়! সম্ভবত সে-কারণে ভালো..

অর্জুন কৃষ্ণচূড়া কথা

অর্জুনগাছ একা ছিল ঐ মাঠে
আর্যপুরুষ—আভিজাত্যের দম্ভ
নতজানু হলো সব গাছ তার কাছে
এইটুকু শুধু আরম্ভ কাহিনীর॥
কোথা থেকে এল কৃষ্ণচূড়ার বীজ
যুবতী হলো সে কয়েকবছর পরে
সাঁওতালি মেয়ে, খোঁপায় তীব্র লাল
অর্জুন তাকে চাইল আপন করে॥
নতজানু হবে এমন মেয়ে সে নয়,
বসন্তে সে তো একাই নিজেই সাজে,
আর্যপুরুষে আসক্তি নেই তার
ব্যস্ত আছে সে ফুল ফোটানোর কাজে॥
খোঁপা থেকে খসে গতরাত্রির ফুল
ঝিরঝিরে পাতা পোশাক বুনেছে তার
অর্জুন, সে যে আর্যপুরুষ! ভাবে—
সব সুন্দরে একা তার অধিকার॥
অর্জুনগাছ চেয়ে দ্যাখে দূর থেকে
কৃষ্ণচূড়ার হৃদয় ঝরছে রোজ,
রূপ দেখে তার ধাঁধায় দু'খানি চোখ
ভাবে, কবে পাবে ঐ হৃদয়ের খোঁজ॥

কাহিনী এবার শেষ করি তাড়াতাড়ি
কৃষ্ণচূড়ার জেদখানি বড় বেশি—
অভিমান সেও বিকাবে না কারও কাছে
বরঞ্চ হবে বন্ধু, বা, প্রতিবেশী।।

যদিও কাহিনী এমন সহজ নয়
অর্জুনে শুধু বাকল ঝরেছে, ঝরে
সাঁওতালি মেয়ে রক্ত ঝরাতে জানে—
আর্যপুরুষ হার মানে অন্তরে।।

পরের জন্মে অর্জুনগাছ হয়ে
কৃষ্ণচূড়াকে বন্ধুর মতো দেখো—
আমাকে চিনতে ভুল কোরো না হে ঋজু,
রক্ত ঝরালে বাকল খসিয়ে ডেকো।।

ঘরপোড়া

জানেন! আমি না, সেই বছর উনিশে
দেখেছি সিঁদুর-রাঙা মেঘ
আহা রে বাছুর! ঘরও পুড়েছিল শেষে,
কী সহজ জ্বালানি আবেগ!

পাতার কুটির গড়ে, লাউয়ের লতায়
ভেবেছিল ঘর যাবে ছেয়ে;
বসন্তে আগুন দিয়ে ঝরানো পাতায়
পোড়া ছাই অঙ্গে মেখে মেয়ে

বাইশে বিবাগী হলো, সেই দিন থেকে
গলে গেছে দু'চোখের মণি
জানি না, ও পোড়াচোখে তাকিয়েছে কে কে
(তুমিও তো সেভাবে দেখনি!)

যেভাবে দেখেছি আমি! দগ্ধ দু'কোটরে
আজও এত দৃষ্টি ছিল বাকি!

সিঁদুরে গোধূলি নয়, অন্ধকার করে
নীল মেঘে বৃষ্টি এল নাকি?

বৃষ্টি বুঝি বন্যা দেবে, তাকে ভাসাবার—
ভেবেছে সে, ঘরপোড়া নারী...

আমার প্রথম গল্প শেষ। এইবার
আপনাকে কি ভালোবাসতে পারি?

রজনী

রজনীর এমনি কপাল
যে পুরুষ তার ভালো লাগে
তাদের সবাই বিবাহিত।

মাসি তাকে বলেছিল কাল
মন যদি ঘুম থেকে জাগে
চোখ তুলে চাওয়াই বিহিত।

চোখ তুলে কী হবে, মাসিমা!
শাড়ি মেলা ওদের বাগানে
সে বাগানে খেলা তো গর্হিত!

চাঁদে তবু অতিথি পূর্ণিমা।
ছাদে উঠে গেল, বোবাটানে,
গেল মেয়ে, জ্যোছোনামোহিত

ঝাঁপ দিবি, রজনী, দিবি তো?

তোমার চোখের কোলে

জলাশয় তোমার চোখের কোলে মাটি
কবে থেকে এমন জমেছে, গোপনীয়
শরীরের, জলের কিনার দিয়ে হাঁটি
জলাশয়, সব কথা আমাকে জানিও।
জলাশয়, তোমার অসুখ কি গভীরে?
কতদূরে কোথায় সরিয়ে নিলে চোখ
কারা যেন জলে নামে রোজ রাত্তিরে
তারা বুঝি তোমার অপরিচিত লোক?
জলাশয় আমি তো তোমার পরিচিত
ভোরবেলা তোমার জলের কাছে আসি
তুমি জানো? বোধহয় তোমাকে ভালোবাসি
ভেবে দেখো, কোনওদিন জলে নামিনি তো!

জলাশয় তোমার চোখের কোলে মাটি
আমি শুধু একা একা, পাড় ধরে হাঁটি...।

কলঘরে

কলঘরের আয়নায় আমার মুখ দেখছি
কোনওকিছু জায়গায় নেই
টিপ, চোখ, চোখের পাতা, ঠোঁট
তুমি প্রথমদিন দেখেছিলে যেখানে যা
তুমি বহুদিন রেখেছিলে যেখানে হাত
কিছু ঠিক নেই
এখন আমি ঠোঁট দিয়ে দেখি, চোখের মধ্যে
জিভ কিলবিল করে
কলঘরের আয়নায় আমি শরীর দেখছি
সর্বাঙ্গে দাঁত আর নখ

যেখানে তারা এতদিন ছিল না কোথাও
অন্তত দু'বছর আগে, কী অদ্ভুত!
দু'বছর আগে আমি তোমার সাথে প্রথম শুয়েছি
সময়ের ঠিক নেই
শরীর জাগে, শোয়, ঘুমোয় না একটুও
কলঘরের আয়নায় আমি ঘড়ি দেখছি
ঠিক এই সময়টায় শরীরের মনখারাপ করে।

টি ভি যাপনের রাত

একেকটা দিন ভীষণ খারাপ কাটে
রাতে টিভিটাকে পাশে নিয়ে শুই খাটে
সারারাত ধরে রঙিন চ্যানেলগুলো
চোখে ছুঁড়ে দেয় রহস্যময় ধুলো
বিজ্ঞাপনের অসমসাহসী ছেলে
তোমাকে ডাকবে শুধু কোকাকোলা খেলে
মোহময় চোখ, নরম দীর্ঘ চুল
বুকখোলা শার্ট, যুবকের কানে দুল
তোমার চোখেই চোখ মারা তার কাজ
তোমার গলিতে উড়াবে পক্ষিরাজ।

ওকে পাশে নিয়ে শুয়েছি বিজ্ঞাপনে
টিভির বাক্সে ধরে গেছি প্রাণপণে
সারারাত শুধু এই পাশ ওই পাশ
একটু আলাদা চ্যানেলের সহবাস।

যুবক পতাকা

এই রোদ কি বর্ষার রোদ?
চারিদিকে পারিজাত আলো

ঝরে পড়েছে বৃষ্টির মতো—
এ রোদে ভেজার লোভটুকু
একান্তই জলবায়ুগত।

তোমাদের দোতলার ছাদে
রোদ্দুরের বন্যা জমকালো
তুমি নেই, সারা ছাদ ফাঁকা।
তারে মেলা তোমার পাজামা
হু হু ওড়ে; যুবক পতাকা।

এই রোদ তো বর্ষার রোদ
মুখে হাসি, —যেন মন ভালো।
এখনি যে কান্না এসে যাবে!
ছাদে প্রায়-শুকোনো পাজামা
বৃষ্টি দেখে কোথায় পালাবে?

একটি অসম পরকীয়া

কথা বলো মা-বাবার সাথে
আমার আপত্তি নেই তাতে
আমাদের কথা পরে হবে।

সবকিছু দারুণ সংযমী
গোপনে যে দুঃসাহসী তুমি
একথা জেনেছি যেন কবে?

মা তোমাকে পছন্দই করে
বাবাও ভাইয়ের মতো ধরে
কিন্তু তুমি বন্ধু তো আমারি

কাকিমা এল না কেন, সোনা?
ওকে যেন কখনও বোলো না
আমি ভালো চুমু খেতে পারি!

সদর দরজা খুলে দিতে
একসঙ্গে নামব সিঁড়িতে
সে মুহূর্তে আমরা পাগল,

ঝোড়ো শ্বাস, সিঁড়ির আড়ালে
অতর্কিতে বিছে কামড়ালে
রক্তময় জ্বালা অনর্গল

ধরে যাবে; ধরবে ধরুক
তোমার বুকের মধ্যে মুখ
ধরে যায় কেমন সহজে—

কাকিমা, মিতালি, ভালো আছে?
ওরা কি তোমার কাছে কাছে
আসে, দ্যাখে, কোনও দাগ খোঁজে?

কাল যাব তোমার অফিসে
ঠিক ঠিক চারটে পঁচিশে
তারপর ভুল দিগ্‌বিদিক...

শহিদমিনারে উঠে গিয়ে
বলে দেব আকাশ ফাটিয়ে
ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।

একা চাঁদের শহর

আকাশে এমন সমর্পণের চাঁদ
সত্যি বলছি, আগে আমি কখনও দেখিনি
নিরাপত্তারক্ষীরা ঘোরাঘুরি করছিল সরকারি রাস্তায়
আর সে, এরই ফাঁকে, আমার
ঘাড়ে গলায় মাখিয়ে দিয়ে গেল নোন্‌তা জ্যোৎস্না।

আকাশে এমন সর্বনাশা চাঁদ
সত্যি বলছি এর আগে ওঠেনি কখনও
আমার সামনে পিছনে জোয়ান মিনিবাসগুলো
মানুষ গিলতে গিলতে চলেছে রাক্ষসের মতো
আর সে, আমার আগে আগে জোর পায়ে
হাঁটতে হাঁটতে চেঁচিয়ে বলল: আমায় ধরো
আমি প্রাণ হাতে নিয়ে টপকাতে লাগলাম
যমদূত, একটার পর একটা,
সে এক ভারি বিপজ্জনক খেলা।

জোয়ানমদ্দ মিনিবাসগুলোও যখন
ঝিমিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল গ্যারেজে
গ্যারেজ ঢুকে পড়ল ঘুমে
ঘুম ঢুকে পড়ল পাতালে
আমি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম
নিবে যাওয়া রাস্তায়; কোথায় জানি না
ঘাড়ে গলায় গড়িয়ে পড়ছে নোন্‌তা অবসাদ

একটু দূরে, একটু উপরে
চাঁদ তখনও কোনও একটা সম্পর্কের জন্য
নিঃশব্দে মরে যাচ্ছিল।

তুমি কি সাঁতার জানো

জিন্‌স পরা ছেড়ে দিতে পারি
তুমি যদি বলো; অন্য নারী
হয়ে যাব অতি অনায়াসে।
যে মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে
তার ছোট চুল, বিনা তেলে
(তুমি যেন কাকে বলেছিলে)
—সে কখন হতেই পারে না!
বেশ; হব নিজের অচেনা
কাল থেকে, তুমি বলো যদি
তোমার পায়ের কাছে নদী
খুলে রাখবে নীল ধনেখালি,
আমার সমস্ত পুরুষালি
মুদ্রাদোষ ওড়াব হাওয়ায়।
জিন্‌স পরা ছেড়ে দেওয়া যায়
সহজেই; নদী হতে পেলে...

সাঁতার জানো তো তুমি, ছেলে?

দশবছর আগেকার হাত

আমার হাতের মধ্যে দশবছর আগেকার হাত
আমার হাতের মধ্যে দশটি বছর আর
অতদিন আগেকার হাত
হাতে করে কী আনলি রে? ঘুমের ওষুধ?
তোর যে আঙুল দিয়ে, আঙুলের স্পর্শডগা দিয়ে
শুষে নিতি মাথার অসুখ শিরা থেকে
সে আঙুল বর্তমানে কার?

আমার হাতের মধ্যে ভেসে গেছে হাত
দশটি বছর আগেকার।

মতলবী

দিদির বাড়িতে দেখা বসেছিলে একা একা
দিদি বলেছিল জল দিতে
জামাইবাবুর চেনা অন্যদিকে তাকাবে না
কোনও ভুল হবে না দৃষ্টিতে
এমনই সিদ্ধান্ত ছিল? যে মেয়েটি জল দিল
তার হাতে মেহেদির দাগ
আঙুলে, নখের কোণে, যেন খুব অন্যমনে
কী একটা ছিল; — অনুরাগ?
কিছুই পড়েনি চোখে? কী করে যে অন্যলোকে
শুরু করে প্রেমের কাহিনী!
একা যুবকের ঘরে কানায় কানায় ভরে
শুধু জল দিতে তো আসিনি!

একটি আধুনিক প্রেমের কবিতা

নূপুর বেজে উঠল শুনে
কদমতলায় ছুটল চটুল বালা,
সাইকেলে ঠেস, দাঁড়িয়ে ছিল কালা।

একটা দুটো কথার পরে
বুকের ভিতর ব্যথার কথা হয়
কেমন মিঠে বেদনা আর ভয়!

আর লিখ না অমন চিঠি
পাকাদেখার শমন এবার শিরে,
দিন ফুরোল প্রেমযমুনার তীরে।

কাল এস না, পরশু এস।
পাত্র টেকো, সরশুনাতে বাড়ি,
তেইশটা গোঁফ, বাহান্নটা দাড়ি।

আশীর্বাদে মুক্তো দেবে
মা খাওয়াবে সুক্তো, ইলিশভাত
আমি তোমায় ভাবব সারারাত।

পরশু এস বিকেলবেলা,
নিমন্ত্রণের অঢেল আয়োজন—
তুমি, তোমার মা-বাবা আর বোন।

মা বলেছে, ফালতু ছেলে
এবং তোমার চালচুলো নেই মোটে
বিয়ের ফুলও অনেক ভাগ্যে ফোটে।

কম্পিউটার পড়তে থেকো
বরের ঘোড়া চড়তে তোমার দেরি,
আর রেখো না শারুখ-খানী টেরি।

নূপুর বাজে সকাল সাঁজে
বয়েসকালে নাকাল কত রাধা
কীসের জোরে ভাঙব কুলের বাধা!

চোরাটান

তোমার বাড়ির খিড়কিতে
স্নানঘাট, ঘাটের সিঁড়িতে
গঙ্গা খুব লক্ষ্মী খুকুসোনা
তার নাম লাজুক পুকুর?
তোমাদের রুপোলি দুপুর
কাকচক্ষু জরি দিয়ে বোনা?
তোমার বউটি লক্ষ্মী মেয়ে
দ্বিপ্রহরে শান্ত জলে নেয়ে
লক্ষ্মী আঁকে খিড়কির পথে

পরনে খয়েরি রং শাড়ি
স্নান সেরে উঠে তাড়াতাড়ি
শ্রীঅঙ্গে জড়ানো কোনওমতে
গঙ্গা বুঝি শ্রীমতীর সখী?
গোপনেও নদী কখনও কি
না বুঝে, লুকিয়ে, কিছু ভাবে?
তুমি রোজ বিকেলের মুখে
জল দ্যাখো পাড় থেকে ঝুঁকে,
জল ভাবে দু'হাত বাড়াবে।
বহুদিন নামোনি নদীতে
নদী তোমাকেই চায় দিতে
উথাল পাথাল এক স্নান
জল, সে তো এখন তরুণী
তোকে ভালোবাসার দরুণ-ই
গভীরে তুমুল চোরাটান।

এবার শ্রাবণে

এবার শ্রাবণে তুমি পাহাড়ে গেছিলে
পাহাড়ের বৃষ্টি বুঝি আলাদারকম?
মেঘেদের ভুলে-যাওয়া অসুখ কি কম,
কথা দিয়ে কথা রাখে, টাইগার হিলে?

শহরেও বর্ষা ছিল; সে তো যথারীতি
ঘুরেছিল একা একা, সারাপায়ে কাদা
পুরনো অভ্যাস তার মিছিমিছি কাঁদা
আকাশে গভীর মন-খারাপের তিথি

তুমি কি পাহাড়ে উঠে বৃষ্টিভেজা চুলে
এলোমেলো হতে খুব? যুবতী মেঘেরা
তোমাকে শরীর দিত স্বেদবাষ্পে ঘেরা,
ঝরে যেত, তুমি শুধু একটুখানি ছুঁলে?

এ শহরে কোনও মেঘ অলিতে গলিতে
খুঁজেছিল চেনামুখ নিঠুর ছেলের
সে তো কথা দিয়েছিল?... শেষ বিকেলের
বৃষ্টি একা ফিরে গেল শহরতলিতে।

উড়ন্ত রাতপোশাক

ঘুমের মধ্যে কথা বলছে পাড়া
রাতের পাথরখানা মাথায় চাপিয়ে
জমে আছে দুর্ভেদ্য গলি
এমন সময়ে চুপচাপ,
ছাদ থেকে ঝাঁপ দিল
উড়ন্ত রাতপোশাক।
তার যেন ডানা ছিল,
অন্তত কথা ছিল ডানা থাকবার;
শহরের অধিকাংশ ঘরে
চলছিল শেষদৃশ্য,
যে নাটকের বিজ্ঞাপন
শৌখিন প্রতি জানলায়
কুঁচকে গিয়েছিল ঘুমে ভিজে,
সে সময়ে কাউকে না বলে
আকাশে বেরিয়ে পড়ল
ঘুমন্ত রাতপোশাক।
জানলায় পর্দা নিভে গেল
মুখোশের চোখে নিভে গেল লাল নীল আলো
শহরে অদ্ভুত ঘুম,
ঘুমে ভেজা ভুল বিজ্ঞাপন,
সে-সব উপেক্ষা করে উড়ে গেল গভীর বিপথে
জ্বলন্ত রাতপোশাক।

রূপকথা

আদিগন্ত রাজ্যপাট তোমাকে দেখেছি ছেড়ে যেতে
যখন কোপাচ্ছ মাটি এক চিলতে বেড়াঘেরা ক্ষেতে
তোমাকে দেখেছি আমি দূর থেকে, বাঁধের ওপরে
দাঁড়িয়েছি কতদিন, নদীর রঙের শাড়ি পরে
আমি জানি তুমি সেই রাজকুমার, আড়াল-বিলাসী
কোথায় তোমার বীজ, কী শস্য বুনেছ ক্ষেতে, চাষী?

জলের খোঁজে কি তুমি তাকালে এদিকে মুখ তুলে
নদীকে কাঁপাল ঢেউ, নদীও তো গিয়েছিল ভুলে
কবে সে এসেছে ফেলে প্রাসাদে সোনার জল-ঝারি
তুমি কি চিনেছ ঠিক? আমি সেই রাজার কুমারী...

তরুণী মেঘের বৃত্তান্ত

এত অসহিষ্ণু কেন
কেন এত পীড়িত, দম্পতি
তরুণী মেঘের দিকে
উড়ে গেলে বৃদ্ধ প্রজাপতি।

গবাক্ষে ডিমের খোলা
ভূতে তাড়িয়েছে মধুমাস
সংসার সুখের ছিল
মোকাবিলা করেছ সন্ত্রাস

এ কেমন দুর্বিপাক
আকাশে ডাকিনী মেঘ নাচে
সমাজ জড়িয়ে আছ
হৃদয়ের ঠাণ্ডা লাগে পাছে

অন্ধ নিলে দৃষ্টিভোগ
তোমার ভাঁড়ারে কি বা ক্ষতি
তরুণী মেঘের জল
কালি হয়ে ঝরেছে সম্প্রতি।

ঝিকমিকে কবিতা

পশ্চিমা রোদ ধাক্কা খেল বিষম জোরে
ময়ূর মহল ডাকবাংলোয়, ম্যাসাঞ্জোরে
লাগল আগুন কমলা রঙের শার্সিখানায়
দস্যিমেয়ের দুই হাতে কি আর্শি মানায়?
আর্শি ভেঙে টুকরো হলো খেলাচ্ছলে
মুখ দ্যাখে রোদ ময়ূর-চোখের ছলাৎ-জলে
ছলাৎ শব্দে রক্ত ভাঙে বুকের ভেতর
হঠাৎ-আসা পূর্বদেশের যুবক কে তোর?
কী খুঁজছে সে নদীর বুকে স্বর্ণ-সেঁচায়
পর্যটকের মুগ্ধতা কি সূর্যকে চায়!
খুলছে যুবক অধীর হাতে জামার বোতাম
রং-চটা জিন্‌স; শরীর বেয়ে ঝকঝকে ঘাম
জ্বলছে রোদে, রোদের মতোন, সন্ধেবেলা
বন্য চোখে শোণিতকণার অন্য খেলা—

দস্যিমেয়ে পশ্চিমা রোদ নেশার ঘোরে
পুড়ল, এবং ধাক্কা খেল বিষম জোরে
খেলতে খেলতে পর্যটকের শরীর নিয়ে
হাসছে ময়ূরাক্ষী নদী ঝিকমিকিয়ে।

আমি কি রোদ্দুর

তোমার গায়ে রোদ এলিয়ে বসেছিল সেদিকে চোখ তুলে
তাকাব কী করে!
ওর কি হায়া আছে! কীভাবে ঢেলে দিল নিজেকে অনায়াসে
তোমার উপরে
আঁকড়ে ধরেছিল তোমার বুকপিঠ পিছলে যেতে যেতে
নেশায় চুর
তুমিও সেরকম! ওকেই কাছে টেনে সোহাগ করেছিলে
সারা দুপুর
আমি তো দেখব না, এবার ফিরে যাব মাঠের আল ধরে
একা একা
যা-খুশি করো তুমি, তোমার রোদ্দুর ভীষণ পাজি, আর
বড় ন্যাকা
নিরালা এই মাঠে কী করে হয়ে গেলে অমন লুটোপুটি
দু'জনে
(সত্যি কথা বলি, আমারও মাঝে মাঝে ওসব সাধ হয়
গোপনে!)
বিকেল পড়ে এল, ওঠ্ রে রোদ্দুর, তুলে নে তোর ছাড়া
শাড়ি
নিরালা নীল মাঠে আদর খেলা ছেড়ে এবার যেতে হবে
বাড়ি
এখনও শুয়ে তুমি! আমার দিকে ফিরে নীরবে বলেছিলে
—কী?
আমি তো ভালোবাসি—লুকিয়ে, মনে মনে,—আমি কি রোদ্দুর
ছি!

ঋতুরঙ্গ

সিঁড়িতে রোদের দাগ

সিঁড়িতে রোদের দাগ, সেই দাগে লুকোনো পা ফেলে
শহরের প্রান্ত থেকে ফসলের গন্ধ নিয়ে এলে
দ্বিতলে, কোণের ঘরে, দেয়ালের পলেস্তারা খসা
ধুলো ও জীবাণু নিয়ে অসুখের সঙ্গে ওঠাবসা
এখানে নিয়ত; তুমি এ ঠিকানা কোথা থেকে পেলে!
এসেছ আমার ঘরে সিঁড়িতে রোদের দাগ ফেলে
কে তুমি, দু'চোখে কোন ঋতু?

এখন কি সুখচরে থাকো?

এখানে নদীটি ছিল, মনে আছে ভেঙে পড়া সাঁকো?
মুখ চেনা ছিল তার।—শরীর? শরীর; তার বাঁক-ও
তখনও নদীর বুকে জল বাড়ে কমে, জ্বর আসে
নদীর সমস্ত জল শুষেছিলে আগুন বাতাসে
মনে পড়ে? মনে পড়ে? বলো, মনে পড়ে সব কথা?
জলেও আগুন জ্বেলে ভেবেছিলে নেভাবে অযথা
তোমার গন্তব্য ছিল, সময় ছিল না ডুবজলে
এখানে নদীটি আজও ছাইচাপা দুঃখ হয়ে জ্বলে;
মনে পড়ে কোন নদী? মনে পড়ে, কোনখানে সাঁকো?
মুখখানি চেনা লাগে, এখন কি সুখচরে থাকো?

তোর সঙ্গে, তোমার সঙ্গে

শুধু আধোখানি ভালোবাসা

দরোজার আড় থেকে আধখানা চাঁদমুখ তোর
ভেবেছ, এখনি ভুলে যাব?

আশরীর অমাবস্যা, আশরীর উপোসী চকোর
চাঁদমুখ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব
চিরন্তন নখে দাঁতে; হৃদয়ে যেটুকু ধার আছে
নির্বিশেষে রেখেছি শানিয়ে,
পালিয়ে কোথায় যাবি? ঐ চোখে কৃষ্ণপক্ষ নাচে
আধখানা ভালোবাসা নিয়ে।

তোমার সঙ্গে কাকজ্যোৎস্নায়

আমার সঙ্গে হাঁটছিলে তুমি শহর জুড়ে
হাঁটতে হাঁটতে পথঘাট ছিঁড়ে উড়ল হাওয়ায়
রক্ত বেরোল কুমারী মাটির গর্ভ ফুঁড়ে
কত যন্ত্রণা তোমার সঙ্গে হাঁটতে চাওয়ায়!

যন্ত্রণা ছিল ছাতিমগন্ধে বাঁধনহারা
শীত না শরৎ! বিস্মৃত ঋতু অন্ধকারে
শরীরে শরীরে স্পর্শপ্রমাদ খুঁজছ কারা?
কী আছে পথের প্রান্তে তা কেউ বলতে পারে!

পথের প্রান্তে পড়ে ছিল কোনও সন্ধিক্ষণ
অনেক রাত্রে উড়নচণ্ডী চাঁদ দিল টান—
আমার সঙ্গে হাঁটছিলে তুমি, হঠাৎ কখন
কাকজ্যোৎস্নায় উড়ল তোমার নীল আলোয়ান।

কাল থেকে আসব না

স্বপ্নে তো পুরুষ ছিল, তুমি কেন সেই স্বপ্নে এলে
দশবছরের ছোট তুই অনুরাধাদির ছেলে

চিবুকে তীক্ষ্ণ তিল, আমার দেখার কথা নয়
কান্না কথা শুনেছিল, নিঃশ্বাস মানল না ভয়

উত্তাপে কি তোকে ছুঁল, চমকে তুই তাকালি এদিকে
তোকে আর পড়াব না, বলে আসব অনুরাধাদিকে

মেধাবী, দুর্বিনীত, স্বল্পবাক, ঈষৎ অদ্ভুত
কিশোর পুরুষ তুমি, নাকি কোনও স্নিগ্ধ দেবদূত?

বয়স চুলোয় যাক, সম্পর্কে পরিচিত মাসি
বিশ্বস্ত আসাযাওয়া, কাছাকাছি থাকা, হাসাহাসি

কেউ কিছু ভাবছে না, বয়সের দারুণ অমিল
আমি শুধু তোকে ভাবি, চিবুকের ডানদিকে তিল

কোনওদিনও দেখিস না, তোর নাম লিখেছি মলাটে
বুধবার বিকেলের অপেক্ষায় সারাহপ্তা কাটে

পড়া শেষ হয়ে গেল, আটটা নাগাদ লোডশেডিং
হাত ধরো বাণীমাসি, এইদিকে বারান্দা, রেলিং।

দেখতে পাচ্ছি না কিছু, অন্ধকার কতটা জটিল
তোর মুখে হাসি আছে, চিবুকের ডানদিকে তিল?

দশবছরের দেরি, তবু চোখে নেই অনুতাপ
আমি তোর মাসি হই, তোর সঙ্গে করব না পাপ

কাল থেকে আসব না, তোর চোখ কেমন সন্ধানী
অন্ধকার বলেছিল এই মেয়েটির নাম বাণী।

তুই যেন না শুনিস, অনুরাধাদিরা বড় ভালো
যেতে পারব, হাত ছাড়ো, ঘরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালো...

ব্যভিচারিণী

ঠিকরে গেল চোখের মণি
তোমায় দেখা এমন দায়
রূপ দেখেছি দুপুরবেলা
সিঁড়ির নীচে, বারান্দায়।
এক্ষুনি ও-চোখ বিঁধেছে
নীলচে গরল রোমকূপে
অন্ধ করো, অন্ধ করো
অন্ধ মরে কোন্ রূপে?
চোখের পাতায় পাপের পাহাড়
কাঁপছে প্রবল ডানভুরু
আমার ঘরে পুরুষ আছে
জঙ্ঘা, নাভি, দুই ঊরু
সমুদ্র নেই সমুদ্র নেই,
চিলেকোঠায় ছিটকিনি
দুপুরবেলা নদীতে চল
কোটাল আসার দিন চিনি।
সমুদ্র তোর হাতের মুঠোয়
উপচানো ঠোঁট, আঁশটে নুন
জলের নীচে পুরনো টান
জলের উপর তুই নতুন।
কত বছর স্নান করিনি
জ্বর শুষেছি দু'চক্ষে
ওরা আমার অসুখ দ্যাখে
দূর থেকে আর অলক্ষ্যে।
আজন্মকাল ক্ষুৎপিপাসু
রূপ খুলে দে, রূপকে খাই,
এখন আমি ভাত রাঁধি না
উনুন ভাঙা, উড়ছে ছাই।
তাপ দ্যাখেনি আকাশপাতাল
পাপ দ্যাখেনি আমার চোখ
ঘরের পুরুষ অন্যঘরে
আমার পুরুষ অন্যলোক।

বিষাদ ও অভ্রুতাঞ্জন

ঘাড়ে চাপল মনখারাপ
মন কামড়ে খেল সে কোনজন!
যে খেয়েছে সে খেয়েছে
কপালে আছে অভ্রুতাঞ্জন।

সারাদিন বিছানায়
ধু ধু করে নোন্‌তা অবসাদ
কোনওমতে শুয়ে আছি
গড়ালেই চারিদিকে খাদ

খাদের ওধারে ভিড়
চেনা চেনা মুখেরা তিনজন—
মা বাবা দাদার হাতে
নিউ স্ট্রং অভ্রুতাঞ্জন

মধুর প্রদাহ ছাড়া
চাপা পড়ে গেছে সব বোধ-ই
দু'রগে জ্বলন ঘষি
ঘাড়ে কী দারুণ ঠাণ্ডা নদী!

বুকে পিঠে ধুম জ্বর
পোড়ামুখে রোচে না ব্যঞ্জন
বিষাদ আমাকে খেল,
আমি খেয়েছি অভ্রুতাঞ্জন।

বারান্দার নীচে

ঐ বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে
প্রেম করব বাসস্টপের ছেলেদের সঙ্গে

গভীর চোখে তাকাব তোমার পাশের
অন্য যে-কোনও পুরুষের দিকে
তার হাত ধরব, হেসে উঠব, বলে যাব
'দেখা হবে,
যাচ্ছেন তো আকাদেমিতে'
তোমাকে ঈষৎ হাত নেড়ে
আগে আগে রাস্তা পেরোব
একা, বা, অন্য কারও সঙ্গে
একটুও তাড়া নেই, কোনওই কষ্ট নেই
তুমি সেই কতক্ষণ থেকে হাসিমুখে
পুড়িয়ে চলেছ নির্লিপ্ত সিগারেট

বাসস্টপ ফাঁকা হয়ে গেছে
আকাদেমি-অভিমুখে চলে গেছে যুবকের দল
আজ যেন কাদের নাটক...?

ফাঁকা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আমি
প্রেম করছি পোস্টারের সঙ্গে।

মধুকূপী মাঠের গল্প

শিয়রের কাছে বাতি জ্বেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে সেই ছেলে
আসলে সে রাজার কুমার

আমি তার দুই চোখে চুমো
দিয়ে আসি, বলি—তুই ঘুমো।
সে জানে না নামটি আমার

অথবা সে আমাকেই জানে
দেখে থাকবে এখানে ওখানে,
আমি তো এসেছি নিত্যদিন

দেখা কি হয়েছে কোনও রাতে?
আমি তার ঘুমে ভরা হাতে
রেখে আসি শিরোনামহীন

নতুন কবিতা, চুপিচুপি
তার চারিপাশে মধুকূপী
ঘাসের জঙ্গল হয়ে যায়

ঘাসফুলে ছেয়েছে খামার
শুয়ে আছে রাজার কুমার
চুমো দিতে তার দুই পা'য়

গোপনে প্রবল ইচ্ছে করে
এই ঘরে, ঘাসের উপরে
খুলে রাখি অতৃপ্ত আঙুল

সকালে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে
দেখো, চুলে রয়েছে জড়িয়ে
দশটি মাঠ,
মধুকূপী ফুল...।

দুপুর

নিঃশব্দ দুপুর।
কলিংবেলের থেকে একচুল দূরে কার হাত
বহুযুগ ধরে স্থির হয়ে থাকে আমি জানি
আমি তার তাপ চিনি, ঘাম চিনি, গলার দু'পাশে
সুবর্ণরেখাও চিনি, নদী আর নির্জলা বালি,
চিনি না খোঁড়ার দাগ, আঁজলা জলে নিঃশ্বাস লেগে
কেঁপে যাওয়া মুখচ্ছবি
স্থির হও ছবি, স্থির হও;

তোমাকে দেখব আজ, আজ সেই নিশুতি দুপুর,
কলিংবেলের থেকে একচুল দূরে কার হাত?
কে এল! কে এল! বলে দুপুর পাখির ডাক
বেজে ওঠে বেলের আগেই
সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় পায়ের আওয়াজ

দুপুরের ফিরে যাওয়া বহুযুগ ধরে আমি চিনি
দরজাটা বন্ধই থাকে...

ভালোবাসবার পরে

ভালোবাসবার পরে তুমি আঁচড়ে দেবে চুল
খুঁজেও দেবে হারিয়ে যাওয়া দুল
এমন আমি আগেই ভেবেছি
চান করানোর পরে তুমি মুছিয়ে দেবে জল
গুছিয়ে দেবে লুটন্ত আঁচল
তবেই না এই জলকে নেবেছি!

এখন জলে আগুন আছে, সামান্য নয় ঢেউ
যেসব আমি ভাবিনি স্বপ্নেও
তেমনি স্রোতে যেই রেখেছি পা
পায়ের পাতা টুকরো হলো—একটা রঙিন মাছ
ফেলল ভেঙে পুকুরঘরের কাঁচ
(ঠাকুর আমার লজ্জা নিও না)

পায়ের পাতা মাছ হয়েছে, গভীর জলে ঝাঁপ,
খেলছে হাঁটু, উরুর দিকে চাপ
উঠছে, কোমর, এবার তোমার দান
তারপরে আর দান ফেলিনি, উপুড় হলো ছক
নিজেই খেলা খেললে মারাত্মক
এই বুঝি সেই দুপুরবেলার চান?

স্নান কি খেলা? স্নান কী ভালো! রোদের নীচে ডুব
ঠাকুর আমার জ্বর এসেছে খুব
শরীর, ভিজে শরীর জুড়ে তাত
চুল ধুয়েছি অঝোর ঘামে, ও-চুল অম্‌নি থাক
কানের ঝুটো মুক্তো ঝরে যাক
কোথায় তোমার ঘুমপাড়ানি হাত?

তিনসত্যি

বিকেল

তোমার কলম থেকে ঝরে পড়ল অজস্র দুপুর
অনেক লিখেছ আজ, এইবার বারান্দায় নামো
বিকেল দাঁড়িয়ে আছে, ওর হাতে ভাঁজভাঙা পথ...
ধুলোমাঠ বিকেলের।
তোমার পায়ের পাতা ভালো...

শিরিষ

প্রাচীন শিরিষ গাছ, সবুজ রেখেছ বহু দূরে
তোমার পিদিমফুল অনাসক্ত, আকাশে তাকানো
ছায়ায় শুয়েছি শুধু, সারাদিন ঘুরেছি রোদ্দুরে
আগে তো বলোনি, গাছ, তুমি এত ভালোবাসতে জানো!

গোপন

সামান্য নিঃশ্বাস দাও, যৎসামান্য বিস্ফারিত পাপ
রাখো দুঃসাহসী ঠোঁটে—সাহস তেমন কিছু নয়
এ কথা গোপন থাকবে, যে গোপনীয়তা মধুময়
মধুর বিষের মতো আকণ্ঠই ভরেছি সন্তাপ...

ভিতরে বাহিরে

তোর কপালে কীসের গন্ধ
তুই কদম ফুলের বন্ধু?
তাই এনেছিস এই ঝাঁঝালো বাদল সন্ধ্যা!
—ঘরে এস, আমি দরোজা করে দি' বন্ধ

আজ ভিতরে বাহিরে বৃষ্টি
তবু চেয়ে দ্যাখো, কত কষ্টে
আমি জোগাড় করেছি শুকনো জ্বালানি শেষটায়
—আগুন দেবে না শরীরে শরীর ঘষটে?

তুমি চোখে চোখ রাখা মাত্র
জ্বলে উঠবে মশাল রাত্রির
আহা কী পাগল শিখা একে অন্যকে হাতড়ায়
ঐ তরল আগুনে ভরব ওষ্ঠপাত্র

যদি হয়ে যাই পুড়ে ভস্ম
তবে দুরন্ত এই বর্ষায়
ভেসে চলে যাব মাঠে যেখানে সহজ কর্ষণ
...ভিতরে বাহিরে বহন করেছি শস্য...

নীল বাথরুমে

বাথরুমে সামুদ্রিক টালি
এ সমুদ্র গরম হাওয়ার
তুমি জানো!
সারা গায়ে অভ্রকুচি, বালি
এস, এই খুলেছি শাওয়ার
হবে স্নানও।

শাওয়ারে আদিম জল লোনা
শরীরে শরীর চেপে রাখো
জলে ধার
জল থেকে পাথর তুলো না
গভীর পাথরে গড়া সাঁকো,
পারাপার
করেছি সমস্ত জলধারা
আশরীর তবুও সাহারা—
বলো তুমি,
সব ঘর ডুবে গেল ঘুমে
এখনও এ নীল বাথরুমে
মরুভূমি...

শিকার গল্প

মুখ তোলো মুগ্ধ বাঘ, চারপাশে এখনও সবুজ
পড়ে আছে থরোথরো, এখানে শিকার ধরা বাকি
কতদিন ফেলে রেখে চলে যাবে হরিণের নাভি
এসব হিংস্রতা নয় (যে জানে সে চেয়েই উন্মাদ)

এ রক্তে কেমন গন্ধ, বলো, গন্ধ চূড়ান্ত কাতর
কেমন আমূল কষ্ট সবুজে যখন রাখলে মুখ
শুধু মাংসভুক নও, তৃষ্ণা ছিল বন্য তরলেরও
পুকুরের ধারে তাই পেতে রাখো আর্ত দুই থাবা...

মুখ দ্যাখো, অন্ধ বাঘ, বলো তো এ অন্যমুখ কার?
ভালো লাগছে? নিজেই নিজেকে বলো,—আমাকে বোলো না
পুকুরে অনেক জল, নামতে চাও নামো, কিন্তু দেখো
জিজ্ঞেস করো না জলে কত নীচে আছে অন্যদেশ

চুপ করো, দুষ্টু বাঘ, তুমি দ্যাখো, আমি তো দেখব না
আমি তো সবুজে আছি, আমি চোখ বুজেছি তখন
আঁধার জলের পাড়ে, থরোথরো অতল দুপুরে
জলে কি হরিণগন্ধ? আহা বাঘ, ভুলেছ শিকার

কতদিন পরে মুখ দেখলে এই ত্রিকোণ মুকুরে?

আর আমাকে থাকতে বলবে না?

এইসব অথৈ দুপুর
আছাড়ি পিছাড়ি সুখ, নাকেমুখে বাঁধভাঙা ঘাম
এ সবই আমার, সোনা?
আর কোনও রাত্রি কি দেবে না?
লাল নীল সব শিরা ছিঁড়েখুড়ে দেখা হয়ে গেল
নিঃশেষে উঠে এল নখে
কদমের মুগ্ধ রেণু
পুড়ে পুড়ে নিভে এল জ্বলন্ত জন্মদাগ
এখন যে দারুণ ঘুম পায়!
সারাদিন খোলা মাঠে অবাধ চারণ
চষাজমি, নীলরোদ, গভীর খাটুনি—ভবঘুরে,
আমাকে কেন তাঁবুতে ডাকবে না?
নিঃশ্বাস ফিরিও না, এ গন্ধ তোমার, তোমার
এখনও এ-মেঝের ওপরে
জমে আছে থৈ থৈ দু'মানুষ সমান নিঃশ্বাস
এত স্নান, দুরন্ত আরামের পরও
ক্লান্ত লাগে, নিরাশ্রয় লাগে...
এলোমেলো ঘরদোর,
ছিট্‌কে ওঠা স্পর্শসুখ লেগে
গড়িয়ে পড়েছে ফুলদানি
জেনে বুঝে খুলে রাখা কবিতার বুকের পাতায়
বয়ে গেল ক্ষিপ্র কোটাল...

কবিতা কুঁচকে আছে বালির পরত বুকে নিয়ে
উথলে ওঠে ফুটন্ত দুপুর
সাড়ে চারটে বেজে গেল
আর আমাকে থাকতে বলবে না?
খরশান অভিমান লেগে
ছিঁড়ে যাচ্ছে গুর্জরী চাদর
ঝুলিয়ে এসেছি আমি তোমার চেয়ারে
ঘামে ভেজা নীল অন্তর্বাস
মনে করে নিতে আসব সন্ধে নাগাদ
তখন মীরাদি ফিরবে, তোমরা বুঝি চায়ের টেবিলে...

আমাকে দরজা খুলবে না?

তোমার পাশের সিটে

সমস্ত পথ তোমার পাশের সিটে
বসেই এলাম, অথচ মধ্যিখানে
যোজন যোজন দুরন্ত নদনদী
সারারাস্তাই অন্যপাশের লোক
আঁকড়ে ছিল কি আমার উরুর তাপ
এমনকী তার পিছল আঙুল দিয়ে
শরীরের থেকে শুষে নিচ্ছিল কিছু
সেসব তেমন বুঝতে পারিনি, শুধু
অতি সাবধানে বাঁচিয়ে রেখেছি হাত
যদি ছুঁয়ে যায় সে-হাত তোমার হাতে
সেই মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস হবে
আমার শরীরে করুক যার-যা খুশি
পোকা লেগে যাক, সেঁটে যাক ছিনে জোঁক
ছোঁব না তোমার পালকের পাঞ্জাবি
ঝাঁকুনি বাইরে, ঝাঁকুনি ভিতরে, নীচে,
পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি, নখে ঘষা লেগে

এখনি পুড়বে শহর, পুড়ব আমি
তুমিও কি পুড়বে না, জানলার ধারে
দূরে বসে আছ, পাশেই, প্রবল পাশে...

বুকে উঠে এল অন্যলোকের হাত
যা-খুশি করুক, সরব না তোর দিকে
মরব না এত তাড়াতাড়ি তোকে ছুঁয়ে
বাস থেকে নেমে অন্তত একবার
আরও অন্তত একবার চুমু খাব
সাপটে ধরেছে অন্যপাশের হাত
ওটা কিছু নয়, ভালোবাসা ছাড়া আর
কিছুতে মরি না, তোমার আমার মাঝে
সিটে বসে আছে মৃত্যুর মতো সুখ
এত নদনদী, ওপারে তোমার আলো
দেখতে পেয়েছি, পৌঁছাতে কত দেরি
শেষ বাসস্টপে? তোমাকে একটিবার
আরও একবার স্পর্শ করার আগে

মরে যাব না তো? বল, মরে যাব না তো?

চিলজন্ম

কী শিখেছ ইহজন্মে? চিলের মতো সুযোগসন্ধান
এক টুকরো অন্ধকার হাতিয়ে নেওয়া ঠোঁটের ভেতরে
যথেষ্ট সময় নেই, দ্রুত ছিঁড়ে ফেলা রক্তমুখ
গভীর অসুখী ডানা সারাদিন চক্রাকারে ঘোরে...

এ জন্ম চিলের জন্ম, আজীবন প্রখর উড়ান
তোমার মসৃণ পিঠে বিঁধতে চাওয়া সুতীক্ষ্ণ পালক
কতবার আকাঙ্ক্ষিত অপরাধ, লক্ষ্মীছাড়া সুখ
মুঠোয় সংসার ঢেকে একা একা চলেছ বালক

যে মুহূর্তে একা পাই সে মুহূর্ত আমার, আমার
বালক হতচকিত, হাত থেকে সমাজ গড়ায়
রাস্তা থেকে নর্দমায় গিয়ে পড়ে; পড়েছে পড়ুক
মারণাস্ত্র দুই ঠোঁট, ঢুকে গেছে তীব্র নিশানায়

তোমার সুস্বাদু ত্বক ছিঁড়ে নিয়ে আকাশে পালাব
যেখানে কঠিন চূড়া লবণাক্ত, সমস্ত পাথুরে
নখরে বিঁধিয়ে রাখব মনুষ্যজন্মের মতো ক্ষুধা
যতবার কাছে পাব তোকে তোর বাড়ি থেকে দূরে।

বুকের সৈকতে ঝাউবন

বুকের সৈকত থেকে উঠে এস, স্বপ্ন ঝাউবন
সরে এস, এ দুপুর জোয়ার আসার, মনে হয়,
বালি ওড়ে ক্ষুরধার, এ বালি তো অশরীরী নয়
লবণপাথরে লেগে অসতর্কে পুড়ে গেল মন

বুকের সৈকতে মুখ ঢেকে রাখো, মগ্ন ঝাউবন
শুয়ে থাকো, সব ঝড় বুকে রাখো, গোপন পাতায়
লিখে রাখো জোয়ারের ডাকনাম, ভিজে কবিতায়,
সে ঠিক বুঝেই নেবে তুমি তাকে ছুঁয়েছ কখন

বুকের সৈকত জুড়ে যে দেখেছে উষ্ণ ঝাউবন
যে দেখেছে ঝড় ওঠা, চলমান দীর্ঘ বালিয়াড়ি
ঝাউগন্ধ গায়ে মেখে সে যখন ফিরে গেল বাড়ি
সাগরে ভাঁটার টান, বালুক্ষতে রুপোলি জ্বলন

কবিকে জিজ্ঞেস করো

কবিকে কবিতা নয়, আরও কিছু অন্য প্রশ্ন করো
প্রশ্ন করো শব্দহীন, মাত্রাছাড়া, অশুদ্ধ আঙ্গিকে
জানতে চাও সে যখন সাধারণ জৈব সহচর
কবিতাকে ছুঁতে চেয়ে সে-ও ছিটকে পড়েছে কখনও?

কবিকে জিজ্ঞেস করো সে পুরুষ কি না, কিংবা নারী?
শরীরে কোথায় ব্যথা লেগেছিল—না, কবিতা নয়,
জীবন বানাতে চেয়ে, যেখানে জীবন লেখা পাপ
প্রশ্ন করো তাকে, সে কি অন্য কোনও অন্তরাল চায়?

সে কি মানুষেরি মতো ভালবাসে কবিকে, গোপনে?
কবিতা-পোশাক ছেড়ে শুতে যায় কবিতার পাশে
কবিকে জিজ্ঞেস করো সে কখনও কবিকে চুম্বন...
থাক, আর প্রশ্ন নয়।
সভ্যতা উন্মাদ হয়ে যাবে।

কবি ও কবিতা

শেষ বাস চলে গেল, এরপর যে আসবে, সে রাত
ফাঁকা রাস্তা, বৃষ্টিপাত, ধোঁয়াধোঁয়া হ্যালোজেন আলো
আসেনি এখনও, তবে আসবে বলে খবর পাঠাল
কী করব? খিদের মুখে তাড়াতাড়ি দু'জনের ভাত ...

তুমি খাটে শোও, আমি বারান্দায় শুয়ে নিতে পারি
আমার মাদুর আছে। অসুবিধে হলে ডেকে তুলো
এখনি ঘুমাবে? নাকি দেখাবে নতুন লেখাগুলো
শেষ বাস চলে গেল! (যাওয়ার গরজ শুধু তারই)

সংসার কেমন চলছে? এত চাপ কাঁধের ওপরে
সমস্ত সামলিয়ে আছ, জানি। লিখছ দারুণ কবিতা
পড়েছি নতুন বই, উৎসর্গঃ তোমাকে, পরিচিতা

ঐ কবিতার সঙ্গে সারারাত থাকতে ইচ্ছে করে

যখন, কেবলমাত্র তুমি

আমি কারও চোখ দেখলে বলে দিতে পারি
তার সঙ্গে প্রেম হবে কি না
আমার কখনও

রাস্তাঘাটে ট্রামেবাসে বন্ধুর বাড়িতে
মাঝেমধ্যে চোখ গিঁথে যায়
অরক্ষিত মুখে

আমি জানি তাদের মধ্যেই কোনওজন
আমাকে ভাসান দিয়ে যাবে
লোনা সর্বনাশে

অনিবার্য দুপুরের মাটি ভেদ করে
উঠে আসবে ঘামে ভেজা পিঠ,
কোনও একদিন

এসব এখনি আমি বলে দিতে পারি
যখন, কেবলমাত্র তুমি
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে...

নিঃশ্বাস ডুবিয়ে আসি জলে

নিঃশ্বাস ফেলিনি আমি
পাছে কেঁপে যায় তোমার ঘরের আলোহাওয়া
পাথর ফেলিনি আমি জলে

পলক ফেলিনি আমি
যদি ভেঙে যায় তোমার এ ভরা নির্জনতা,
সরে গেছি কোলাহল নিয়ে

দূরে, কোনও নির্বাসনে
যেখানে উড়ন্ত শ্বাসে দ্বিপ্রহরে মেঘ জমে
পরিত্যক্ত আকাশের কোণে

সেখানে পলক রাখি
আর ঝরে যায় রাশিরাশি চোখের পাথর
জলে ভাঙে চক্রাকার ঢেউ

এখানেও শব্দ নেই
এখানে বৃষ্টিও নেই, আলো নেই একেবারে
তুমি নেই, ইচ্ছাকৃত ভুলে

তোমাকে এসেছি রেখে
সুবাতাসে,—মনোরম! সুঠাম জানলার পাশে
ফুলদানে ব্যথিত গন্ধরাজ

এসবই তো মানানসই,
পাছে এলোমেলো হয় তোমার বিন্যস্ত চুল
নিঃশ্বাস ডুবিয়ে আসি জলে...

দেখি তুমি কতদিনে

মনে পড়ে, এতদিন দেখেছি যথেষ্ট দূর থেকে
কপালে আকাশ, আর দৃষ্টি গেছে দিগন্তে পালিয়ে
বসে আছ, ভাসমান, টেবিলে পালক খুলে রেখে
গোধূলির লক্ষ্মী তারা দিয়ে গেল বাতিটি জ্বালিয়ে

তোমার পালক শাদা, তোমার আলোর রং নীল
এত মায়া, এত দূর থেকে তাকে অপার্থিব লাগে
তোমার অসুখ দেখব, দেখাও বিষিয়ে ওঠা তিল
পালকের নীচে কোন শরীর পুড়েছে ক্ষতদাগে

সেসব লেহন করব, বরং অসুখ সহনীয়
ও পবিত্র মহামারী, এইবার সংক্রামিত করো
ক্রমশ কঠিন হবে সব প্রতিরোধ, দেখে নিও...

ভেসেছ প্রচুর, আজ দেখি তুমি কতদিনে ঝরো

আয়ত্ত সহন

আরেকটা দিন

সকাল ঘুমিয়ে আছে উশখুশ ঘুমে
বালিশে জলের দাগ—চোখের জলের?
এখনও উপুড় করা দু'চোখের নাও
আহা, এইবার নামো, গাঙে, দিনভর...

বইঠা মনখারাপ, বইঠা বেচারা
দলাদলা জল কাটে, জল কী কঠিন!
মনে হয় কাটবে না, তবু কেটে যাবে
এভাবেই, তুমি ছাড়া আরেকটা দিন...

ফেরা

এতদিন কোন দেশে ছিলে! তুমি জিজ্ঞেস করেছ
—বলো তো কোথায়? জানো? যে দেশে এবার ফিরে যাব
ফিরে যাওয়া কষ্টকর, ছিঁড়ে যাওয়া এমন সময়ে
অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু এও আয়ত্ত সহন,—
এসেছি যেখান থেকে সে দেশে তো এসবি শেখায়,
শেখায়ঃ ভোরের আগে ফিরে আসা, সীমান্তে প্রহরা
এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, কাঁটাতারে ছিঁড়ে গেল মুখ
ওপারেই থেকে গেল আধখানা শাড়ির আঁচল

...এমন জড়িয়ে ছিল ... ছিঁড়ে ফেলতে হলো শেষকালে...

ছায়া

চলে যাব ভাবি, তবু রয়ে যাই
জানি এইবার ফেরাই উচিত
ভরে নিয়ে যাই চোখের কোণায়
স্মরণীয় হাসি, চাহনি ক্বচিৎ

একবার শুধু, আরও একবার
শাদা পাঞ্জাবি, ওখানে দাঁড়াও
ঐ ঘর থেকে ঐ বারান্দা
যেতে যেতে কিছু ছায়া ফেলে যাও

ছায়া ফেলে যাও উদাসীন পায়ে
মুহূর্তগুলি চৌকাঠে স্থির
হয়ে থাক; আমি ওদেরি কুড়োতে
ধারণ করেছি ছায়ার শরীর

ঐ ঘর থেকে হালকা ডানায়
উড়ে আসে স্বর আলোছায়াময়

বন্ধ দোরের এপারে দাঁড়িয়ে
ভাবি চলে যাব, এমনি সময়

তুমি উঠে এলে; তোমার দু'চোখে
পড়ব কী করে! আমি তো ছায়াই
তোমার ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে
আমি ফিরে যাব, আমি ফিরে যাই!

শুধু তোকে ভেবে

না রে তোকে আমি ধরব না এই হাতে
এতে অজস্র বারুদ, লবণ, ঘাম
না রে তোকে আমি দেখাব না গিরিখাতে
কী পরিশ্রমে ঢেউ...ঢেউ আনলাম
তোর ছবি দেখে, তোর তিল মনে রেখে
মেঝে হেসে উঠে বলেছে: কলঙ্কিনী
জানলার পাশে গোধূলি গিয়েছে বেঁকে
যেমন বেঁকেছে আগেও, যা আমি চিনি
তোর পাশে, আর, আরও বেশি, একা একা
গোধূলি আদিম গোধূলির মতো চোখ
অনেক বছর হয়ে গেল, শেষ দেখা
এখনও অনেকদিন দেখা নাই হোক...
ভাঙছে ধনুক, তার লাবণ্যভাঙা
গড়িয়ে পড়ছে, ছিটকে উঠেছে কিছু
কী কষ্ট এই টংকারে, মুখ রাঙা
আনন্দ, আহা, প্রতিটি মরণ-পিছু...

মর্, এক্ষুনি ধর্, আর পারছি না
বারুদে লবণ, লবণের স্বাদ তেতো
না রে, আমি নই তেমনি হৃদয়হীনা
মনে আছে কেউ জ্বালামুখ শুষে খেতো

লাভা উত্তাল, লাভা আসঙ্গবিষ
ফুসফুস ছিঁড়ে দমকে দমকে ওঠে
আজকাল তুই কাকে ভালোবাসছিস?
না রে, মিছে কথা আনিস না ঐ ঠোঁটে
ঠোঁট চেনাচেনা, ঠোঁট কী দারুণ ভিজে
ঢেউ আছড়ানো, ঢেউ কামড়ানো দাঁতে
না রে, তুই নয়, কেউ নয়, নিজে নিজে
তোকে ভেবে ফের মরণ আনব রাতে...

যাওয়া তো নয় যাওয়া

ক'মুহূর্ত, গেরুয়া ট্যাক্সিতে

একে কি জীবন বলবে? এও এক অনন্ত প্রবাহ
অপেলব সর্পিলতা বাসেট্রামে, গেরুয়া ট্যাক্সিতে
এর মধ্যে তুমি আছ, ট্যাক্সিটির দূরতম কোণে
ধুলো ধোঁয়া ব্যস্ত চাপ টেনে নিচ্ছ সহিষ্ণু নিঃশ্বাসে
তোমার বিষণ্ণ ঝোলা, বিসদৃশ কোমল পোশাক
মাঝেমাঝে মেঘ দেখছ, শহরে কখন বৃষ্টি নামে—
সে বৃষ্টি নামার আগে আমি নেমে যাব, তার আগে

না, কোনও জীবন নয়; শুধু এই ক'মুহূর্ত বাঁচা...

উজানের দিকে

রাস্তা পার হয়ে তুমি চলে গেলে অদ্ভুত যুবক
তোমার বয়স হলো বেশ, দু'হাতে জলের দাগ
জমে জমে রেখা হয়ে গেছে ঐ হাতের পাতায়
রেখাগুলি চলমান, রেখাগুলি কেমন অস্থির
মুঠির ভেতর থেকে উপচে গেল তারা, তুমি দ্যাখো
তোমার হাতের নদী ভাসিয়েছে কাদের বসত
দ্যাখো কি? না দেখতে গিয়ে মেঘ করে, চশমার কাচে?

নদী পার হয়ে তুমি চলে যাও, উন্মাদ যুবক
থেমে আছে ব্যস্ত যান, থেমে আছে যাবতীয় স্রোত,

শুধু উজানের দিকে চলে গেল তোমার বয়স...

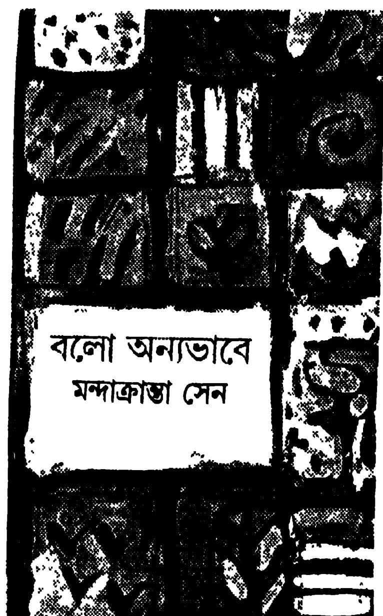
ফ্লাই-ওভারের ওপর থেকে

ফ্লাই্-ওভারের ওপর থেকে
দেখতে পেলাম এই শহরের জ্বর এসেছে
মাথার মধ্যে ঘুরন্ত কাক
যানবাহনের তীব্র চাকায় তুমুল প্রলাপ
নিঃশ্বাসে তার তিন অজগর
জিভের তলায় আগুন নিয়ে এপাশ ওপাশ
চোখের নীচে মবিল-পোড়া
হাতের মুঠি খিম্‌চে ধরে অদৃশ্য গাছ
গাছটা কোথায়? বাসের হাতল
ধরতে গিয়ে পা হড়কে যায় গভীর খাদে
মুখোশ পরা ভিড়গুলো সব
খাদের ধারে মিছিল করে সাঁতার কাটে
সাঁতরে ওঠে আবছায়া মুখ,
মুখের ওপর ঠিকরে পড়া নিয়ন আলোয়
ঠিক চিনেছি ফ্লাই-ওভারের
ওপর থেকে তুমি।
তোমার চোখ-ভরা জল।

শেষ আদরের পর

শেষ আদরের পর নিয়ে আসব একটি ঝরা চুল
জীবন তেমনই থাকবে, নিয়ে যাব মুহূর্তের ভুল
মুহূর্তের জন্যে মৃত্যু, কত জীবনের সমনাম?
সমুদ্র শুষেছ ওষ্ঠে, তোমার কপাল জুড়ে ঘাম
দাও, ঐটুকু দাও, পান করি, পরিশ্রান্ত লাগে
কতটা জীবন ছিল এই শেষ আদরের আগে
কতটুকু পড়ে থাকবে এর পরে, শুধু একটি চুল
আঙুলে জড়িয়ে রাখি, তোমাকে ছুঁয়েছে যে আঙুল...
ছোঁও, আরও একটু ছোঁও, মুহূর্তে উজাড় হোক প্রাণ
প্রিয় পুরুষের কাছে চেয়ে নেব নিভৃত সন্তান

চুলে যার তোমারি মতোন, মহাকাশ...



বলো অন্যভাবে

সূচি

শব্দের মধ্যেই শুধু বেঁধে রাখছি সত্তাকে আমার,
বেঁধে রাখছি প্রাণপণে, আপাতত শব্দমাত্র সার।
জানি না এখনও আরও কতখানি পথ চলা বাকি,
ততদিন শব্দগুলি শুধুমাত্র অক্ষরের ফাঁকি।
লিখে রাখা ধ্বনিগুচ্ছ, ধ্বনিহীন ক্ষোভ, আর্তনাদ;
কতটা অতল হলে প্রতিধ্বনি গিলে নেয় খাদ?
ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি, নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে বুকে,
আশ্চর্য! তবুও শব্দ আলো ফেলছে অন্ধকার মুখে।
ঐ ক্ষীণ রশ্মিটুকু আঁকড়ে ধরি, রশ্মি বেয়ে উঠি,
বারবার পিছলে পড়ি নীচে, আরও শক্ত করি মুঠি—

মুঠিতে লুকিয়ে রাখি আলোধ্বনিময় আয়ুরেখা।
পরবর্তী কোনও জন্মে অর্থ খুঁজে পাবে এই লেখা...

পথ

তোমার চোখের মধ্যে দীর্ঘ একটি পথ থেমে আছে।
এতদিন দেখতে পাইনি, আজ যেই দৃষ্টি ফিরিয়েছ
চোখে পড়ল সেই পথ। মাঝেমধ্যে কষ্ট-পাওয়া বাঁক।
পথের দু'পাশে মাঠ। শস্যক্ষেত। থেমে আছে তাও।
কবে থেকে, সেও যেন তোমার তেমন মনে নেই।
চোখের ভিতরে শুধু জনহীন পথ পড়ে আছে।

অন্যদিকে, কোনও এক যোজনবিস্তৃত জলাভূমি।
সেখানে, এমনকী, পথও, অতি দুরাশার মতো লাগে।
কাঁটাঝোপ, নোনাবালি, কোথাও একটুও ছায়া নেই
এসব পেরিয়ে হাঁটছে কে একজন, তুমি তাকে চেনো?
সে যদি কখনও পথ না-ই খুঁজে পায়, তাকে তুমি
বলবে না, তোমার চোখে একটি পথ অপেক্ষায় আছে?

সত্যিমিথ্যে

মিথ্যে শুধু, দারুণ মিথ্যে, এমনি করে মিথ্যে নিয়ে বাঁচে
কেউ বুঝি কক্ষনো! তোমায় সত্যি হতে হবেই কারও কাছে
আজকে নয়তো কালকে তোমায় বলতে হবে কাউকে: ভালোবাসি
বলতে গিয়ে রক্ত উঠবে মুখে, হয়তো বন্ধ হবে শ্বাস-ই
তবুও যখন বুকের মধ্যে পাথরখানা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে
আর আমি পারছি না— বলে রাখবে পায়ের নিকটে নামিয়ে
তখন, বলো, কেমন মুক্তি! রক্তমুখে বইবে মুক্তধারা
বুকের পাশে বুকের নীচে বুকের মধ্যে অসত্য পাহারা
এমন করে ভাঙতে চেয়েও না ভেঙে কি দুঃখ পেতে আছে!

আমার কাছে না হও, তোমায় সত্যি হতে হবে নিজের কাছে।

অতিথিনিবাস

এবার ক'দিন ছুটি? গতবার বড় তাড়াতাড়ি
ভেঙে চলে গিয়েছিলে সমুদ্রবালিতে গড়া বাড়ি
জোয়ারও পিছিয়ে গেল, বেলাভূমি অনন্ত ভাঁটায়
তোমার আসার চাঁদ গুনে গুনে প্রহর কাটায়
অবশেষে তুমি এলে; চাঁদ যেই জোয়ার ফেরাবে
তুমি বললে, এবারের ছুটি তুমি পাহাড়ে কাটাবে
পাহাড়ের জলবায়ু, বলো, ঠিক কত উষ্ণ চাও
চক্রবাল ছিঁড়ে দিচ্ছি, দিগন্তের ওপারে তাকাও
বলো, কতদূর যাবে? এনেছ কতটা অবকাশ?
ছোটনাগপুর হব? না, শিখরে ছোঁয়াব আকাশ?
শহরে কেমন ভিড়? ওখানে তোমার চারপাশে
প্রতিদিন পরিচিত পথেরা পুরনো হয়ে আসে
তাই ছুটে ছুটে আসা, তাই এই আকাঙ্ক্ষিত ছুটি?
কখনও সমুদ্র আর কখনও পাহাড় হয়ে উঠি
তোমার জন্যেই শুধু, ঐ ক্লান্ত নিঃশ্বাসের কালো
সমুদ্রের বুকে রাখো, উপত্যকা-জানু বেয়ে ঢালো
জীবনজীবিকা ছেড়ে হতে চাও আপাতঅচেনা
এই বিদেশের কথা তোমাদের শহর জানে না
বিষাদ সারিয়ে নিয়ে ফিরে যাও নিজ বাসভূমে
আবার যখন আসবে, আগামী ছুটির মরশুমে
তখন কী চাইবে বলো! অন্য কোনও প্রিয় পর্যটন
সহজ কিশোরী নদী, গভীর চোখের মতো বন
তোরই জন্য আজীবন হয়ে আছি পৃথিবী, আকাশ
তবু তোর গৃহ নই, আমি তোর অতিথিনিবাস।

পার্থিব

ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে
আমি প্রায় দেবীই ব'নে যাচ্ছিলাম আর কি!
যখন তুই এলি, কী প্রচণ্ড মানুষি গন্ধ তোর গায়ে
অথচ আমার নখ তো তখন পদ্মপলাশ
তোর বুকে বেঁধাতে চাইছি বিঁধছে না
আমার ঠোঁটে অমৃতের পুরু সর
তিনদিনের না-কামানো গালে বারতিনেক ঘষতে না ঘষতেই
ফিরে এল লুকোনো ধার
আমি তাও বললামঃ একটু বোস, আমি
মন্দিরে আলো দেখিয়ে আসি।
কিন্তু আমার নখ তো তখন দাউদাউ শিখা,
সন্ধে জ্বালতে গিয়ে তারা
লাফিয়ে পড়ল ঈশ্বরের মারাত্মক কাছে
ঐ জ্বলতে শুরু করল তাঁর উত্তরীয় আমি দেখতে পাচ্ছি,
জ্যোতির্ময় তাঁর মুখ, তিনি বললেনঃ
নড়ো না, ভয় নেই, স্থির থাকো।
...কিন্তু আমি তো আর সত্যি সত্যি দেবী নই, তুই বল,
আমার কেন ভয় পেতে নেই তবে!
এক এক টানে আমি খুলে ফেললাম সব ক'টা জ্বলন্ত নখ,
তারপর উর্ধ্বশ্বাসে বাইরে এসে ছুট...ছুট...ছুট...
একশো আট সিঁড়ি ভেঙে,
তোরণ পেরিয়ে—
পুরোটা অতীত জুড়ে হা হা শব্দে পুড়ে যাচ্ছে
স্বর্গ...

ঈশ্বরের ঘরে আগুন দেবার পাপ
বহন করে চলেছি আজও; তবু,
তবু আমি দেবী হইনি কিছুতেই আমি
দেবী হইনি বিশ্বাস কর
এই দ্যাখ আমার প্রতিটি আঙুলের ডগা ছেঁড়া
নখের জায়গায় দগদগ করছে ঘা

তা হোক, ও পার্থিব ছেলে
তোরই নগ্ন বুকে বনৌষধি,
ঐখানে, শুয়ে থাকা ঘাসে
রক্ত মুছতে দিবি না আমাকে?

একটি কথা শুধাই শুধু

মুখ

তোর মুখে ওসব কী দাগ?
চোখের নীচের দিকে, নাকের দু'পাশ থেকে নেমে
কান্নাজল রেখে গেছে শুকনো মরা অগভীর খাত
কান্নাদের নাম আছে?
সে নামেরই কোনও এক মেয়ে
ঐ খাতে জল দেবে? বর্ষা দেবে, আগুনের দেশে?

নদী আনতে গিয়েছিলি, সে যেন অনেক দূরে থাকে
...পথ শুধু পথ শুধু পথ শুধু পথ ঘুরে ঘুরে
সারামুখে পায়েচলা পথ নিয়ে ফিরে এলি শেষে!

তিল

ও তোমার কে হয়, সুজন?
তুমি যার নিকটে থাকো না
যার বাঁ কণ্ঠার হ্রদে জল,
জলে একটি তিল ভেসে আছে,
তিল যদি বলেঃ ডুবে যাই...?
তুমি তো ওর সঙ্গে থাকো না,
তখন কী করবে বলো তুমি!
তুলে নিয়ে ঠোঁটের নৌকোয়
নিয়ে যাবে, তোমাদের ঘাটে?

যে ঘাটে তোমার নদী আছে,
তুমি তার বাঁধা নৌকো হও

আর দ্যাখো, তোমার কোথাও
তিলধারণের নেই ঠাঁই...

কী করে যে বুঝতে পারলি কেন আমি হঠাৎ চুপচাপ!
অন্যমনে তোর দিকে চেয়ে
তোকেই যে ভেবে যাচ্ছি আমি
সে কথা কী করে জানলি? আচমকাই জোরে হেসে উঠে
ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিলি আমার কপালে উড়োচুল...
আমাকে ফেরাতে চাইলি?
নিজেকেও চাইলি বুঝি সরাতে, আমার মন থেকে?

ভয় পাস না, ফিরে আসছি
উলটো মুখে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটা কষ্টকর বাঁক

ঠোঁট থেকে ঠোঁটে এই ফুঁ-এর দূরত্বটুকু থাক।

শপথ: দু'হাজার

হাজার বছর আগে অন্য ছিল সভ্যতার মানে
হাজার বছর পরে হয়তো হবে অন্যতর কিছু
আমি শুধু জানি আমি ঘুরে মরছি কীসের সন্ধানে
হাজার যুগের পার চলেছি কীসের পিছু পিছু

মানুষ প্রথম যেন ভালোবাসতে শিখেছিল কবে ?
মাটিকে আদর করে কবে তাকে পরাল ফসল?

সেসব পুরনো কথা মনে যদি করতে পারি তবে
জানি মনে পড়ে যাবে কী যে সত্য, কতটুকু ছল!

যদিও ছলেরই নামে জ্বলে উঠছে এত সমারোহ
সশব্দে এগিয়ে যাচ্ছি, জানি না কোথায়, কোনদিকে
স্রোতে ভেসে যাচ্ছে কুটো, মুঠোভর্তি বুদ্বুদের মোহ
বিজয় ঘোষিত হচ্ছে শুধু সেই স্রোতের নিরিখে

আমি স্রোত ঠেলে ঠেলে উঠে আসি পুরনো উজানে
পাড়ে উঠে এসে ফের শুরু করি শান্ত বীজ বোনা
সভ্যতার তীরে বসে বলি ছেলেটির কানে কানে
হাজার বছর ধরে আমরা আরও ভালোবাসব, সোনা!

চাঁদের পাহাড়

১.
পাহাড়ের বাঁক ঘুরে চোখে পড়ল শুয়ে থাকা গ্রাম
ঘুম ঘুম ধানক্ষেত চিরে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পথ
আমিও সবুজ ঢালে ততক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলাম
যতক্ষণ-না তুমি এসে স্পর্শ করলে সুখস্বপ্নবৎ...

২.
ওপরে আকাশ ছিল, দূরে ছিল কৌতূহলী নদী।
আড়াল ছিল না কোনও; সেখানে আড়াল অপরাধ
আমূল খুঁড়েই নিলে ঘাসে ঢাকা মৃত্তিকার স্বাদ
মাটি শুধু বলেছিলঃ সোনা, কেউ এসে পড়ে যদি!

৩.
এই সেই পথ যাতে হাঁটতে হাঁটতে বেলা পড়ে আসে
সন্ধে নেমে আসে ঠিক, যেন এই পথের হৃদয়
পড়ন্ত রূপসী সেই আলোটিকে এত ভালোবাসে
তারই স্বপ্নে এই পথে অন্তহীন সন্ধে হয়-হয়...

৪.
অস্তাচল নামে ঐ টিলাটির চূড়া উঠল জ্বলে
অন্ধকার নেমে এল, মুছে গেল বাঁকা রৌদ্রখানি।
দমবন্ধ, অপেক্ষায় বসে আছি সুযোগ-সন্ধানী
এখানে এসেছি আমরা টিলা থেকে চাঁদ ধরব বলে।

৫.
টিলার ওপর থেকে চাঁদকে কে গড়িয়ে দিল নীচে
লাফিয়ে লাফিয়ে চাঁদ উঠে গেল আরেক পাহাড়ে
রাত বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে চাঁদের দুরন্তপনা বাড়ে
আমরাও দুরন্ত, সোনা, দৌড়াব চাঁদের আগে-পিছে...

৬.
ভাবিনি তোমার সঙ্গে কখনও এমন দেখা হবে
এমন চাঁদের নীচে খুলে যাবে পুরনো শরীর
ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁদ, জোছোনাও কেমন অস্থির
আত্মহারা দুটি প্রাণ মেতে গেছে সৃজন উৎসবে।

আভ্যন্তরীণ

মন্দ

ভিতরে ভিতরে শুধু তোর কাছে যেতে ইচ্ছে করে।
এত পুরুষের কাঁধে হাত রাখি, কেউ তবু
তোর মতো নয়।
দেহপ্রান্তে এসে প্রেম লুটিয়ে পড়েছে। তাকে টানি।
কে তুমি? তোমার দৃষ্টি তার মতো হয়ে উঠেছিল
এই তো একটু আগে। মুহূর্তের ভুল, তবু
সেই ভুল মুহূর্তের টানে
ভিতরে ভিতরে শুধু তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে
যাকে আমি ভালোবাসি।

সে আমাকে মন্দ বলে জানে।

ভিতরের ঘর

যতবার দেখা হলো ব্যস্ততার ফাঁকে
কী নিপুণ হেসে তুমি এড়ালে আমাকে!
ভালো লাগে, জানো! ভালো লাগে এই ছল
এত দূরে আছ তবু এমন প্রবল ভাবে টানো!

মনে হয় তোর কাছে যাব না যাব না
বুকের ভিতরে, আহা, পুষেছি কামনা
কামনা সোমত্ত হলো কতদিন পরে
তার সঙ্গে শুয়ে আছে ভিতরের ঘরে, —অভিমানও।

কাণ্ডারী

রাতের রেলগাড়ি উড়িয়ে নিয়েছিল হাওয়া
দারুণ মৃদু আলো অন্ধকার থেকে আরও
অলৌকিক যেন, যেন আমার মতো তারও
জড়িয়েছিল ঘুমে কোনওরকমে চোখ- চাওয়া

বাইরে ভাসছিল তরল রাত্রির রং
ভেতরে পাঁচজন শরীর ঢেলে দিয়ে শুয়ে
দু'চোখ বুজে আছি। হঠাৎ মন দিলে ছুঁয়ে
কেমন করে যেন! দেখিনি তুমি কোন্ জন!

দেখিনি, না-ই দেখি, বুঝতে পেরে গেছি কে সে।
আমরা পাঁচজন। সবার মুখ চেনা- চেনা,
আবছা আলো ছিল, তবু লুকোতে পার- লেনা,
সরিয়ে নিলে চোখ চোখের কোণে মৃদু হেসে।

তখনই শুরু হলো আবার সেই তরী বাওয়া।
তুমি তো কাণ্ডারী; আমি কি নৌকো, না নদী?

জানি না। শুধু জানি আজ না ফেরা হয় যদি,
রাতের রেলগাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাক হাওয়া...

মন্দাক্রান্তা

নিখোঁজ নাবিকের গান

মুশকিল দিনকাল ধরেছি ভাঙা হাল ঢেউ তো উত্তাল আকাশ ঘোর
উত্তর দক্ষিণ ভুলেছি বহুদিন; ভ্রান্ত, দিকহীন বরাতজোর
ধরবার মাত্রই— আরে! সে গেল কই! আস্থাহীন নই, তবুও আজ
বিশ্বাস বদলায়, যেভাবে ভেঙে যায় অস্তসন্ধ্যায় মেঘের সাজ
নক্ষত্রের রাত বাড়িয়ে দেবে হাত, সেই আলোকপাত কেমন দূর?
কোন্ পথ কোন্ দিক কে বলে দেবে ঠিক, উগ্র আস্তিক মুমুক্ষুর
ঈশ্বর কোন্ জন? তাকে যে প্রয়োজন, —নয় নিমজ্জন সুনিশ্চিত
ঝলসায় বিদ্যুৎ, আকাশে আলোদূত, আমরা প্রস্তুত... কোথায় জিৎ?

আবিষ্কার

তোর সঙ্গেই প্রেম হবে, তা ছিল স্থির জন্মলগ্নের মুহূর্তেই
আজ হৃৎপিণ্ডের অনতিদূরে পথ, আর অপেক্ষার সময় নেই
শুনশান চারদিক শুধু কি দু'জনের সাক্ষাতের এই অনুষ্ঠান?
তোর জন্যই সব আগামী আয়োজন, এ যাত্রায় তোর পরিত্রাণ
নেই, তুই জানতিস? না হলে জেনে রাখ আজকে তোর নাম আবিষ্কার
পাপ আর পুণ্যের সীমানা মনে নেই, থাক বা নাই থাক হদিশ তার
ঐ হাত ধরবই যে হাতে হরিণের শৃঙ্গ-মখমল, ঝিনুক নখ
একসঙ্গেই পথ হেঁটেছি এতদিন হাঁটতে হাঁটতেই —কী ধকধক!
নিঃশ্বাস অস্থির, শিরা ও ধমনীর রক্তচাপ কোন্ জলোচ্ছ্বাস
বন্যার সংকেত পেয়েছি, তবু শোন্, জলকে ভয় নেই জলেই বাস
জল সেই ঘর, যার ভিতরে আমি আজ রাখছি আশ্রয় —তোমার মুখ
তোর নাম, যাই হোক, নামে কী আসে যায়! তুই আমার সেই আগন্তুক!

জলছবি

মেঘ বৃষ্টির সাজ	পরাব তোকে আজ	রুক্ষ রোদ্দুর ,	আমার হোক
মল্লার বান্ধব	তোমাকে দেব সব	বজ্র বিদ্যুৎ	মারাত্মক
উন্মুখ সন্ধান	করেছে দেহ, প্রাণ	অঙ্কুরোদ্গম-	অপেক্ষায়
আজ সেই বৃষ্টির	আদরে এ শরীর	করবে সঙ্গম	পাগলপ্রায়
উদ্দাম, উন্মাদ	ধুয়েছি অবসাদ	শুষ্কতার কাল	অতীত দূর
ছাই আর অঙ্গার	যা ছিল তা আমার,	তোর এ উত্তাল	সমুদ্দুর
প্রান্তর, প্রস্তর	তৃষিত চরাচর	দীর্ঘ বঙ্কিম	কঠিন পথ
তৃষ্ণার অঞ্চল	পেরিয়ে এসে জল	ছুঁচ্ছে অন্তিম	ভবিষ্যৎ

পরবাস

আজকাল তার খুব	পুরনো মনে হয়	চুম্বনের স্বাদ,	আলিঙ্গন
স্পর্শের বিদ্যুৎ	জাগে না রোমে আর।	উন্মাদের সেই	সমর্পণ
ফেরবার পথ চায়,	ফিরিয়ে নিতে চায়	উষ্ণ নিশ্বাস,	নিবিড় হাত
সেই সব ইচ্ছের	কীভাবে বাঁকে ঘাড়?	কোন্‌দিনের পর	অকস্মাৎ
ভুল অন্তর্বাস	পোশাকে ঢাকে সব	জিহ্বাচিহ্নের	অতীত পাপ
সম্পর্কের খুব	ভিতরে প্রতিদিন	ক্লান্ত অভ্যাস,	নিরুত্তাপ
চৌকাঠ বদলায়।	শরীরে পরবাস,	শীতঋতুর কাল	বছরভর
টানটান শয্যার	দু'পাশে দু'জনের	দিগ্বিদিকহীন	দ্বীপান্তর...

উলট-পুরাণ

আজ আর মন নেই	আমারও বেড়াবার	রূপকথার নীল	তেপান্তর
রাজপুত্রের সেই	বাঁকানো তরবার	লক্ষ মুশকিল	কাটার পর
চুপচাপ ঘুম যায়।	অথচ আজও লাখ	রাক্ষসের পাল	কী তৎপর
দুর্জয় স্পর্ধায়	পুড়িয়ে করে খাক্‌	রাজ্য-বানচাল	হাজার ঘর!
দুর ছাই, গল্পের	এভাবে কেন শেষ!	ব্যঙ্গমার সব	স্মরণ নেই
তারপর ধ্বংসের	মোকাবিলাতে বেশ	আসবে বিপ্লব,	ফারাক এই—
ঐ যুদ্ধের দিন	রাজা ও রাজাদের	ভুল ও ভ্রান্তির	বিরুদ্ধেই
আজ ঘোর সঙ্গিন	সময়ে এস ফের	উলটো মুক্তির	শপথ নেই।

জ্বর

রাত্রির ধুম জ্বর, তাড়সে সারামুখ লালচে, থমথম, শ্বাসের ঝড়
ফুলগাছ উলটোয়, নিমেষে উড়ে যায় ছিন্ন ঘাসফুল, নিখোঁজ খড়।
ধাক্কাও সামলায় রোগাটে বাড়ি, তার দরজা জানলায় কপাট নেই।
কালবৈশাখ সেই সুযোগে লুটে নেয় বন্দী ধানক্ষেত সে রাত্রেই।

রাত্রির হুঁশ নেই, ক্রমশ বেড়ে যায় উত্তাপের ঘোর, নাড়ির বেগ
লুট হয় হোক তার জমিতে বোনা ধান, দেখছে তার চোখ ঝড়ের মেঘ
মেঘ কার ডাকনাম? ও-নামে যেন কেউ আলতো ছোঁয় তার কপাল, বুক
আহ্ জ্বর, ভাগ্যিস! শেষে তো এনেছিস জলপটির এই শীতল সুখ...

শ্বাসকষ্টের রাত

শ্বাসকষ্টের রাত তাকে কি কথা দেয় আনবে একদিন ঘুমের মাঠ?
ছটফট ছটফট, বাতাসও কী কঠিন! নিশ্বাসের নেই সহজ পাঠ
প্রাণপণ চেষ্টায় কখনও জিতে যায় ক্লান্ত ফুসফুস দু'-একবার
উত্তাপ চায় বুক, ভিতরে জমে হিম শক্ত নিশ্চল পাষাণভার

শ্বাসকষ্টের রাত, তুমি কি ওকে খুব ভাবছ দুর্বল, নিরাশ্রয়?
ভুল, ভুল, সব ভুল, এভাবে কোনওদিন জিৎ বা হারবার হিসেব হয়!
তার সব হারজিৎ গোছানো আছে এক ছোট্ট ডাইরির পাতায় ঠিক
ঘুমহীন রাতভর ক'খানি লেখা হয়— রাত বরং তার হিসেব নিক।

চোখ

যেই তোর ঐ চোখ এ চোখে রেখেছিস ওম্‌নি চলকাই কথার খেই
আর তুই বলছিস ওভাবে তাকানোর কিচ্ছু নেই, আর, কিচ্ছুই নেই!

ভরপুর সন্ধ্যায় জমাটি আয়োজন, আড্ডামশগুল বসার ঘর
ঘরময় লোকজন, আলোতে ভাসমান চূর্ণ উল্লাস, কলস্বর

সব্বাই ছলছল, সকলে বেসামাল, ভাসতে ভাসতেই কেমন চুর
তার মধ্যেই এক কুয়াশাভেজা ক্ষেত, ঝাপসা আলপথ অনেক দূর

সেই ক্ষেত তোর চোখ, সে চোখে ফসলের স্বপ্ন ডাক দেয় অজান্তেই
আর তুই বলছিস এভাবে তাকানোর কিচ্ছু নেই, আর কিছুই নেই!

নীলনদের তীরে

তোর ঐ মুখময় ছড়ানো ইতিহাস সভ্যতার ঘুম ভাঙার ভোর
দৃষ্টির সামনেই বিছিয়ে আছে পথ, নীলনদের তীর; সেসব তোর
শস্যের মাঠ নয়? এখনও কবেকার সেই গমের শিষ, পশুর ছাল
শয্যার প্রান্তেই বিছিয়ে রেখেছিস জন্মজন্মের আয়ুষ্কাল!
চুপচাপ ভাবছিস কীভাবে যাবে দিন, সামনে দলছুট ভবিষ্যৎ
ভয় নেই, নীলনদ! তুমি তো জানো সব শুকনো খাত আর সজল পথ
দিনকাল কাটবেই, —না, একাএকা নয়; চাইলে একজন তোমার হাত
ধরবার জন্যেই এসেছে এতদুর,... পূর্বনিশ্চিত এ সাক্ষাৎ
তোর সঙ্গেই ফের দেখা যে হবে তার জানত তার মন যাবৎ দিন
সেই জন্মের ভোর.. সে ছিল সেখানেও, হয়তো কুণ্ঠায় আলাপহীন
তারপর বারবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়, জন্মমৃত্যুর আবর্তন
যেই তোর হাত ছোঁয় তখনই ছিঁড়ে যায়, ঘূর্ণি পাক খায়, কী মন্থন!
আজ আর একবার থেমেছে বালিঝড়, চিনছে দুই হাত পরস্পর—
এই দ্যাখ, ধানশিষ, আমাকে ভেবে নিস তোর সে উন্মাদ জাতিস্মর!

বলো অন্যভাবে

যে কথা যেমনভাবে বলা হয়ে গেছে,
আজ তাকে অন্যভাবে বলো।
বলোঃ ভালোবাসো; কিন্তু সহজে বোলো না মিছিমিছি।
ভালোবাসতে বাসতে দ্যাখো একদিন কান্না আসে কি না,
তারপর অস্ফুটস্বরে নিজেকেই বলোঃ আরও... আরও...

জানি বহু দুঃখ জমে আছে।
তবুও, দুঃখের কথা অযতনে রেখো না ছড়িয়ে
হাসতে হাসতে নিজেকে আদর করো। বলোঃ আহা, থাক।
দুঃখে তোকে মানিয়েছে, একথা যে জানে, সে-ই জানে!

যে কথা চিৎকার করে বলেছে প্রত্যেকে বহুবার,
তাকে আর না-ই বললে তুমি।
নিঃশব্দে পালটিয়ে দাও, গোপনে উলটিয়ে দাও দান...
ভিড়ের মাথায় চেপে দিনবদল ধাক্কা দিলে দোরে,
তুমি আলতো হেসে বোলোঃ যাই—!

ক্ষত ও ক্ষুধার কবিতা

খরা

পশ্চিম দিগন্তে মেঘ থেমে আছে ঈশ্বরের মতো,
ভাবছে, —এ পৃথিবীতে এখনও কি নামার সময়
আসেনি আসেনি তাই জ্বলে যাচ্ছে জ্বলে যাচ্ছে বুক!

দিগন্তের অল্প একটু উপরেই ঈশ্বরের মুখ
জমে আছে, পৃথিবীতে নামতে চাইছে, অথচ কী ভয়
দু'জনের মধ্যবর্তী জলবায়ু বড় অসম্মত

পশ্চিম আকাশে তাই রক্ত নেই কোনও, ... শুধু ক্ষত..

দিনান্তে

দিনান্তে ভাতের সামনে খেটে খাওয়া মানুষের মতো
সমর্পিত, করুণ ও নত
তার কাছে এসে বসি। ভালোবাসা চুপ করে থাকে।
আত্মহারা আঙুলের ফাঁকে

ভাতের গরাস ওঠে, লেগে থাকে, ঝরে যায় কিছু,
যত ক্ষুধা তত মাথা নিচু।
দিনান্তে ভাতের সামনে স্বীকারোক্তি, সব সত্যি কথা
তারও চেয়ে সত্যি নীরবতা।
ভালোবাসা নুন-ভাত। আমার তো দোষ নেই কোনও
...সারাদিনে খাইনি এখনও...

স্বপ্নরূপেণ

আমি বিশ্বাস করি, তুমি পারো।

তোমার পরনে সস্তা সিন্থেটিক শাড়ি,
হাতে প্লাস্টিকের গোলাপি প্যাকেট,
আর মাত্র শাঁখাপলা। ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই দু'পায়ে।
তুমি খুব সেফটিপিন ভালোবাসো মনে হয়।
মনে হয়, আর কিছু ভালোবাসার কথা
মনেই হয়নি তোমার কখনও।

বোঝা যায়, তুমি বিজ্ঞান জানো না, কাব্য নয়।
গান কিংবা আলপনায় সামান্যও গুণপনা নেই
(যাদের ওসব থাকে তারাও একটু উজ্জ্বল হয়)
তোমার জলুস নেই, মুখের চামড়া খসখসে।
এমনকি, টিকিট কাটছ, খুচরো পয়সা মেলাতে পারছ না,
কন্ডাক্টার মুখ করল। তোমার দু'চোখে ভয়।
ফাটা ঠোঁটে অর্থহীন হাসি।

সব্বাই হেনস্থা করছে। বাস থেকে নামলে কোনওমতে।
আচ্ছা বলো, এবার কী করবে তুমি...বাড়ি যাবে...বর ঘরে নেই
ছেলেমেয়েরাও নেই, রান্না করবে ভালোমন্দ কিছু?
তাও বুঝি পারো না তুমি! তেল নেই, গোটা দুই আলু পড়ে আছে
ওসব বললে কি হয়! যারা পারে, অন্নপূর্ণা, চালেডালেও অমৃত বানান

রাত বাড়লে একে একে ঘরে ফিরল তোমার সংসার।
খাওয়া ও বিছানা হলো। রতি হলো। কিছুই পারলে না।
তারপর মধ্যরাত্রে, চুপিচুপি ছুঁয়ে দিলে স্বামী আর সন্তানের মুখ
আর ওরা স্বপ্নে স্বপ্নে নীল হয়ে গেল।

আমি বলেছিলাম, তুমি পারো।
শুধু কেউ বিশ্বাস করল না।

কলহান্তরিতা

রান্নাবান্না সারা হলো। এখন অনন্ত অবসর।
ও অফিসে চলে গেছে। পড়ে আছে ফাঁকাফাঁকা ঘর।
পড়ে আছে ছাড়া জামা। দু'পাটি ঘরোয়া নীল চটি।
স্নানঘরে পড়ে আছে জবাকুসুমের আবহটি।
আরও কী কী পড়ে আছে?...চতুর্দিকে খান খান রাগ...
ঝগড়া হলো বেরোনোর ঠিক আগে, যেন তারই দাগ
যেন, দম্ভভরে তোলা সেই ছিন্ন জয়ের পতাকা
ছড়িয়ে রয়েছে এই ঘর জুড়ে।
...ঘরখানি ফাঁকা...

যাই বলে না

যাই বলে না, বলো আসি
খুঁজতে গিয়ে তোমার হাসি
চোখ পড়ে যায় চোখের জলে।
কী বলতে নেই? কখন বলে
সেসব কথা, যা বলতে নেই
কারুর কিংবা নিজের কাছেই!
বলতে গিয়ে বুক ভেঙে যায়
ওসব জানার তোমার কী দায়!

দুপুরবেলা সিঁড়ির কাছে
অনেক কথা থমকে আছে।
থমকে থাকুক, থমকাতে হয়;
বুকের মধ্যে চমকালো ভয়।
চমকালো জল চোখের কোলে,
সিঁড়ির মুখে প্রপাত খোলে
সেই মুহূর্তে আমিও জানি
ডুববে আমার নৌকাখানি।

নৌকা ডোবে, নৌকা ভাসে।
তীরের কাছে ফিরেও আসে;
আধভাঙা পাল, ঝড়-লাগা ছই,
দুপুরমেঘে ঝড় এল কই!
ঝড় আসেনি, আকাশ ভাঙে
বৃষ্টি নামে গহীন গাঙে।
বৃষ্টি বুঝি যাবার সময়
আসছি বলে?
না, বলতে হয়?

বৃত্ত

এখনও পুরনো রাস্তায়
পায়ে পায়ে ধুলো-আস্তর।
নিয়ে দেখি বেলা নেই আর,
ভুলে ভুলে দিশা ছয়লাপ।
চোখে পড়ে চেনামুখ, তার
মরীচিকা? যদি হয় হোক।
ওরই টানে এতবার ভুল
তবু দেখি আরও একবার
তারও তো পুরনো আহ্নিক?
চেনাপথে ঘোরা বারবার,

হাঁটছি আর
লক্ষবার
সামনে ভুল,
দীর্ঘ পথ,
মুগ্ধ চোখ,
সেই তো এক
পর্যটন,
সন্ধ্যামুখ
সেও তো এই
মুক্তিহীন,

খাচ্ছি ঘুরপাক।
লক্ষ্যহীন বাঁক
ভুলকে টপকাই।
যেইদিকেই যাই
দৃষ্টি ঝলমল
মুক্ত অঞ্চল!
যাত্রা শেষহীন।
ছুঁচ্ছে এই দিন,—
অভ্যাসের দাস?
ক্লান্ত বিশ্বাস।

সে কি জানে, কোনও একদিন   শেষ হবেই   এই আবর্তন?
আমারও বহুদিনের সাধ   বৃত্তাকার   কক্ষ বর্জন।
জানি না কতটা সম্ভব   উচ্চাশায়   সৃষ্টি ভাঙচুর,
তবু এ পুরনো পথঘাট   পালটে যাক।   জন্ম নিক দূর।
যে দূরে সীমানা বদলায়,   বদলে যায়   মুগ্ধ সেই চোখ।

পথে নামিয়েছে যার ডাক   আজকে তার   অন্য নাম হোক...

যুদ্ধ পরবর্তী কবিতা

এতবার ধ্বংস হয়ে গেছি, দ্যাখো, তবু ধ্বংস অভ্যাস হলো না।
আজও এত কষ্ট হয়, ধ্বংস হতে বড় কষ্ট হয়।
প্রত্যেক নিঃশেষ থেকে, দ্যাখো, সে-ই মৃত্যু থেকে উঠে
ফিরে যাচ্ছি জন্মলগ্নে, ফিরে যাচ্ছি প্রাণপণে,
হামাগুড়ি দিয়ে, বুকে হেঁটে।
এতবার, এতবার মরি, দ্যাখো, তবু মৃত্যু বিশ্বাস করি না।
যুদ্ধক্ষেত্রে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে ফিরি মুখ, ঝরামুখ।
মাতৃপিতৃমুখ ওগো, সন্তানের মুখ ওরে, ওঠো—
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী যুদ্ধটির আগে
আবার বসতি গড়ব। আরেকবার ভালোবেসে নেব।
অস্ত্র পুঁতে ধান করব আদিগন্ত ক্ষেতে।

এতবার পুড়ে গেছি, ভেসে গেছি, তবু দ্যাখো, এখনও ভুলিনি
সমস্ত ধ্বংসের পরও মানুষ কেমন করে জেতে...

...তোমার অনীহা, অন্যমন

অপছন্দ

জানি, আমি তোমার পছন্দমতো নই।
সহ্য করো। সহ্য করো তবু।
আমাকে তোমার সামনে দাঁড়াতে দেবে না? চোখ
নিচুদিকে রাখতে চাই,
দেখতে চাই পাড়-ভাঙা নখ।
কতদিন আগে কাটা? নেলকাটারে বেশি ধার ছিল?
আহত নখের চাঁদে রক্ত ... জ্যোৎস্না ... রক্ত জমে আছে।

ঐ নখে, উঁহু, শুধু নখে নয়, পায়ের পাতায়
জিভ দিয়ে তুলে আনছি তোমার অনীহা, অন্যমন।
জানি আমি, এতে কিছু অসুবিধে হয়।
সহ্য করো, সহ্য করো তবু।

আমার জিভের ধার নেলকাটারের চেয়ে বেশি?

অপেক্ষা

আজ সারাদিনে আমি বহুবার বলেছি নিজেকে
এইবার বেঁচে ওঠো, ভালো থাকো,
চলে ফিরে বেড়াও খানিক।
বহু যাজ্ঞার পর সে তোমাকে যা দিল,—অনেক।
এর বেশি আশা তুমি কখনও কোরো না, পস্তাবে।

আর দ্যাখো, এত কথা কানেই নিল না ভোলামন।
শিরা কেটে বসে আছে,
ঢুলছে,
ঘুমোতে পারছে না।

পাষাণ

পুরুষ তোমার বুক পাষাণের মতো
শুতে দাও শুতে ইচ্ছে করে।
পাষাণে ঘষেছি মুখ, কী ভীষণ ক্ষত
ওষ্ঠাধরে!

ক্ষত কী বেহায়া দ্যাখো শুকোতে চাচ্ছে না,
লুকোতে চাচ্ছে না তার মুখ
যাচ্ছেতাই লাগছে, তবু মনে তো হচ্ছে না
অনিচ্ছুক!

পাষাণ শীতল ওগো পাষাণ কী ধু ধু
পাষাণে থুয়েছি কাঁদাকাটি
পাষাণে মাখিয়ে আসি এক মুষ্টি শুধু
কাঁচামাটি।

পুরুষ তোমার মুখ মাটিতে মাখানো
ধুতে দাও ধুতে ইচ্ছে করে
ক্ষত তো পুরনো, তবু ছোঁয়ালে এখনো
রক্ত ঝরে...।

উৎসব

ওরা বলল: এখানে উৎসব হবে। ওদের উৎসব।
লোক আসছে। লোক ঘুরছে। রাস্তায় শামিয়ানা টাঙানো।
জনে জনে এসে রাজপুত্রের খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে ওরা।
ওদের রাজপুত্র।

চারণ গান গাইছে। তোমার প্রিয় পদ। শেষ হলো।
তুমি আসতে পারো ভেবে বারে বারে শুরু হচ্ছে পাঠ।

উপাসনাগৃহদ্বারে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে কেউ।
ঈশ্বর আসেননি।

ভোর থেকে উপোসী আছি। শুদ্ধবস্ত্রে। স্পর্ধা করেছি।
অকালবিধবা আমি, তায় ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে;
ঈশ্বর তোমাকে যদি দূর থেকে একটিবার দেখি
অকল্যাণ হবে কি তোমার?

পুজোর লেখা

পুজো ১

রাত দশটা বেজে গেলে
ঝিমঝিম করে পুজো নেমে আসে এসব পাড়াতে।
বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে।
এখনও মাটির থেকে বাষ্প উঠছে। জমে থাকছে।
স্মৃতির মতোই তারা হিম।

বৃষ্টি কবে শেষ হলো?

শব্দহীন ঝরে পড়ছে ভিজে নিয়নের বাতি, নীল।
গলির মোড়ের দিকে যাব না, ওখানে ঠিক পুজো
দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি জানি।
কী নিঃশব্দে বেজে উঠছে ঝমাঝম মনখারাপ তার!

চোরা হিম। বুক ব্যথা। চোরা গন্ধ, — শিউলি, না, ছাতিম?

নিঃশ্বাস নেব না আর। অথচ এখনও বহু সাধ
বাকি পড়ে রইল, জানো!

পুজো এসে গেল তাড়াতাড়ি...

পুজো ২

যে সমস্ত গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
তাদের এখনও কোনও নাম দিতে পারেনি মানুষ।
গত বছরেও তারা এরকমই ফাঁকাফাঁকা ছিল।
মনে আছে। বেশ মনে পড়ে...

রাস্তায় তখন শুধু নিশাচর উত্তুরে বাতাস,
আর, আমি।

আসলে, এসব গলি বহুদিন হলো, মরে গেছে।
মাটি ফুঁড়ে উঠে বসে শুধু এই পুজোর সময়
আমাকে ঘোরাবে বলে।

পুজোগন্ধ তাড়া করে।
পাগলের মতো আমি ঘুরে মরছি মায়াবী গলিতে...

পুজো ৩

এবার পুজোয় তুমি তাকে দিও, দু'একটি দুপুর।
দরজাবন্ধ তিনতলার ঘর।

কে মেয়েটি? নতুন শাড়ির গন্ধ মেখে,
মণ্ডপের ভিড় ফেলে, দমবন্ধ, চুপিচুপি
উঠে যাচ্ছে তিনতলার ঘরে?
সে কি জানে, একা আছ? জ্বলেপুড়ে আছ অপেক্ষায়?
সে-ও জানে!
এ কথাটি এ বছর ঐ মেয়েটিই জানে বুঝি?

ঘোর বিপদের মতো পুজো এসে পড়েছে এদিকে;
আমি পালাবার পথ খুঁজি...

পুজো ৪

এখনও, যখনই আমি শিউলিফুল পাড়ি,
সে এসে দাঁড়ায়, হাত পাতে।
আমি তার হাতে দিই। হাত উপচে পায়ে ঝরে পড়ে
রাশিরাশি ফুল, আহা,
পা দুটি শিউলির চেয়ে শাদা...

তখনই জাদুর মতো ঢাক বেজে ওঠে কাছাকাছি।
পঞ্চমী লাগার আগে মণ্ডপ সম্পূর্ণ হওয়া চাই।
সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হাওয়ায় ত্রিপল ওড়ে, মাঠে কারা আলো দিয়ে গেল।
আলোর সীমানা ঘেঁষে শিউলিগাছ
একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কতকাল।

আমি ফুল পেড়ে চলি।
সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কাছে।
কী এক বাতাসে ওড়ে তার চুল, দাড়ি ও পাঞ্জাবি...

যুগে যুগে পুজো ফিরে আসে...

পুজো ৫

শহরে উৎসব শুরু হবে।
এসব রোমাঞ্চ-দিনে বড় সমস্যার মুখে পড়ি।
পুরনো সম্পর্কগুলো সার বেঁধে দেখা করতে আসে;
ভেঙে যাওয়া, ভুলে যাওয়া, অসফল সম্পর্কসকল
ছায়া হয়ে ঘিরে ধরে ঠিক যেন ভাসমান ভিড়।

আমি পরিত্রাণ চাই। চলে যাই যে কোনও মণ্ডপে।
বাস্তবসম্মত আলো, বাস্তবসম্মত লোকজন।
তাও যেন মায়া মনে হয়।

আজও এত মায়া তুমি সৃষ্টি করতে পারো, মহামায়া!
তবে কেন এমন করো না—

অন্তত পুজোয় যাতে সবার নতুন বন্ধু হয়...

দেবীজন্ম

যে ছেলেটি আমার মনের মতো নয়,
সে যদি আমার বুকে মাথা রাখে, বুক খসে যাবে?

ভেবেছি অনেকবার, তবু, সে যখন কাছে আসে,
পাগলের মতো শুধু ছুঁতে চায় মুহূর্তের প্রেমে.
আমারও কেমন লাগে।
আমি জানি। এইসব কষ্ট জানি। ছোঁওয়া জানি।
ছুঁতে চেয়ে থেঁৎলে যাওয়া জানি।
যখন ঈষৎ দূরে বসে থাকে আমার মনের মতো ছেলে,
আমি তো এমনই করি,
মাথা খুঁড়ি পাথরে, শরীরে!
সে কবে আদর করবে, শুরু হবে মানুষ জন্মের

ততদিন—প্রেম নয়, আমি কোনও করুণার দেবী...

রোদ-নামচা

ওর সঙ্গে ভাব করো

এত দূরে এসে রোদ পালটে ফেলে তার সূর্যনাম
অন্য হয়ে যায়।
এখানে রোদের নাম বৃষ্টি কিংবা মেঘ হতে পারে
অথবা পাহাড় বলো, পাহাড়ের ছায়াতে যে গ্রাম

কী ঘুম কী ঘুম বলো! তাকে তুমি হঠাৎ কখনও
রোদ বলে সম্বোধন কোরো...

পাহাড়ের ঢালে ওম্‌নি বেজে উঠবে ঘন্টা—টং...লং...
রোদ্দুর দাঁড়াবে এসে শাদাকালো গোরুদের চোখে
এতদূরে এসে রোদ হলুদ ঘাসের ফুল হয়ে
মুখ নুইয়ে হাসে...

যাও, ওর সঙ্গে ভাব করো, ওকে ডাকনামে ডাকো!

স্বভাবী

কাল রাত্রে ঝড় হয়ে গেছে।

সকালের কুস্‌মি রোদ
ফিরে পেল তরুণ বয়েস।
দুঃখধান্দা ভুলে গিয়ে
ভেঙে ভেঙে পড়ছে রঙ্গরসে...

কে বলবে ঝুপড়িতে তার
ঝড় এসেছিল মধ্যরাতে!

ভ্রমণসঙ্গী

সূর্য তখন মধ্যগগনে, মাঠে একটুও ছায়া নেই
তুমি কিনা এলে আমার সঙ্গে বেড়াতে!
বেশ, তাই হোক, হাঁটব দু'জনে।—মরীচিকা, দ্যাখো, মরীচিকা
আকাশের বুকে আঁকা হয়ে আছে নৌকো
নৌকো চড়বে? আপত্তি নেই। দিগন্তে, দ্যাখো, ডুবজল
বাতাসে কাঁপছে আমাদের প্রতিবিম্ব।
প্রতিবিম্বরা আমাদের মতো আলাদা আলাদা হাঁটছে না
বরং কেমন ভাসতে ভাসতে মিশছে

কাঁপতে কাঁপতে জড়াচ্ছে ওরা পরস্পরকে ক্রমাগত
মনে হয় যেন ওদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা!
হতে পারে নাকি ওরকম! চলো দেখি তো এগিয়ে দু'জনেই
—থেমে গেলে কেন মাঝপথে? একি, যাবে না?

কেন এসেছিলে, কেন থেমে গেলে তুমি কি ভেবেছ আমি তার
কারণ জানতে চাইব? ভেবেছ, জানি না?
সূর্য তোমার মধ্যকপালে, মুখে একটুও ছায়া নেই
কী করে পারবে আমার চোখকে এড়াতে!

ময়দানে

জ্বলে ওঠবার আগে শেষবার নিভে আসে শহরের মুখ।
বিকেল মূর্ছা যায় ময়দানে শিরিষের পায়ে।
জনহীন আকাশের নীচে এক মাঠ,
ঐ মাঠে ভেসে থাকি চিৎ-সাঁতারের মতো সুখে।
জেগে ওঠবার আগে শেষবার শুষে নিই প্রিয় বিশ্রাম।
দূরে যানবাহনের বৃত্ত আবছা হয়ে থাকে।
এখনই লাফিয়ে উঠে বিজ্ঞাপনের উঁচু আলো
আকাশও জ্বালিয়ে দেবে। তার আগে এই শেষবার
বিকেল কোনওক্রমে শিরিষকে বলে গেল পুরনো কথাটি
—ভালোবাসি।

ভিড়ে মেশবার আগে এইসব খুঁটিনাটি ঘাস-মাটি-প্রেম
দেখে নিই একা... একা... একা...

অণু-স্বর

ঈশ্বর ॥

ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে চলে গেছে দশদিন হলো
বড় অগোছালো থাকি, কথা বলি সাজানো কঠিন
হু হু করে বেড়ে গেল বয়স, লাঠিও টলোমলো
ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে চলে গেছে মাত্র দশদিন।

মৃত্যু ॥

এস মৃত্যু, নেমে এস কী সবুজ ঘাসের গোপনে
এখানে আমার বাসা, তোমারও তো মাঠ ভালো লাগে?
কী অনন্ত মৃত্যু দুলছে এক ফোঁটা শিশিরে, পরাগে
ঘাসের আগায় মৃত্যু দু'দণ্ড ঝিঁঝির ডাক শোনে

কৃষি ॥

আমাকে কোদাল দাও, দেহময় এবড়োখেবড়ো পাপ
সমস্ত সমান করব, না পারি, বানিয়ে নেব ধাপ
হাওয়ায় বীজাণু ওড়ে, আমার পাপের মাটি ভিজে
অন্তত কোদাল দিও, কত আর পারব নিজে নিজে...

শাস্তি ॥

এমন কঠিন শাস্তি দিও না আমাকে, যাতে তুমি
নিজেই যন্ত্রণা পাও, মরে যেতে থাকো প্রতি পলে
দু'দিকে আকাশ ভাঙে, পদতলে সরে যায় ভূমি
আমার পাপে কি এত জোর, যাতে তোর স্বর্গ টলে!

দেনা ॥

কলমে যে শব্দ আসছে, তারা গত জীবনের চেনা
এ জন্মে তাদের আমি এতদিন বিস্মৃত ছিলাম
একটি করে শব্দ উঠে আসে, মনে পড়ে প্রিয়নাম
সহস্র জন্মের পর শোধ হয় একটি একটি দেনা...

ভাগ্য ॥

সে একজন জন্মেছিল দুর্বিনীত ভাগ্যরেখা নিয়ে
সে বলল: দক্ষিণে যাব। তার রেখা চলে গেল বামে
শখের চাবুক কিনে রেখেছিল দেওয়ালে টানিয়ে
চাবুকের রেখা বদলে তাকে বেঁধে ফেলেছে লাগামে

স্মৃতি ॥

যা কিছু হারিয়ে আসি অজস্র পথের বাঁকে বাঁকে
পথ তত দীর্ঘ হয়, কী দূর পিছনে পড়ে থাকে
সিল্যুয়েট মুহূর্তেরা, বিরহী থামের মতো একা
সুনিবিড় ডাকবাংলো ... মনে থাকবে দু'দিনের দেখা...

একা ॥

এতদিন শুয়ে আছি জলের তলায়, সবুজাভ
শ্যাওলা ও পতঙ্গের খসানো ডানায় মাথা রেখে
উপরে জলের ধারে স্নানে বুঝি এসেছে অনেকে?
...ঘাই দিয়ে ওঠে সাধ, ... আমি তোমাদের সঙ্গে যাব...

রাজকন্যা ॥

রতির এমন নীচে শুয়ে আছে বাসনা-পুতুল
সে তো ঘুমিয়েই থাকে যাবতীয় উথালে পাথালে
আহা, রাজকন্যা দ্যাখো বন্দি হয়ে রয়েছে পাতালে
তুমি শুধু রাজ্যপাট লুঠ করে শ্লাঘায় আকুল!

নদী ॥

বড় অসহায় লাগে যখন তোমার মুখ দেখি
এত জল, এত টান,—নিজেকে কি পারব সামলে নিতে!
তোমার কী মনে হয়? এমনি হলে তুমিও পারতে কি
জোয়ার না স্পর্শ করে, ... নদী যদি দাঁড়ায় নিভৃতে?

অরণ্য ॥

সারা শীতকাল ধরে অরণ্য বুনেছি দুই হাতে
হলুদ অরণ্যপথে মনোমতো তুলো ও পশম
এখনও ঝরেনি, তবে ঝরে যেতে পারে আজ রাতে
অরণ্যে হলুদ শীত, তোমার শরীরে নীল ওম্...

অন্তর্ঘাত ॥

প্রতিক্ষণে মনে হয় এ মুহূর্তে উড়ে যেতে পারি,
পাখির মতোন নয়। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে।
হাত পা কোথায় গেল... কোন দিকে মাথা, বুক, পেট?
সাবধানে একত্র করে হেঁটে যাচ্ছি নন্দন চত্বরে

আত্মগোপন ॥

বড় সুস্থ বোধ হচ্ছে এবারকার এই নির্বাসনে
পায়ের পাতার থেকে হাঁটু বেয়ে উঠছে লতাপাতা
আহা কী বাড়ন্ত বাহু! বাহুডোরে ডুবেছি ব্যসনে
বাহিরে যাব না আর। বাহিরে এখনও ফাঁদ পাতা...

স্পর্শতিল ॥

যে নেই, কেন যে তার স্পর্শ পড়ে থাকে!
এই ঘরে, এ শরীরে, মুহূর্তের বাঁকে
এত স্পর্শ আদৌ কি করেছ কখনও?

সে নেই। শুধুই তার নাম পড়ে আছে স্পর্শতিলে...

একক ॥

কোনওক্রমে যদি ভুলে যেতে পারি গুহাগাত্রে আঁকা
শিলালিপি, প্রতিধ্বনি, শান্ত খাঁজে চুঁয়ে পড়া জল
তা হলে তোমার সঙ্গে আমার এ থাকা বা না-থাকা
নিমেষে উত্তীর্ণ হব, সভ্যতা ও স্মৃতির ফসল
এক ছুটে পার হয়ে দাঁড়াব দিগন্তহীন মাঠে

তুমি নেই। ছিলে কিনা না জেনেও আয়ুষ্কাল কাটে...

সীমান্তশহর

মনখারাপ হলে কোনও সীমান্তশহরে চলে যাব।
চোখের সমুখ থেকে সরে সরে যাবে ধানক্ষেত;

এখানে কী একটা যেন শেষ হয়...কীসের যে শেষ
ঠাহর না করতে পেরে মনখারাপ আরও বেড়ে যাবে।

রাস্তায় টায়ার-চিহ্ন পুঁতে রেখে চলে যাবে ট্রাক।
কতদূরে যাবে আর? সীমান্ত পেরিয়ে যাবে বুঝি?
কয়েকটি শস্যের দানা এদিকেই ঝরে থাকছে বলে
শালিকের ঝাঁক নামছে যশোহর-রোডের ওপরে।

এখানে স্টেশনও আছে; ধোঁয়াওঠা ট্রেন এসে থামে।
একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, চা-সিগ্রেট খায়।
তার দৌড় এখানেই শেষ, কোনও উচ্চাশাও নেই।
রেলপথ পিছিয়ে যাচ্ছে মনখারাপ বাঁশি ফেলে রেখে...

বিদেশ

দাঁড়া, ছিঁড়ে যাবার আগেই
মুখস্থ করে নি' তোর ঠোঁট
ঠোঁটের ওপারে তৃণভূমি
সীমারেখা: ঈষৎ ভঙ্গুর
গভীরতা: বিপদ-জনক
উষ্ণতা: অসহনীয়, ভালো
বৃষ্টিপাত: অঢেল অঢেল
আর, এই ভরা চৈত্রদিনে
ঠোঁটের ঈশানকোণ থেকে
ঝড় আসে।

সীমান্তে পা ফেলে দাঁড়িয়েছি
আমাদের ঠোঁটের ভেতরে
গজিয়ে উঠেছে কাঁটাতার।
আজ যদি খুব ইচ্ছে করে

তোর ঠোঁটে যেতে, মনে হয়
অনেক বছর লেগে যাবে।
তবু বল, মনে করে বল,
ঠোঁট বিভাগের পর থেকে
কী এমন বদলে গিয়েছিল
চুমু ছাড়া...

সুজনেষু

আমাকে বলো ছেলে	কোথায় খুঁজে পেলে	তাকে
তোমার এলোমেলো	জীবনে কবে এল	প্রেম!
কেমন সেই মেয়ে	তোমার পথ চেয়ে	যার
প্রহর কেটে যায়	নত অপেক্ষায়	ভিজে?
আমাকে বলো ছেলে	কেমন সে বিকেলে	তার
চোখের তরণীতে	নোঙর তুলে নিতে	জল
তোমাকে ডেকেছিল,	জোয়ার এসেছিল	ঝেঁপে?
কেমন সে ভাসান	কেমন খরশান	স্রোত—
দেখেছ জলে নেমে,	জলের মতো প্রেমে	ভেসে?
এ জলে তরী বাওয়া	ভাসা ও ভেসে যাওয়া	ভালো
নৌকাডুবি ভালো	এবং খুবই ভালো	ডুবে
মরণ ছুঁয়ে দেখা,	যা তুমি একাএকা	নিজে
কখনও পারতে না,	অথচ এও কে না	জানে
মরণ স্বর্গীয়	মরণ বড় প্রিয়	সুখ...

একা

একা ১

কেউ কোত্থাও নেই। মনে হয় এই বেশ ভালো।
তুমি নেই, তাই যেন তোমার সকাশে এত কথা।
তোমাকে বলেছি আজ আকাশের রং ছিল লাল,
নিমগাছ থেকে পাতা ঘুরে ঘুরে পড়েছিল জলে,
বিকেলে ঝড়ের পর, বলো তো, সে কীরকম রাত!
লাফিয়ে উঠেছে চাঁদ, ডানপিটে চাঁদ, নিমডালে...

এত কথা কবে আমি শেষবার বলেছি তোমায়?
...তুমি নেই। আজও তবু একইসাথে চাঁদ দেখা চলে...

একা ২

শেষ দরজা বন্ধ হলো, আর
শব্দ করে উঠে বসল ফাঁকা।
এমন অঢেল দিন দু'হাতে কুড়োতে গিয়ে
হাঁপিয়ে গিয়েছি।
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি, আর
দিন শেষ হয় না দেখে উপুড় হয়েও দেখি,—একই।
শেষ দরজা বন্ধ হলে পর
এমন ঘরের মধ্যে আছি যার জানলাদরজা নেই।
ঘুলঘুলি দু'একটা আছে, তবে
উঁচুদিকে তাকাই না তো আর...
শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য রাখি নর্দমার ফুটো দিয়ে যদি,
যদি একটা প্রেম ঢুকে পড়ে...

একা ৩

এত একা থাকা ভালো নয়, উঁহু, ভীষণ খারাপ—
নিজেই নিজেকে বলি। আরও বলি, যথেষ্ট হয়েছে;

এবার যে ছেলেকে দেখব নীলরঙা টি শার্ট পরেছে
(নীল মানে হালকা নীল, কালো ঘেঁষা গাঢ় নীল নয়)
তাকেই ইশারা করব। অবশেষে সাপটে চুমু খাব।
নীল কী দুর্লভ রং! সারাদিনে একটাও দেখিনি।
রাত আটটা বাজতে চলল। দেখি মেট্রোস্টেশন চত্বরে
পেয়ে গেছি নীল, তার দীর্ঘ চুল, ইচ্ছাময় চোখ।
তাকে নিয়ে বাড়ি এসে কোনওক্রমে চাবি খুলে ঢুকে
মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছি।...নানাবিধ আলো অন্ধকার
ছিটকে উঠে ভেঙে ফেলছে ফটোস্ট্যান্ড, চিনে ফুলদানি...

আশ্চর্য! এমন ধাক্কা, যথাসাধ্য এমন ঝাঁকুনি,
তবুও কী একটা নাম, ফেলে আসা, ভেঙে যাওয়া মুখ
মন থেকে এখনও ঝরল না...

একা ৪

কী ভাগ্যিস একটি ছেলে এসেছিল বিকেলে এখানে
মিষ্টি মুখ, মিষ্টি হাসি, দু'একবার ছুঁয়ে দিচ্ছি হাত
ঈশ্বর! ঈশ্বর! তুমি বাঁচিয়ে দিলে আজকের মতো
নইলে আরও একটা সন্ধে কাটাতাম আত্মনিষ্পেষণে।

একা ৫

সারাদিন হ্যা হ্যা করে ফিরে এসে
টিভিকে আদর করি
বুকে পিঠে লেপ্টে যায় আহা,
উপগ্রহবাহিত করুণা।
চ্যানেল বদল করে নানারকমের চুমু দেখি।
দেখি, আর ঘুম পায়।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলি, আর আমাকে ডেকো না, মামণি
ও টিভি-মামণি, তুমি আরেকটু ঘুমোতে দাও,
আজ রান্নাবান্না নেই, খিদে নেই মোটে।

শুধু রাত বারোটার পরে
সোনা-যুবকের গল্প শুরু হলে ঠেলে তুলো আমাকে,
তখুনি।

একা ৬

আরও একবার তবে ফিরে যেতে চাইছি পিছনে,
যে কোনও পূর্বতন পুরুষের কাছে।
বলো, কারা কারা একা আছ,
একা আছে তোমাদের আর কোন্ কোন্ প্রেমিকারা—
দেখা হোক দেখা হোক দেখা হোক
সকলের সঙ্গে সবার।
আরও একবার তবে, হাত ছুঁয়ে এই শেষ বার
বলে যাও প্রত্যেকে একা আছ। বলো, ভালো নেই।

বলো, কেউ জানতে না, কক্ষনো ভাবতে পারোনি
সব সম্পর্কের শেষে এত অভিলাষ থাকে...

দুঃস্বপ্ন

ঘুরে ফিরে ফোনের কাছেই ফিরে আসি
হত্যাকারীর মতো। ফোনে কি রক্ত লেগে থাকে?

রক্ত না। কথা। আমি কথা মুছি ঘষে, রগড়িয়ে।
জল ঢালি। তাও ভয় করে।
অবশেষে মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখি টেলিফোনটাকে।

বিছানায় ফিরে আসি, শুয়ে পড়ি।
আর কোনও ভয় নেই। এবার ঘুমনো যেতে পারে।

তখনই কোথাও ফোন বাজে।
কোথা থেকে বাজে, ফোন! মাটির ভেতর থেকে নাকি!
দুঃস্বপ্নের মতো রিং হয়ে চলে ক্রমাগত।

কাঠ হয়ে শুয়ে থাকি।
আমার সকল অপরাধ আর অপরাধস্পৃহা
রাত বারোটার পর টেনে নেয় পুরনো জগতে।

মাটির ভেতর থেকে ফোন বাজে।
কানে হাত চাপা দিই, রিং হয় মাথার ভেতরে...

ঝাঁপ

স্বল্প...স্বল্প...বড় স্বল্পপরি...স্বল্পপরিসর চূড়া
দাঁড়াতে সমস্যা হচ্ছে, সামনে পিছে সুনিশ্চিত খাদ
নির্ঘাৎ পতন ডাকছে: এস। আর, আমি বলছি: না।
বৃদ্ধাঙুলে ভর দিয়ে দুলে যাচ্ছি হাওয়ায় হাওয়ায়

ত্রিলোক ম্যাজিক দেখছে হাঁটু মুড়ে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে।
ত্রিলোক পুরুষময়। বিচিত্র ও বিবিধ পুরুষ
সমস্বরে ডাক ছাড়ছে: এস। আর, আমি বলছি: ত্রাহি
শৃঙ্গদেশে অক্সিজেন এত কম, কাঁদতেও পারছি না।

এবম্বিধ পরিস্থিতি ঝাঁপ দেবার পক্ষে বেশ ভালো।
একে একে খুলে রাখছি অবসাদ, ভয়, ঈর্ষাভার,
নিম্নমুখে একটিবার খুঁজে দেখছি পরিচিত মুখ
অতঃপর যোগসূত্র ছিন্ন হচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়...

ধাক্কা

ধাক্কা খেতে খেতে চলি, পথপার্শ্বে আছড়ে পড়ে মন।
ঊর্ধ্বমুখে ছিটকে ওঠে, কিয়দংশ পাতালে প্রবেশ
ইতস্তত ভাসে কিছু, বাকি অংশ কোথা নিরুদ্দেশ,
গুপ্ত বিদ্যাবলে, আহা, ছিঁড়ে ফেলল মাধ্যাকর্ষণ।

সে মহাশূন্যের দেশে পদক্ষেপ সকলি নির্ভার।
মহা অন্ধকার, তবু পথ চলতে অসুবিধে নেই।
সীমাহীন দিকহীন তলহীন শেষহীন খেই—
কী বিস্ময়! তাকে আঁকড়ে আছি ছোট্ট মুঠিতে আমার!

মুঠি এক গর্ভাশয়, মধ্যে বাড়ে বিশ্বরূপ ভ্রূণ,
ব্রহ্মাণ্ড জন্মাতে চায়, নখাগ্রে গড়িয়ে নামে জ্যোতি,
যন্ত্রণাতে ছটফটাই, দীর্ঘ কল্পভর গর্ভবতী
মাটিজলে পুনর্বার জন্ম দিতে চেয়েছি আগুন...

পুনর্বার নেমে আসছি মহাবেগে, স্পর্শ করছি মাটি
বিস্ফোরণ শুরু করতে যেচে নেব মোক্ষম ধাক্কাটি।

নর্মদা মেধা পাটেকার

আমরা সবাই ভাতরুটি খাই,
শুয়ে বসে ঘুরে জীবন কাটাই,
প্রতিবাদ করে দিন কাটে কার?
মেধা পাটেকার, মেধা পাটেকার।

সেই মেয়েটির চোখে সর্বদা
স্বপ্ন: স্বাধীন প্রিয় নর্মদা।
তার দুই তীরে শত জনপদ।
তাদের সমুখে সমূহ বিপদ।

নদী যদি পড়ে বাঁধের কবলে,
দুই তীর মরে বানের ছোবলে।
ঘর বাড়ি ভাসে, ক্ষেত ডুবে যায়;
কত সহস্র প্রাণ অসহায়!

এসবের মূলে শুধু ঐ বাঁধ,
যার বিরুদ্ধে মেধার জেহাদ।
নদীর বুকেই কাঠের মঞ্চে
বসে বসে মেয়ে প্রহর গুনছে—

কবে তার দাবি মানে সরকার,—
বেঁচে থাকবার ন্যূন অধিকার।
সেটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ঠিক,
এই দেশটা তো গণতান্ত্রিক!

(এমন ভাবাই আমাদের কাজ,
যা ভেবেছি কাল, তাই ভাবি আজ।
আর কত দিন এমন ভাবব?)
নর্মদা নদী কতটা নাব্য—

সরকার সেই খবর জানত।
মেধাকে হটাতে কী চক্রান্ত!
খুলে দিল তারা বাঁধ তিনটিকে,
জল ছুটে এল মেধাদের দিকে।

দেখতে দেখতে বেড়ে যায় জল।
মঞ্চ ডুবছে, মেধা অবিচল।
অবিচল তার সহচরগণ,
দৃঢ়নিশ্চিত মৃত্যুবরণ।

মৃত্যু নয় এ, এর নাম জিৎ।
শাসককুলের ফেরে সম্বিৎ।
তারা ভেবেছিলঃ জল ছোঁবে যেই
মঞ্চ, অমনি মেধা পালাবেই।

মেধা পালায়নি, পালায়নি কেউ।
কোমরসমান জলে ওঠে ঢেউ।
মেধা নয়, ভয় পেল সরকার।
পুলিশ পাঠাল,— মেধা গ্রেপ্তার।

সরকার আজ শেষ মুহূর্তে
হার বাঁচাচ্ছে হারতে হারতে।
আসলে, ক্রমশ সে-ই কোণঠাসা,
কোনওকালে নেই জিতবার আশা।

নদীমাতৃক ভারতবর্ষে
মাটি প্রাণ পায় নদীর স্পর্শে
নদী, —প্রকৃতির খেয়ালি কন্যা,
কখনও স্নিগ্ধা, কখনও বন্যা।

তাকে বাঁধা যায় তার মন বুঝে।
তার চলনের ছন্দটি খুঁজে।
ভালোবাসাহীন কঠিন শাসনে
বাঁধলে কাউকে, সে কি কথা শোনে!

এই ভুলটিই এতদিন ধরে
করেছে সবাই। নদীকে সজোরে
বেঁধেছে। নদীও রাগে ফুঁসে উঠে
মারমুখি হয়ে বেরিয়েছে ছুটে,—

মাড়িয়ে গিয়েছে শহর ও গ্রাম।
মানুষ দিয়েছে স্পর্ধার দাম।
দুর্দশা তার ঘটেছে চরমই;
অবশেষে এল নদীর মরমী

সেই মেয়ে, মেধা। সেই মেয়ে যদি
বাঁচাতে না পারে নর্মদা নদী,
বাঁচবে না আরও অন্য নদীও।
এবং, সবাই জেনে রেখে দিও

নদী না বাঁচলে বাঁচে না মানুষ
সেই পরিণতি করি চাক্ষুষ
মনশ্চক্ষে,— বেশি দেরি নেই;
ধ্বংস অদূর ভবিষ্যতেই

সেই ধ্বংসের গূঢ় আয়োজন
ধ্বংস করতে চাও কোন্ জন?
সে এসে দাঁড়াও মেয়েটির কাছে,
এখনও, এখনও সে সময় আছে।

আজও বাকি আছে কল্যাণ-বোধ,
সেই গড়ে দেবে শেষ প্রতিরোধ।
আজও জোর আছে একথা লেখার
অভিনন্দন, মেধা পাটেকার!

এ যুদ্ধ নয় তোমার একার,
আমরা তোমার সঙ্গে রয়েছি,
প্রিয় 'নর্মদা মেধা পাটেকার'!

স্বপ্ন

আমাকে মার্জনা কোরো ওগো ভালো ছেলে, আমি
স্বপ্নে কাল দেখেছি তোমাকে।
দেখলাম দাঁড়িয়ে আছ এলোমেলো চাদর জড়িয়ে।
অথচ তোমার গায়ে জামা নেই। পরিপূর্ণ গ্রীবা।
বাঁ কাঁধে তখনও রাত্রি,
অনাবৃত ডান কাঁধ পৃথিবীতে সকাল করেছে।
এত আলো ঐ কাঁধে, গ্রীবাপার্শ্বে, ঝলসে যাচ্ছে চোখ,
তবু, ওগো ছেলে, আমি স্বপ্নে চোখ বুজিনি একবারও...

আমাকে মার্জনা কোরো হে পবিত্র ছেলে, আমি
স্বপ্নে কাল জেগেছি ভীষণ।
এমন জাগর, যেন ঘুম ভেঙে ছিটকে উঠছে লাভা,
ফেটে ফেটে উঠল চোখ আমার ঘুমন্ত সারা গায়ে।
আকাঙ্ক্ষা যত না তীব্র,
তারও চেয়ে সাঙ্ঘাতিক পূর্ণতায় উপচে উঠল রূপ।
তোমার চাদর খসল। কী সুঠাম দীর্ঘতম আলো
বিঁধে গেল, গিঁথে গেল আমার বিপুল অন্ধকারে...

আমাকে মার্জনা কোরো এ সমস্ত সত্যি নয় বলে।
তুমি স্বপ্নে এসেছিলে।
                    এর বেশি অন্যায় করনি।

অপয়া

ভালোবাসি,—এই শব্দ উচ্চারণে পাপ লেগে থাকে,
ওই কথা তোমাকে বলব না।

বরং তোমার চোখে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে
তুলে আনব গভীর অসুখ,
সেই তীব্র স্পর্শ লেগে চোখের পাথর ফেটে যাবে,
চোখের ভিতর থেকে ঝমঝমিয়ে বেজে উঠবে
                    জন্ম জন্ম ঘুমন্ত ঝর্নারা।
ঘুম ভেঙে উঠে তারা পাগল পাগল করবে—
                    : ওগো এস, স্নান নিয়ে যাও..

আমি যে কী করে ওই জলে নামব, এতদিন পর...
                    সর্ব অঙ্গে পাপ লেগে আছে।
তবুও আকাঙ্ক্ষা হয়ে টানে স্রোত। সহসা ঝাঁপাই।
এক জন্ম ডুব দিয়ে মাথা তুলে দেখি—হা ঈশ্বর!
দ্রবীভূত হয়ে গেছে এ শরীর তোমার শরীরে।

সে শরীর এত স্বচ্ছ, তলদেশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মন,
তবু ঠোঁট কামড়ে থাকছি,
কিছুতেই মুখ ফুটে তোমাকে ও-কথাটি বলছি না।

বিম্বসার

প্রতিবিম্ব দেখে বড় ভয় করে, ও কার চেহারা?
যে কোনও শরীরমাত্র, যা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে!
আজন্ম অভ্যাসবশে 'আমি' বলে বয়ে যাচ্ছি যাকে
সে কি শুধু এ আমি-র চারিপাশে নিছক পাহারা?

ঐ মুখে, হাতে পায়ে, সারাদেহে অনর্থক গ্লানি,
অথচ আমার মধ্যে গোপনে আনন্দ জ্বলে ওঠে
গোপনে বেদনা আসে, রহস্যকুসুম আধো ফোটে
মুহূর্তের জন্য যেন সরে যায় অন্তরালখানি

সেই মুহূর্তেরই খোঁজে ফিরে ফিরে জন্ম অপচয়
কত জন্ম কেটে যায় ক্লান্ত, জন্মপরিচয়হীন;
ধারালো আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে আছি যতদিন,—
প্রতিবিম্ব ধসে পড়ছে।
... আমি নয়, ... না না, আমি নয়..

অপরাজিত

প্রতিমুহূর্তে লড়াই চলেছে, দারুণ অসম যুদ্ধ।
যুদ্ধ চলছে ন্যায় অন্যায়, শুভ অশুভের মধ্যে।
এ কথা মানি না বিজয়লক্ষ্মী তেমন পরমারাধ্যা,
যে, তাঁকে মিথ্যে পুজোয় ভুলিয়ে রেখে দেব কারারুদ্ধ!

বরং, এখন ধরে নেওয়া যাক হেরে যাওয়াটাই লক্ষ্য,
হেরে যেতে যারা ভীত, তারা দেখি সরাসরি, বা পরোক্ষে
অপশক্তির ভৃত্য হয়েছে চেয়ে নিয়ে প্রাণভিক্ষা
কেননা, সহজ অবলম্বন আপাতজয়ীর পক্ষ।

ওদিকে নিছক দম্ভের নেশা, এদিকে ক'জন আর্ত,
ওরা জেতে ছলে বলে কৌশলে, আমরা শিখেছি হারতে,
হেরে যেতে যেতে ঘাড় সোজা রেখে বহন করেছি বার্তা—
হেরে যেতে যদি পিছু-পা হতাম, ওরা কিনে নিতে পারত।

জিৎ

ফিরে যেতে চাইছ তবু যেতে তো পারছ না
সসম্মানে ফিরতে চেয়েও এতটা লাঞ্ছনা
হবে, তুমি ভাবোনি তা। এখন বিজ্ঞাপনে
(যখন ভীষণ কাঁদছ, একা, এবং সঙ্গোপনে)
তোমার মুখের বিক্রিবাটা কেমনভাবে চলে
কেমন হীরে কী জহরৎ তোমার চোখের জলে
এস, এবার দ্যাখো, এবার জানো, এবার বোঝো
ফিরে যেতে চাইলে হবে? ফেরার মতো ওজর
আছে কি পিছনে? ছিল? কোথাও, কোনও বাসা?
ভালো না হয় না হোক, না হয় হলোই সর্বনাশা,
সে কি তোমায় ফেরাবে আর! তার দুয়ারে কাঁটা
আজকে থেকে অন্যদিকে অন্যচালে হাঁটার
অভ্যাসে কী মজা! দ্যাখো তোমার অট্টহাসি
শুনবে বলে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ঠাসাঠাসি—

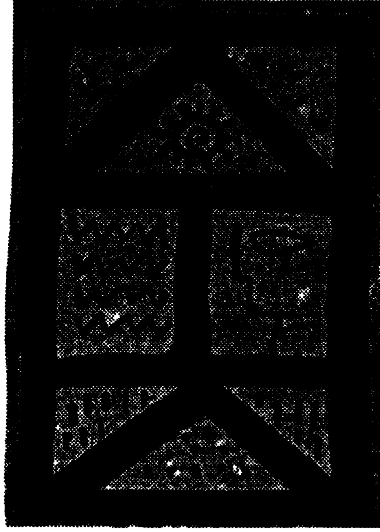
এবার তুমি ফিরতে পারো। তার আগে পারছ না
তখন তুমি জিততে পারো।
তার আগে,
হারছ না।

বলো অন্যভাবে, পুনর্বার

অন্ধকারকে অন্ধকার বোলো নাকো, রাত্রি নাম দাও
রাত্রি মানে কবিতার কাছেপিঠে ঘুরন্ত কলম
রাত্রি মানে যে সময়ে পৃথিবী পোশাক বদলে নেয়
তোমাদের চোখের আড়ালে।
তাকে যে লুকিয়ে দ্যাখে
তার কোনও পাপ নেই, যদি তাতে নবজন্ম হয়
তবে হোক!

আজন্ম ভুলকে পাপ না বলে,
কবিতা নাম দাও।

ছদ্মপুরাণ মন্দাক্রান্তা সেন



ছদ্মপুরাণ

সূচি

পতঙ্গ

কোজাগরী

আত্মাভিযান

পতঙ্গ

বড় বিষ ... বড় বিষণ্ণ এই সন্ধ্যা
মাঠে ময়দানে অহেতুক কিছু রোশনাই
শব ... শব ... মৃত শব্দের অনুসন্ধান
অন্ধ গলিতে মাথা খুঁড়ে মরে রাস্তাই

কোণ ... কোণ ... শুধু কোণ ... তুমি নেবে কোন্‌টি?
তুমি তো চেয়েছ ফাটাফাটি কিছু লিখতে
কিংবা ... কিংবা ... হয়েছ কিংবদন্তী ...

তৈরি করেছ মিথ ... মিথ ... মিথ ... মিথ্যে ...

পাপ

আমার প্রথম পাপ লিখতে আসা বারণ না শুনে
কে বারণ করেছিল? আরও পাপ তাকে ভুলে যাওয়া
তারপর তৃতীয় পাপে ভ্রষ্ট হই কপালের গুণে
এই পাপ ক-অক্ষর ; ক-অক্ষরে কবিখ্যাতি পাওয়া...

ক-অক্ষরে আরও শব্দ, —যথা, কষ্ট; যথা, করতালি
যত শব্দ তত পাপ পাপের পিঠেই ওঠে বেড়ে
নিজেকে গোপনে বলি: আহা রে, কী খেলাই দেখালি
অন্য মাঠে খেলবি চল এ পোড়া পাড়ার মাঠ ছেড়ে

অন্য মাঠে আরও মজা, চতুর্দিকে গাছ, গাছে পাখি
পাখিগুলো উড়ে উড়ে সারাক্ষণ হিংসেহিংসি খেলে
আমার পাপের গন্ধ পেয়ে—উফ্! সে কী ডাকাডাকি!
কেউ ছোঁ মেরেছে বুকে, কেউ দুটো চোখ ঠুকরে ফেলে

এ মৃত্যু আরেক পাপ, এই পাপে মরতে ভালো লাগে
একটি স্বীকারোক্তি শুধু লিখে রেখে যাচ্ছি তার আগে...

তাড়া

যাকে ফেলে চলে এলি, ভুলে গেলি, সে অতীত নয়,
তাকেই অতীত বলে ফুরিয়ে যে ফুরোয় না কিছুতে।
পালাতে পালাতে দেখবি অন্ধকারে বুড়ি ছুঁতে ছুঁতে
তোকেই হারিয়ে দিচ্ছে তোরই সেই হারানো সময়।

ধরো, সে রজনী ছিল। আর ধরো, আপাতত রোদ।
তুই ভাবলি মুঠো মুঠো আলো ছুঁড়ে বিদ্ধ করবি তাকে।
করলি, করে ছুট দিলি সম্মুখের সমকোণী বাঁকে—
বাঁকের আড়ালে পথ। ছিল। আজ পথ অবরোধ।

ভেবেছিলি, এই শেষ?

ভেবেছিলি, এই প্রতিশোধ!

শারীরবৃত্তীয়

শিরার মধ্যে জমে ওঠে স্থির বিদ্যুৎ
ধনুকের মতো বেঁকে গেছে মেরুদণ্ড
স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছিলা বেঁধে দিল মৃত্যু
এখানে ওখানে খণ্ডিত হলো বন্ধন।

বন্ধনগুলি সর্পই, নয় রজ্জু
লাফাচ্ছে তার ছিন্নভিন্ন অংশ
মেরুদণ্ড তো গাণ্ডীব, তুই অর্জুন—
শোধ করেছিস আজন্ম যত দংশন?

অথচ শিরায় ফেনিয়ে উঠছে কালবিষ
ফেটে ফেটে গেল কশেরু কঠিন সহনে
আর কতদিন এই জিজীবিষা জ্বালবি?
শিরার মধ্যে বিদ্যুৎ আছে, দাহ নেই।

দাহ নিভে গেছে বন্ধন খসে পড়তেই
মধ্যরাত্রে ফিরে এল সম্বিৎ তোর—
মেরুদণ্ডকে বাঁকিয়ে ধনুক গড়তে
দেখলি কখন গড়ে ফেলেছিস বৃত্ত...

ভাসান

মেঝেতে, পুরনো ঘরে, পড়ে ছিল অগোছালো শাড়ি
যুবতীটি এমন আনাড়ি

সেটুকুও ফেলে রেখে মাঝরাত্রে পেরলো চৌকাঠ
সেখানে, ঘরের বাইরে, পড়ে ছিল অনিশ্চিত মাঠ...

যুবতীটি ভেবেছিল রোজ রাত্রে বিকোবার চেয়ে
একদিন অন্ধকার বেয়ে
চলে যাবে এই অন্ধকূপ থেকে দূরবর্তী ঘাটে
এ তার প্রথম ঘাট, নারীজন্ম ভেসে ভেসে কাটে...

সে ভারি নির্বোধ মেয়ে। অন্ধকার তার নৌকো নয়
নদীতেও বাঁকে বাঁকে ভয়
সাত ঘাটে ভাসতে গেলে সাঁতারও তো জানাটা জরুরি
অথচ যুবতী আজও ভাসতেই শেখেনি পুরোপুরি

যা হবার তাই হলো, মেয়ে যেই ডিঙি দিল খুলে
কোথা থেকে তখনই সমূলে
বেআব্রু শরীরে তার গিঁথে গেল আদিম পৃথিবী
অন্ধকার একা নয়, দলবদ্ধ তারা মৃতজীবী

গণধর্ষণের পর খোলা মাঠে পড়ে রইল লাশ
কণ্ঠে ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁস
দু'তিনদিন পরে কারা লাশ পুঁতে গেল তাড়াতাড়ি

সে ঘরে নতুন মেয়ে, অঙ্গে সেই ছেড়ে যাওয়া শাড়ি...

লজ্জাবস্ত্র

রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর খসে পড়ছে আমার পোশাক
নগ্ন হয়ে যাচ্ছি, মাগো, কুঁজো হয়ে বসে পড়ছি শেষে
দু'হাতে জড়িয়ে নিচ্ছি দুই হাঁটু, ঢেকে নিচ্ছি মুখ বুক পেট
অরক্ষিত পিঠে এসে তীর বিঁধছে গোছাগোছা
মাগো দৃষ্টি গিঁথে যাচ্ছে যকৃতেও, ...হৃৎপিণ্ডে...ফুসফুসে...

এ সবই দুঃস্বপ্ন হয়তো, দুঃস্বপ্ন ছড়ানো পথে পথে
প্রাণপণে পালাতে চেয়ে অলিতে গলিতে ছুটছি
সর্বত্রই কী ভিড় কী ভিড়
গলিও কী কৌতূহলী, চেপে ধরছে দু'দিকে দেওয়াল
দম বন্ধ হয়ে আসছে, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে হাসি
মাগো, রক্তে ভেসে যাচ্ছি...মুছব কীসে...আমার শরীরে
একটুকরো কাপড়ও নেই, মরে যাচ্ছি কঠিন লজ্জায়

শেষ অবধি কীভাবে যে ঘরে ফিরতে পেরেছি কী জানি—
ওদিকে তখন ওরা আমার উলঙ্গ শব
ঢেকে দিচ্ছে ... হ্যাঁ মা,
পতাকায়...

দেশ

আমরা যারা দেশ বলতে এক-একখানা মানচিত্র বুঝি
খাতার ওপরে নীচে এঁকে রাখি উত্তর দক্ষিণ
অশ্বারোহী ছেয়ে ফেলে ইতিহাসে লেখা গলি-ঘুঁজি
বাঁদিকের কোণ ঘেঁষে নেমে আসে লুণ্ঠনের দিন

আমরা যারা নদী বলতে বুঝি কিছু রেখার ভঙ্গিমা
পাহাড়ের মাপ জানি, জানি তার অতীতকাহিনী
আঁকাবাঁকা উপকূলে এঁকে দিই সমুদ্রের সীমা
এতটা শতাব্দী জুড়ে আমরা কোনও আকাশ আঁকিনি!

আমরা, যারা দেশ বলতে জেনেছি শুধুই একটা নাম
পরস্পরকে ভাষা দিয়ে কিছুতেই পারিনি বোঝাতে
কেন কেউ চেয়েছিল পাঁচজনের জন্য পাঁচটি গ্রাম
কেন এক রাজপুত্র গৃহত্যাগ করেছিল রাতে

আমরা, যারা দেশ বলতে মনে রাখি জাতীয় পতাকা
রাষ্ট্রীয় মুদ্রার নাম ভুল করে বলে ফেলি: টাকা।

ডাঙা থেকে লিখছি

একজন কবি দোতলায় থাকে, একজন কবি ভাসছে
আমার স্বজন বানভাসি হলে তাতে কী যাচ্ছে আসছে!

বন্ধুর ঘর ডুবল কখন আমি তো রাখিনি খোঁজ তার
বন্যা ওদের নিয়তি, এবং কবিতা আমার রোজগার

নিখুঁত ছন্দে কবিতা লিখব এ ছাড়া আমার কোন্ দায়?
কোনওমতে এটা নামিয়ে ফেললে পাঠিয়ে দেব সানন্দায়

বনগাঁয় কারা খাদ্য পায়নি, এমনকী জলবিন্দু
তাদের কষ্টে পাত্তা দিই না বলে কোন্ শালা নিন্দুক!

ঐদিকে কারা ভাঙা মন্দিরে তুলে আনে ভাঙা সংসার
(মাত্রাবৃত্তে বাক্যটি লিখে আমার কী যে অহঙ্কার!)

বানভাসি নিয়ে পদ্য লিখছি, এই অপরূপ স্পর্ধায়
আজানু ডুবেছি শুকনো ডাঙায়, চোখের উপরে পর্দা—

ওপাশে স্বজন, তুমি ও তোমার বহমান উদ্বাস্তু
ক্ষ্যাপা তুফানের শিঙে বেঁধে দিলে নৌবহরের মাস্তুল...

জেনারেশন নেক্সট

জীবন একটি তরল রঙিন মোচ্ছব
খবর এখানে একটু দেরিতে পৌঁছয়
প্রতিদিন যারা কাতারে কাতারে মরছে
ভাগ্যিস তারা তোমার আমার কেউ নয়!

ওদের কপালে গোলা গুলি বোমা বন্দুক
মরতে হবে যে, ওরা আগে থেকে জানত

আমরা এখনও অনেক বাঁচব বন্ধু
আমরা তুখোড়, ফুর্তিবাজ ও জ্যান্ত

মোড়ে মোড়ে কত কবন্ধ লাশ ছটকায়
কাচ তুলে দাও স্পিড তুলে দাও নব্বই
দেখব আজকে আমাদের কারা আটকায়
পালাতে পালাতে কোথাও একটা উঠবই

পিছনে একটা আস্ত শহর ভাঙছে
আমরা তখন হাইওয়ে ধরে বাইরে
রক্তে বাজছে স্টিরিওফোনিক ভাঙড়া
আকাশে বাতাসে বোমারু হানার সাইরেন..

ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ডে

স্কুলমাঠে ড্রাম বাজছে। নীল শাদা শৌখিন প্যারেড।

—পতাকাটা দর্জি দিয়ে করা? নাকি কেনা, রেডিমেড?

—বড়দি ফ্ল্যাগ কিনতে বলল, এদিকে জানে না কত দাম,
সস্তায় কিনেছি গুরু, বার খেয়ে হইনি ক্ষুদিরাম।

—গেরুয়াটা ক্যাটক্যাট করছে। চক্রটায় স্পোক বড্ড বেশি—

—এমন করছিস, যেন ফ্রাসট্রেটেড স্টুপিড স্বদেশি!

—হয়েস্টিঙে ফুল পড়বে, কী কিনব রে? গাঁদা না দোপাটি?

আমাদের স্কুলে, হুঁ হুঁ, ফিফ্‌টিফ্থের প্ল্যান ফাটাফাটি।
ফুল দিয়ে লিখে দেবো মাঠে—হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ডে
ড্রামে ভালো বিট দেবো, পার্টি জমবে প্যারেডে প্যারেডে।

গর্ভপাত

যে মেয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেরই যোনিতে দু'পা রেখে
যে মেয়েটি মেরুদণ্ড দু'হাতে বাঁকিয়ে ধরেছিল
সে আজ পেরেছে তার দেহ থেকে ছিটকে দিতে ধাতু
সোনার পীড়িত গর্ভ শোভা পাচ্ছে দোকানে দোকানে

আজ তার মুক্তিদিন, আজ তার শোণিত-উৎসব
প্রজাপতি হয়ে গেছে ঠোঁটদুটি, অভ্রমাখা ডানা,
উড়ে গিয়ে বসছে দুই অন্ধ চোখে, সুগন্ধি ঘিলুতে,
আঙুলে আঙুলে তার ছটফটিয়ে উঠছে দশটি নদী...

জঙ্ঘা ও কনুই বলছে পরস্পরেঃ সে কই! সে কই!
সে মেয়ে ঘুমিয়ে গেছে নিজের বুকেই মাথা রেখে

ঋতু

জানি না এ রন্ধ্রপথে কে যে মুক্তি পাবে, রক্ত ছাড়া
তা সে যেই হোক না কেন, এত কেন কাড়া ও নাকাড়া
বেজে উঠছে এ হৃৎপিণ্ডে, অপটু ও অপ্রস্তুত গৃহে
নিজেকে সকৌতূহলে প্রশ্ন করিঃ কাণ্ডখানা কী হে!

আমারই ভেতর থেকে বলে ওঠে আত্মানাম পাখি
কাজের সময় বাপু তোর যত মিথ্যে ডাকাডাকি
এখনও জানো না নাকি, নেকু, তোর বিরহী আসবে যে!
রক্ত ঢেলে ধুতে হবে শরীরের ঘর দোর মেঝে

সঙ্গে সঙ্গে ডাক ছেড়ে বেজে ওঠে নির্বোধ সানাই
সে শব্দ ছাপিয়ে আমি প্রাণপণে আপত্তি জানাই
বলিঃ না গো, আমি তাকে কিছুতেই আনব না এখানে
আমি তার যোগ্য নই, সে আমার অন্তরাত্মা জানে—

অন্তরাত্মা মুচকি হাসে, দেহে পড়ে গেছে অন্য সাড়া
সে জানে এ রন্ধ্রপথে সে-ই মুক্তি পাবে, আমি ছাড়া..

ছদ্মপুরাণ

পুজা

নুন আনতে পান্তা শেষ, রান্নাতে ফোড়ন দেবো সাধ
কান্নাতে লবণ আছে, জলও আছে, খুকি তুই রাঁধ
ছত্রিশ ব্যঞ্জন, তাতে ছত্রিশরকম দুঃখবিষ
টক স্বপ্ন, মিষ্টি হিংসে, কম যেন না হয় দেখিস!
পিঁড়ি পাতা পুবমুখে, পাতের দক্ষিণে লেবু নুন
উত্তরে রাখিস হাওয়া, পশ্চিমেও ঘুমন্ত উনুন
এইভাবে মন্ত্র পড়ে বেঁধে দিস চতুর্দিগ্বিদিক
সংক্রান্তি বসেছে শিরে, আজ সেই পুজোর তারিখ
সেও যেন পালাতে না পারে এই নৈবেদ্য ছেড়ে
দেবতার পাতে, খুকি, নিজেকেই দিস আজ বেড়ে।

প্রেম

মনে আছে, তুই ছবি কেটে কেটে জুড়তি?
বানিয়েছিলি কী উদ্ভট দেবীমূর্তি—
মাথা থেকে দুটো হাত উঠে গেছে দু'পাশে
স্তনে দুটো চোখ, অসহ্য অপরূপা সে
চোখের কোটরে লকলকে দুই জিহ্বায়
কাম ও করুণা খেলা করে যেন দুই ভাই
দুই ভাই? উঁহু, দুই বোন তারা, দেবী তো
প্রকৃতিস্বরূপা, লাস্যচিহ্নে শোভিত
নাভিতে নাভিতে ক্ষীণ কটিখানি জর্জর
পায়ের পাতায় ওষ্ঠ বসালি, তারপর

যেই তুই তার কপালে লাগালি শ্রীযোনি—
তৃতীয় নয়নে আলো জ্বলে ওঠে তখনি
আলো? না আগুন? পুড়ে হলি তুই ভস্ম

দেবী কেড়ে খায় ভক্তের সর্বস্ব!

প্রকৃতি

খেলা ঘুরে যাচ্ছে, সূর্য খেলতে খেলতে উঠেছে পশ্চিমে।
বিপ্রতীপ বায়ুভরে নদী চলল উলটো মুখে ধেয়ে।
জগৎসংসার তীরে এ হেন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে
অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। চোখ ঠেলে উঠছে মাথার পেছনে।

সেই উলটো চোখে যা যা পড়ছে সব ডাহা সত্যি কিনা
ছুঁয়ে দেখব বলে যেই আরেকবার বাড়িয়েছি হাত
জল লেগে হাত পুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক ভয়ে
ছিটকে সরে যেতে গিয়ে দেখি পৌঁছে গেছি আরও কাছে...

আসলে, কখন যেন, উলটে গেছে পায়ের পাতাও!
দৈব কৌতুকে, মাগো, আমি এক অবলা পিশাচী।

মেহফিল

যেভাবে অভ্যস্ত হাতে বন্ধ করলে পুরনো দরোজা
লঘু ও গর্বিত পায়ে হেঁটে গেলে পরবর্তী প্রেমে
কে বলবে তোমার পিঠে অত বড় ভারী একটা বোঝা—
ছেঁড়া ডানা, ... হাড়..., আরও যা যা থাকে যে কোনও হারেমে
সে সমস্ত বইছ কেন, জাঁহাপনা, ভ্রাম্যমাণ যুবা
তুমি কি উন্মাদ? নাকি অবিশ্বাসী? অথবা শৌখিন?
সংগ্রহ করেছ যত পছন্দমাফিক মেহেবুবা
তাদের শরীরগুলো এতদিনে রক্তমাংসহীন—

গুনে গেঁথে রাখছ তবু, তুলে রাখছ উচ্চকিত কাঁধে
পর্যটনপ্রিয় তুমি, তলায় পৃথিবী আছে থেমে
তোমারই সম্মানে আজ আসর বসেছে খোলা চাঁদে
অন্ধকার পিঠ তার ভরে যাচ্ছে হারেমে হারেমে...

চুক্তিপত্র

এ ছাড়া আর যা কিছু, যা কিছু তোমার মনোমতো
এই বুক, এই পেট, মাঝখানে লম্বালম্বি ক্ষত
ক্ষতের ভেতরে কীট খুঁড়েছে জটিলতর বাঁক
পুঁজরক্ত সব নিও, জ্বালাযন্ত্রণাটুকু থাক

এ ছাড়া আরও তো আছে, মধ্যরাতে খুলে রাখা নাভি
স্তনবৃন্ত ... যোনিকেশ ... বাহুমূলে পুঁতে রাখা দাবি
দাঁতে জিভে রক্তময় সিলমোহর ফুটে ওঠা ত্বক
হিসেব মিলিয়ে দেখো, লিখে দিচ্ছি প্রতিটি স্তবক

দেখে নাও কোনওখানে আছে কিনা কোনও ভুলচুক
চাইলে সাক্ষী ডাকতে পারো, নগ্ন হব, ওরাও দেখুক
তোমার আকাঙ্ক্ষা থেকে লুকোব না ক্ষুদ্রতম তিলও
যা চেয়েছ সব পাবে, কিন্তু আরও যা যা কিছু ছিল

সেটুকু আমারই থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে আমি
আগলে রাখছি প্রাণপণে।
বাকিটুকু তোমার প্রণামী

অসৈরণ

যা থাকে কপালে বলে লিখে যাচ্ছি যা আসে কলমে
কে আমাকে মন্দ বলে, কে যে কাকে বলে ভালো মেয়ে—
এসব হিসেবে নিত্য মেঘে মেঘে কেটে যাচ্ছে মায়া
আপাতত সাধ এই: জনগণ বলুক বেহায়া।

হয়েছি বেহায়া, হায়, এতদিনে নেচেছে কলম
লজ্জা ঘেন্না ভয় ছেড়ে জড়িয়েছি ইচ্ছে ইচ্ছে ওম
সে ইচ্ছে আমারই, কিন্তু আজও তাকে পুরোটা চিনিনি
ভেতরে ভেতরে সদ্য গড়ে উঠছে গূঢ় বিকিকিনি

হাটেমাঠে ঘোরাঘুরি, যত্রতত্র হরেক পশরা
একদিকে চাঁদ, সূর্য। অন্য দিকে নিশাদল, সোরা
হঠাৎ কী ইচ্ছে হলো, মুহূর্তের উলটোপালটা ঝোঁকে
দক্ষিণে বকুলগন্ধ মিশে গেল বামের গন্ধকে

অসৈরণ কাণ্ড দেখে ফণিমনসা ঠেলে উঠছে লোমে
যা আসে কপালে ভেবে লিখে যাচ্ছি যা থাকে কলমে

পঞ্চম আড়াল

কাছাকাছি কেউ নেই যাকে নিয়ে এই একজীবন
দিনে দিন কেটে যেত, রাত আসত নিয়মমাফিক
স্বপনে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ভোর, সূর্য, সন্দীপন
(স্বপ্ন কি জ্বালানি নাকি?) হ্যাঁ গো, আমি স্বপ্ন-স্বাভাবিক।

এমন স্বভাবে যার চতুর্থে ঠেকেছে তিন কাল
কে তাকে ঠেকায় বলো, সে তো এক অনন্য ফেরারি
মাত্রা তুচ্ছ করে সেও খুঁজে পেল পঞ্চম আড়াল
আড়ালে যে বাঁশিভর্তি নিশিডাক, হ্যাঁ গো, আমি তারই!

ঘুমন্তে ভ্রমণ চাপে, রাতবিরেতে উড়ে আসে ডানা
এই সেই সুবিখ্যাত ছায়াপথ, অনন্ত, মসৃণ—
চতুর্দিকে এত সূর্য! বাঁশবনে মূর্খ ডোম কানা
পথ হারিয়েছে শেষে, স্বপ্নাহত, একা, অন্তরীণ...

হ্যাঁ গো, সত্যি, শেষমেশ এইই যার স্বেচ্ছা পরিণতি
লোকে তাকে ভালোবেসে মুচকি হেসে বলেছেঃ অসতী।

ত্রিপাপদর্শন

নির্বাণ

আজ বিকেলেও আমি প্রিয় হতে চেয়েছি সবার
এ যে কী কঠিন রোগ, এ যে কী কঠিনতর পাপ
সে কথাটা বুঝতে বুঝতে বরাবর রাত হয়ে যায়
অসুস্থ নিয়নবাতি ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে
আর্তনাদ করে ওঠে, খিস্তি করতে করতে বমি করে
নীলাভ আলোর পাঁক, তার মধ্যে নিমজ্জিত কাঁটা
ঘড়ি বললঃ তুলে দে না শালা, ঘন্টা বাজাব কী করে?
আমি তাকে আছড়ে মারি নেশাগ্রস্ত দেয়ালে। দেয়াল
চোখ মারে, হাসে, বলেঃ এস বন্ধু...
অসুখ সেরেছে?

নির্বচন

যে লেখাটি লিখবে বলে বসে আছ গতজন্ম থেকে
যে লেখা না লিখতে পেরে আত্মহত্যা করেছিলে তুমি
তবু মুক্তি পাওনি, শেষে পঞ্চভূতে অতৃপ্ত নিজেকে
আবার কুড়িয়ে তুললে, খুঁজে নিলে পুনর্জন্মভূমি
সে লেখাটি ইহজন্মে চিত্তাকাশে লাট খাওয়া ঘুড়ি
মূর্খ জাতিস্মর তুমি, প্রাণপণে গোটাচ্ছ লাটাই
ঊর্ধ্বমুখে ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খাচ্ছ, দিচ্ছ হামাগুড়ি

আকাশে অজস্র প্যাঁচ, এর মধ্যে ওই ঘুড়িটাই
সমস্ত উপেক্ষা করে লাট খাচ্ছে একান্ত সহজে
তুমিও পুরনো পাপী, কামড়ে আছ অলৌকিক সুতো
অবশেষে ঘুড়িটিও ছলাকলা করতে করতে বোঝে
তোমার জেদের কাছে ইহজন্মে সেই পরাভূত

সুতো ছিঁড়ে নেমে আসে পাশের বাড়ির উঁচু বুকে
এ জন্মে যা লিখবে, সব প্রতিবেশী বন্ধু নেবে টুকে

নির্বিকল্প

আমাকে ফিরিও বন্ধু, যদি ফেরাবার মতো হয়
আমার বেঠিক জামা, উলটোপালটা লাগানো বোতাম
আমাকে ফিরিও যদি গোড়ালিতে কাদা লেগে থাকে
নিতান্ত কঠিন লাগে অভাগীর গালভরা নাম
আমাকে ফিরিও তবে, আড়ালে না, প্রকাশ্য সভায়
মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে পাঠ কোরো ছেঁড়া হাতচিঠি
সকলে কবিতা ভাববে, মুহুর্মুহু হাততালিও হবে
চাই কি, পড়তেও পারে একটা দুটো সুচিন্তিত সিটি

দেখতে পাবে ভাঙা প্রেম কাব্য হলে কী যে জনপ্রিয়!
দুয়ারে উপচাবে ভিড়,
খিড়কিপথে আমাকে ফিরিও

শিকল

মাঝে মাঝে দিনগুলি বেজে ওঠে অসার্থক উপমার মতো
পাশপাশি বসে থাকি বিসদৃশ, বিষম জ্বালায়
রোগা বেড়ালের মতো দিনগুলি দিনরাত পায়ে পায়ে ঘোরে
মাথার ভেতর একটা গুপ্ত করিডোর থেকে
ঝনঝন করে কোনও অদৃশ্য শিকল বেজে ওঠে...

যখনই এমন লাগে, বাথরুমে লুকিয়ে পড়তে হয়
আসলে তো একমাত্র জলই জানে জলের উপমা
নগ্নতাকে নগ্নতারই চোখে দেখি দেয়াল আয়নায়
এসবে ক্রমশ একটু সুস্থ লাগে। দু'একদিন পর
পা টেনে টেনে হাঁটা বন্দিদের গোড়ালিক্ষততে
পুনরায় জল লেগে জলের মতোই জ্বালা করে...

যুদ্ধজয়

যত ছোট যুদ্ধজয়, তত বড় হার
এ কথা জেনেও তবু জিততে ইচ্ছে করে
খুঁটিনাটি অজুহাতে, এমনকী তোমার
মিথ্যে অহঙ্কার দেখে গুপ্ত ঈর্ষাভরে
শান দিই নখেদাঁতে, উস্‌কে দিই রাগ
সে রাগ পুড়িয়ে যায় আমারই হৃদয়
হৃদয়ে ক্রমশ জমে ওঠে দগ্ধ দাগ
যত বিশ্রী ক্ষত, তত ছোট যুদ্ধজয়

এ সমস্ত জমে ওঠা ক্ষতের ভেতরে
গোপনে, —না, পুঁজ নয়, অশ্রু ওঠে ভরে
একদিন কীভাবে যেন ফেটে যায় ক্ষত
জানি না এ কতখানি বাস্তবসম্মত
শুধু জানি, তখনই তো কান্না আসে ঝেঁপে
অনর্থক এত যুদ্ধজয়ের আক্ষেপে...

পতঙ্গ

আমাকে ততটা বেশি খারাপ ভাববেন না, শঙ্খবাবু
আমি নিজে থেকে আসিনি সভাতে।
একেই নিজেকে এত ছোট মনে হয়, ক্লান্ত লাগে
তারওপর আপনি এসে দাঁড়ালেন কেন, অন্ধকারে?

জোরালো আলোর নীচে মূর্খ পতঙ্গের মতো
পুড়ছি, পুড়ে মরে যাচ্ছি দেখে
আপনার কি কান্না পায়? অস্ফুটে বলেন, ফিরে যাও?

আমি এত মূঢ়মতি, নিজেকে যে পারি না কাঁদাতে,
সেজেগুজে পুড়তে আসি।
তবু চামড়া পোড়ে। স্নায়ু। শিরা।
জ্বালাযন্ত্রণাও পোড়ে, পুড়তে পুড়তে পুড়তে অবশেষে
কিছু কি পড়েও থাকে!
শঙ্খবাবু, আপনিই বলুন
তখনও কি কবি হয়ে উঠতে পারে পতঙ্গের নাভি?

কোজাগরী

মাথার ভেতর যত কাঁকন বেজেছে কাল রাতে
আমি তার সুরগুলো খুলে খুলে দেখেছি স্বপনে
সুরেলা রুপোর মতো গয়না, অল্পবয়সিনী চাঁদ...
গুজরিপঞ্চমে তার কোমল গান্ধার গেছে লেগে

আমি সেই জ্যোৎস্না, জাদু, রক্ষা করি মাথার ভেতর

শিয়রে গুঞ্জার মালা গ্রন্থি খুলে ঝরালে আকাশ
ভোররাত্তিরের স্বপ্ন, তখনও তোমার কারুকাজে
অল্প ... ভিজে ... মাটি লেগে আছে।

বুননশিল্প

আমি ঠিক জানি না।
সম্ভবত এ সমস্ত কথা,
এ ঠিক কোনও কাজের কথা নয়...

সারাদিনভর শুধু বুনতে ইচ্ছে করে
একটাই পুরনো কার্পেট, ঘন ও বাদামি।
লালফুল, নীলফুল, প্রান্তরের শস্যেরা আমার...
ওই উপর থেকে খুলে খুলে পড়বে
হলদে সুতোর লাছি,
গরম, ভারী, আরামদায়ক
আর হয়তো তখনই
কোথা থেকে উড়ে আসবে হৃষ্টপুষ্ট সাহসী ফড়িং

কোত্থেকে আসবে, আমি ঠিক জানি না।

জানতে চাইবও না, মনে রেখো, সে বছরও,
যে বছর খরা ও মড়কে
সরাসরি আলোর দিকেই উড়ে যাবে
আমাদের ম্যাজিক কার্পেট...

কোজাগরী

এক

খুব দূরে কোথাও একটা জ্যোছনা উঠেছে,
যেন অনেককালের পুরনো একটা চাঁদ,
এই বারান্দাটায় বসলে
টের পাই তার ভিজে ভিজে, কাঁপা কাঁপা আঙুল
ঠাণ্ডা শাদা রেলিংগুলো ঘন হয়ে কোল ঘেঁষে আসে,

ওদের মধ্যে সবচাইতে শান্তটিকে
আরও কাছে টেনে নিয়ে বলি
—আয়, তোদের রূপকথা শোনাই...

দুই

পাশের বাড়ির সঙ্গে দূরত্ব
এই বড়জোর আড়াইলক্ষ মাইল...
একেকদিন রাতবিরেতে বিছানায় উঠে বসে দেখি
সারা ঘরে আবছা নীল আলো,
তোমার ঘুমন্ত মুখে বেয়ে যাচ্ছে সুড়সুড়ি পিঁপড়ের মতো
বিন্দু বিন্দু মায়া...
পাশের বাড়ির ঐ মাথাখারাপ মেয়েটা
এখনও কি ঘুমোয়নি, ভাবতে ভাবতে
ঘুম থেকে তুলে তোমাকে আবারও ভীষণ
ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে

তিন

সত্যি বলছি এই ক'দিন আগেও আমি
সত্যি সত্যি যৌনতা কাকে বলে জানতাম না।
আমি জানতাম, দিদা মরে গিয়ে
মায়ের পেটে এসেছিল আমি হয়ে, আর
পৃথিবীর সব ভাই-বোনে বিয়ে হয়, তারা
চিরকাল একসঙ্গে থাকে...

এখন ভালোবাসবার পর তুমি ঘুমিয়ে গেলে
তোমাকে কোলে নিয়ে জ্যোছনাতে দাঁড়াই, বারান্দায়।
চাঁদ মুখ টিপে হাসে।

...আয় আয়, চাঁদমামা,
টি দিয়ে যা?

ডিলিরিয়াম

জ্বর এল নূপুর বাজিয়ে

ও কেমন ভঙ্গিমাটি? আঁচলে ঢেকেছ দীপাধার?
দাঁড়িয়ে থেকো না দোরে, কাছে এস,
তোমাকে তো ডেকেছি আমিই।
বাতিটি কি এম্‌নি? নাকি মায়াবাতি?
যা হোক, তা রাখো ওইখানে।
রেখে এসে বোসো এই শিয়রে আঁধার করে,
কপালের মধ্যে রাখো মৃদু মৃদু রুপোর নূপুর...

জ্বর শান্ত মাতৃমূর্তি
কথা শোনে,
সারারাত মায়ায় জড়ায়...

নিসর্গ

এই দুপুর, তার এই পশ্চিমদিকে একটু হেলে দাঁড়ানো দেখেই
বুঝতে পারি, কেউ আসছে।
দুপুরের নিসর্গে কী যে একটা খুব দূর বিষণ্ণতা আছে,
একটা রঙের মধ্যে অনেকগুলো রং দেখা যায়।
পাঁচিলের ধারে ধারে রাংচিতার ঝোপগুলোকে দেখায় খয়েরি,
তার থেকে বেগুনি বাষ্প ওঠে, তিরতির করে কাঁপে।
অনেকদিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া
মায়ের অন্ধ রাঙাকাকার কথা মনে হয়, যাঁকে আমি
কখনও দেখিনি।
এবং আরও কী আশ্চর্য, জলে ডোবা খুশিদির কথা...

এই দুপুর, তার এই জলের ধারে ঝুঁকে দাঁড়ানো দেখেই
বুঝতে পারি, সর্বনাশ...

ধুলো

পড়ন্ত বিকেলে শুধু ধুলো ওড়ে নগর চত্বরে
পুরনো রঙিন ধুলো; চেনা। মাত্র কয়েক বছরে
রহস্য ফুরিয়ে আসে, ভেঙে পড়ে পলকা মুখগুলো
নগরচত্বরময় অজস্র সম্পর্কভাঙা ধুলো...

এই শান্ত গোধূলিতে ভর করে কোনও দীর্ঘশ্বাসে
মনে হয়, ধুলোরাও শব্দহীন উড়তে ভালোবাসে
অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঝরে পড়ে এখানে ওখানে
বিস্ময়ের কথা এই, ঝরতে হবে ধুলো তাও জানে

ধুলো ঝরে ধুলো জমে গড়ে ওঠে ধুলো-বালিয়াড়ি
ক্রমশ তলিয়ে যায় রাস্তাঘাট, সেতু, ঘরবাড়ি
বিকেল গড়িয়ে গেলে কোনও এক প্রত্যন্ত সিঁড়িতে
বসে থাকতে থাকতে ভাবি ফিরে যাচ্ছি লুপ্ত নগরীতে

তখনও রোদ্দুর ছিল, আমাদের পাশাপাশি হাঁটা...
চত্বরে মুখের ভিড় ..., চত্বরের সূর্যঘড়িকাঁটা
সামান্য কয়েকটি মাত্র ঘূর্ণনেই অযথা সন্ধ্যায়
যাবতীয় রৌদ্রমুখ মুছে নিয়ে নীল হয়ে যায়...

লুপ্ত নগরীর 'পরে নতুন নগর ওঠে গড়ে
পড়ন্ত বিকেলে তবু, ... পুরনো রঙিন ধুলো ওড়ে...

সুসংবাদমালা

সফর

এইসব টুকরো ছুটির দিন
ভালো লাগে না

অন্তত একটা জীবনজোড়া ছুটি পেলে বড় ভালো হতো

হাঁটু অবধি জমে ওঠা ধুলো
ধুয়ে নিতাম ছোট একটু জলে
সে জল নদীর হলে ভালো,
তাতে উঁচুনিচু নুড়ি

এইসব টুকরো আলো, টুকরো মায়া,
সারাদিন দেখি, আর
গরমের বেলা পড়ে আসে

বাতাসে উড়াল দিল দূরপাল্লা বাসের টিকিট

তুমি ঘরে ফিরে বললেঃ চলো!

দূতী

উত্তরে বাতাস আজ বয়ে আনল সুসংবাদমালা
প্রিয়াঙ্গি হয়েছে রোদ, ঝরে গেছে তার প্রগল্‌ভতা
ঝরে যাচ্ছে অরণ্যে ও আঙিনায় মর্মরিত কথা
যে কথার অন্তরালে শুয়ে ছিল হলুদ নিরালা

নিরালার ডান হাতে ছোট্ট একটি অন্যমনা বাঁশি

প্রিয়াঙ্গি হয়েছে রোদ

হাওয়া তুই বড় সর্বনাশী...

সামুদ্রিক কবিতাগুচ্ছ

এক

সাগর শিশুর মতো ঘুমিয়ে রয়েছে পাশ ফিরে
কেঁপে কেঁপে উঠছে তার ঢেউচোখ ঢেউস্বপ্নগুলি
সৈকতে বিছিয়ে আছে ছোট ছোট করুণ অঙ্গুলি
ঝিনুক জমেছে, আহা, সদ্যোজাত মুঠিটিকে ঘিরে...

দুই

সময় পিছিয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণার পূর্ববর্তী বাঁকে
প্রাগৈতিহাসিক জল ঢুকে পড়ছে জেলেদের গাঁয়
ওরা জানে এ সমুদ্রে কখন জোয়ার আসে, যায়
ওরা জানে ইতস্তত জল, কিছু জল জমে থাকে...

তিন

সারাদিন মীন খোঁজা, সন্ধে হলে অপার্থিব কুপি
জ্বলে ওঠে তীর জুড়ে, হাওয়া ওঠে রহস্যজনক
ফিসফিসিয়ে ওঠে ঢেউ— এইবার রূপকথা হোক
জল থেকে উঠে আসে মৎস্যগন্ধা মেয়ে, চুপিচুপি...

চার

এখানে এসেছ কেন? সারাগায়ে মিথ্যে ডুমোডুমো
এত মিথ্যে নিয়ে কেউ সমুদ্রে নামেনি এর আগে
কিনারে দাঁড়াই, তবু কীটদষ্ট পায়ে এসে লাগে
কী নিষ্পাপ জল! ... তার ভেজা ভেজা লবণাক্ত চুমো..

পাঁচ

যখনই সমুদ্রে নামি, পিছনে পৃথিবী মুছে যায়
চক্রবাল টেনে নেয় অন্য কোনও বৃত্তের ভিতরে
প্রথমত ভয় হয়, মেরুদণ্ডে তীব্র শীত করে
তারপর ক্রমশ ইচ্ছে শিউরে ওঠে পায়ের পাতায়...

ছয়

পরিত্যক্ত প্রেমিকার মতো সেই ফিরে আসছি জলে
বিশ্বাসঘাতিনী আমি, ফিরে আসছি বোবা অনুতাপে
এতদিন জল ছেড়ে অন্যত্র শুয়েছি, সেই পাপে
পাড়েই দাঁড়িয়ে আজও, ...মরা শাঁখ বেঁধেছি আঁচলে..

উদাসী হাওয়ার পথে পথে

হাওয়া

হাওয়া দিচ্ছে।
হাওয়া দিচ্ছিল।

হাওয়া লেগে আরও আরও জোরে
দাউ দাউ জ্বলে উঠল চিতা।
পুড়ে গেল সমস্তই, যেটুকু পোড়ার মতো ছিল।

ক্রমশ আগুন নিভল। এবং, বিলাপও।
চিতাভস্ম খেয়ে নিয়ে মুখ মুছে শুয়ে পড়ল নদী।

আশ্চর্য, তখনও চরাচর জুড়ে
হাওয়া দিচ্ছিল...

জড়বুদ্ধি, বোবাকালা, অন্ধ, মাতৃহীন একটা হাওয়া

পিয়াসী

বন থেকে বনান্তরে ছুটে যাচ্ছে তরাই অঞ্চল।
অঞ্চলে হলুদবাটা ছোপ।
রাজ্যের হারানো গান বেজে উঠল জিপের চাকায়।
জঙ্গল-ভাঁড়ার ভরে ঝমাঝম বাজল তেজপাতা।

আজ তবে অরন্ধন, ছুটি!
বাসি হলুদের গন্ধ, শুকনো লঙ্কা রঙের আকাশ—
সমস্ত উপুড় করে ঢেলে দিল পাদদেশে, ঢালু...

পর্ণমোচনের দিন, শোনো, ওকে নিষেধ কোরো না

ভেল্কি

সারাদিন ধুলোপায়ে হাঁটছি তো হাঁটছিই, শেষে
সন্ধেবেলা চাঁদ উঠল হিমাভ কাচের অন্তরালে।
তৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ এত হালকা লাগল,
মনে হলো উড়ে যাচ্ছি
ঝিমঝিম ঝিমঝিম করে ভাসতে ভাসতে চলেছি গেল্লায়

খালিপেটে ভাসতেও কী ক্লান্তি লাগে
খসে যাচ্ছি, কোনওক্রমে ধরে নিচ্ছি হিমবর্ণ গেলাসের কানা
মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি আস্তে আস্তে গুলে যাচ্ছে
শরবতি চাঁদের কোয়া,
রসভর্তি,
আহা কী জ্যোচ্ছনা!
গুলে যাচ্ছে মেঘে মেঘে আকাশে আকাশে, তবু
ফুরোচ্ছে না...

কানা ধরে ঝুলতে ঝুলতে এইসব ব্যাপার দেখে
খিদে তেষ্টা ভুলে যাচ্ছি দাদা...

অসুখ ১

কার্নিশে হলুদ রোদ, হলুদ কী দুঃখী একটি রং
তুমি তাকে একটুখানি একা থাকতে দিয়েই বরং

চুপিচুপি দরজা খুলে চলে এলে জলের কিনারে
তোমারও বিষাদরোগ, এ অসুখ ডুবজলে সারে...

মনে নেই কার কাছে যেন তুমি শুনেছ কথাটি
ডুব দিয়ে দুই হাতে তুলে আনলে আত্মহত্যামাটি

ওপরে তখনও রোদ, হয়তো সেও বেকার প্রেমিক

বিকেল ফুরিয়ে এল।
হাওয়া বইল সিজোফ্রেনিক...

অসুখ ২

লাক্স সাবানের গন্ধে হাসপাতাল আজও ভেসে আসে।
হাসপাতাল সুখস্মৃতি। মালয়ালী মেয়েটির মুখ—
আমাকে যে ধুইয়ে দিত ঈষদুষ্ণ লাক্স-গুলে এনে।
সেই থেকে বিষণ্ণতা শব্দটির শামলা রং,
ভুরুর ওপরে কাটাদাগ।

লাক্স সাবান লাক্স সাবান, তুমি জানো আমার অসুখ?
আমি শুধু মরতে চাই, মরে গিয়ে ধরো,...ধরো কোনও
নারকেল বনের ধারে ঠেকতে চাই প্রাচীন খালের জলে ভেসে।
ধরো, এই স্বপ্নদৃশ্য দেখছি আমি কুপি হাতে নিয়ে,
কুপির আলোয় যেন মা'র মুখে আঁকিবুকি,
নার্সদিদিটির বুড়ি মা...

সাবানের গন্ধে বড় ঘুম পায়, নার্সদিদি, শোনো,
ধরো যদি একটিবার, —এই শুধু এবারের মতো মরে গিয়ে
তোমার মায়ের পেটে জন্ম নিই নারকেলের বনে

নার্সদিদি, সত্যি সত্যি আমার অসুখ সেরে যাবে

পূরবী

একটি পাতা ঝরে গেল,
সন্ধ্যা এসে দাঁড়াল দুয়ারে।
ভেতরে তখন তুমি অন্যমনা, নিমগ্ন, একাকী,
সুরে সুরে একখানা ভাসমান আসন বুনেছ
কে জানে কাহার করে!
তুমি তার নামও কি জানো না?
জানে না সন্ধ্যাও, তাই থমকে আছে দুয়ারের পাশে
ভেতরে ঢুকছে না, তার পায়ে পায়ে ধুলো,
শুকনো পাতা...

কান্নায় পূরবী লাগল, কে জানে কাহার তরে একা
একা ঘর একা বাড়ি একা একা এমন বিস্তার...

সন্ধ্যা তাকে ছুঁতে চেয়ে,
রবাহূত,
মধ্যমে দাঁড়াল

দায়

এই দু'বাহুর মধ্যে যতখানি তুমি, যতক্ষণ,
তারও চেয়ে বেশি কিছু চাই।
দু'এক পলক, খুব বেশি নয়, দু'এক নিঃশ্বাস,
ঘুমন্ত হ্রদের মতো জন্মদাগ বাদামি বা নীল
পাড় ঘিরে হালকা হালকা রোম—
এটুকুর জন্য কিছু আলিঙ্গন বাকি থেকে যায়।
আমার উরুর মধ্যে যতখানি তুমি, যতক্ষণ,
তারও পরে আরও কিছু বাকি থাকে,
বাকি থাকো তুমি
দু'এক মুহূর্তমাত্র, বেশি নয়, তার বেশি নয়,

সেটুকুই খুঁজব বলে এমনকী এ আয়ু তুচ্ছ,
পরস্পরে আরও দীর্ঘ খেলা
তোমার আমারই শুধু

তোমার আমার এই দায়

ঈশ্বর বিষয়ক ডাইরি

11.11.11.
ঈশ্বর আমাকে বড় ভালোবাসে, এই কথা জেনে
স্নানঘরে শাওয়ার খুলে বন্ধুকে হত্যার স্বপ্ন দেখি
সে মুহূর্তে হাত থেকে পিছলে যায় সুগন্ধি সাবান
কমোডের মধ্যে থেকে সে সাবান তুলতে গিয়ে
বুঝতে পারি: ঈশ্বর আছেন।

11.11.11.
শীতের মরশুম শেষে পুরনো শহরে ফিরে যাব
শহরে নিজস্ব ঘর; একঘেয়ে, অবাস্তব আলো
নিরুদ্বেগ রুটিনে তার মাঝেমধ্যে ঢুকে যাবে, জানি—
ঈশ্বরের জোড়াভুরু,...অলৌকিক গাছগাছালি...নদী...

11.11.11.
কে আমাকে ক্রমাগত আঘাত করেছে? ঈর্ষাবশে
ঈষৎ বেগুনি হাসি, কাঁপা কাঁপা ক্রূর দুই চোখ
আমি তার স্বপ্ন দেখে মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে ফেলে
দেখেছি ঈশ্বর,
তাঁর অত্যন্ত চেনাচেনা মুখ...

11.11.11.
বুকপকেটে ঈশ্বরের নখ নিয়ে ঘোরাফেরা করি
ডানহাতের তর্জনীর নখ, তাতে মাটি লেগে আছে
কপালে ঠেকাব বলে বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখি
নখ নেই, মাটি আছে। মাটিভর্তি অফুরন্ত মায়া

ঈশ্বর বললেন: এস, মাটি দিয়ে আমাকে বানাই।

।।.।।.।।.

আলসে রোদ গড়াচ্ছিল খুব। নিরিবিলি।
কাকে দেখবে বলে আজ নেমেছিলে পশ্চিমের মাঠে?

।।.।।.।।.

তোমাকে যে নামে ডাকি, সে নামও কি এমনই নশ্বর!
বদলে বদলে যায় তার বর্ণরীতি, ধ্বনিজ আবেশ,
পরশুও যে ডাকে তুমি খুশি হয়ে উঠেছিলে বুকে
কাল রাত থেকে সেই ডাকে তুমি গাঢ় ডিপ্রেশনে...

।।.।।.।।.

আমি আর লিখব না গো, ও ঈশ্বর, কষ্ট হলো খুব
যদিও এ কষ্ট ভালো। কষ্ট পাই, তাই জানি—আছ!
লিখতে এত কষ্ট হয়, ও ঈশ্বর, ভাবতেও পারি না
আমাকে লিখেছ তুমি কত অবিশ্বাস্য যন্ত্রণায়...

উপনিবেশ

পৃথিবীর শেষ দ্বীপ অধিকৃত হয়ে গেল কাল।

তুমি যাকে ভার্জিনিটি বলো,
আমি তাকে বলি নির্জনতা।

এই যে এমন হাওয়া, এই বালিয়াড়ি, ওই ঝাউ
এও মহাসাগরেরই গান
তুমি কি বিশ্বাস করো?
তুমি কি ভেবেছ, এই পৃথিবীর শেষতম দ্বীপ,
এখানে কাঁকড়ারা একটা উন্নত সভ্যতা গড়েছিল!
ভাবো, তারা ঘৃণা করত সংক্রমণ, ধাতু ও জাহাজ...

যদিও বালিতে তার ইতিবৃত্ত লেখা নেই কোনও

সৈকতের ঘুম ভাঙছে। ভোর।
হাওয়া লেগে ফুলে উঠছে গোলাপি প্লাস্টিকের থলি
ডোরাকাটা হলুদ কন্ডোম...

ফাঁড়া

কাটিয়ে দাও, মাগো, কাটিয়ে দাও।

সবই তো তোমারই ইচ্ছে,
নয়না ঠাকুরের থানে ওই ইচ্ছে লেগে বেজে ওঠে
গা ভরা গয়নার মতো অজস্র অজস্র ঘন্টা,
ছোট, বড়, কালো হয়ে আসা...
নেমে আসে হাড়কাঁপানো ভারী হাওয়া, বছর বছর,
ঘুরে ঘুরে, দুলে দুলে ওরা নিজেদের মধ্যে বাজে, আর
মেঘ কেটে যায়...মার্চমাস...

হ্রদের অনেক নীচে পৌঁছে যাচ্ছে আকাশের চুড়ো
থেমে থাকা রঙিন নৌকাটি, পপলার,
এ সবই তোমার প্রেম, হৃদয়হরণ ওগো, জানি।

যদি এত প্রেম দিলে প্রাণে
এত তাড়াতাড়ি কেন কেড়ে নিতে চাও মাগো, বলো!

ওর প্রাণ আমার, আমারই।
ট্যুরিস্ট সিজনের আগেআগে
সেটাই তোমাকে দিয়ে যাব...

গ্রহণ

আজ গ্রহণের দিন। গ্রহণ লাগা গোলাকার পেট
ফুলে উঠে ফেটে গেল। শব্দহীন বিস্ফোরণ থেকে
পূর্বমুখে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র বাদুড়।
তাদের অদ্ভুত ডানা সূর্যের নিশানা মনে রাখে,
ঠিক তার উলটোমুখে উড়ে যায়।
রোজ নয়। গ্রহণের দিন।

অন্যদিকে ঝলসে উঠছে মহাজাগতিক বিনোদন—
হীরে আংটি, সৌরঝড়, হিলিয়াম শিখা ও করোনা।
এসব তামাশা থেকে কী নিঃশব্দে পালাচ্ছে বাদুড়...
থোকা থোকা অন্ধকার বুকেপিঠে, ডানার তলায়
যত্ন করে রাখবে বলে নিয়ে যাচ্ছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে।

ওদিকে সূর্যের মুখে থাবা মারছে, এমনকী...
চাঁদ!

বিকেল

টেবিলে রোদের খাম, চৌকোনা, রোগাটে গড়ন।
খাম বলতে চিঠি, আর চিঠি বলতে আরও যা, যেটুকু—
আঠাস্পর্শ, আঠাজল,
আঠাআঠা যত্ন দিয়ে বন্ধ করা রোমাঞ্চিত মুখ,
অসুস্থ হাতের টান, ভালো নেই যারা কোনওখানে
কাছে নেই, মনে নেই,
বিষণ্ণ সাইকেল ঠেলে একা একা বাঁক ঘুরে
চলে গেছে চেনা পোস্টম্যান

আলগোছে পড়ে থেকে থেকে
টেবিলের প্রান্ত ঘেঁষে
বেঁকে, ঝরে, গলে যায়
সকালের পুরনো অক্ষর

ব্যূহ

যারা এসেছিল, আমি তাদের চিনি না।

কখনও দেখিনি বললে ভুল হবে, তাই বলছি, ওরা
আমার জানলার বাইরে সজনেগাছ,
হালকা ফুল, অনুজ্জ্বল শাদা শাদা আলো,
নিকোনো অঙ্গনে একটা দাপুটে মোরগ,
হতে পারে...

অগভীর নলকূপে জল তুলছি, ছাপা বুনো শাড়ি
ওরা তার জমি থেকে বেছে বেছে, খুঁটে খুঁটে
ছাড়িয়ে নিচ্ছিল মুথাঘাস

পুরোটা বলার আগে চাঁদ ডুবে গেলে
অন্ধকার জ্বলে ওঠে আদাড়ে পাদাড়ে।
ভয় করে।

যারা এসেছিল, আমি তাদের দলের কেউ নই...

বায়ুরোগ

যে আসবে না, মাঝেমধ্যে তার কথাও ভাবি।

জানলার গোড়ায় চকচক করছে রোদ,
ওরই মধ্যে বৃষ্টি নামল।

ভাবি, সে তো এলেও আসতে পারে এভাবেই।
এরকমই উলটোপালটা, আয়োজনহীন...
তার আসবার পথে কত শতাব্দীর ধুলো মরে কাদা হয়,
সব গিয়ে তোমারই প্যান্টে লাগে

দুষ্টু, ঘষতে ঘষতে প্রাণ বেরিয়ে গেল,
কবে একটু বড় হবি তুই!

যে আসেনি, তার কথা ভাবতে ভাবতে
উঠে যাচ্ছে আমাদের কলঙ্ক, মন কষাকষি, হাতাহাতি

ঢেউয়ের মতো, বন্যার মতো, সাবানজলে ভেসে যাচ্ছে বাড়ি
সাবানজলে ভেসে যাচ্ছে
পৃথিবী...

মায়ের জন্যে লেখা কবিতা

মেলা

ভেঁপু বাজছে, জিলিপির গন্ধে গন্ধে সূর্য ঝুঁকে এল
ছোটখাটো সাধগুলি উঠছে নামছে নাগরদোলায়
রঙিন কাচের চুড়ি, কাচপোকা টিপ, সেফটিপিন
সহজ খুশির সাজে নেচে উঠছে মাটির পুতুল

ওদিকে কাঠের খেলনা, চল্ মা, আমরা ওই দিকে যাই
কী নিবি আমাকে বল্, ছোট ছোট খুন্তি হাতা বেড়ি
না রে মা, ওসব নয়, কিনে দেবো নৌকো পালতোলা
তোর হাসি দেখব বলে এই দ্যাখ্ পয়সা জমিয়েছি

ফিক্ করে হেসে ফেলল লাজুক বালিকা, ছেঁড়া ফ্রক,
চোখেমুখে অবিশ্বাস আনন্দ বিস্ময় মাখামাখি
সারা গায়ে খড়ি উঠছে, রুখুশুখু চুলে দুই বেনি
বড্ড রোগা, মুখচোরা, মা আমার বড় ছন্নছাড়া

কোনওদিন বেশি কিছু চাইতেই শেখেনি, শুধু এই
লুকিয়ে মেয়ের সঙ্গে হারানো মেলায় যাওয়া ছাড়া

পাল্লা

গান তার সই ছিল, গঙ্গাজল, গোপন কথাটি...
আমার পাল্লায় পড়ে ছত্রাখান হলো সেই সুর
একদিন তাকেও ফেলে বেপাত্তা হলাম পরিপাটি—

সে বিয়ে ভেঙেছি আমি,
মা'ও আর পরে না সিঁদুর

অবিকল

সময় কেমন জাল পেতেছে চোখের পাশে
এখন তোমার ঠোঁটের আগে চোখটি হাসে
হাসির ছলে পড়ছে আড়াল কান্নাটুকু
জালের তলে গভীর জলের কান্নাপুকুর

কান্নাপুকুর উথলে ওঠে রূপ রুপোলি
কখন এমন চোখ ধাঁধানো দেখতে হলি!
কপাল জুড়ে মেঘ নেমেছে, আড়াল থেকে
বৃষ্টিধোয়া রোদের রেখা পড়ছে বেঁকে

কালোয় আলোয় করল শুরু তুমুল খেলা
তোমার চোখে রহস্যময় বিকেলবেলা
এমন বিকেল দেয় না ধরা ঘড়ির কাছে
সময়!— সে তো জালটি পেতে বসেই আছে

কী জব্দটাই করলি তাকে, সত্যি মাগো!
এখনও তুই তেম্‌নি পাজি... তেম্‌নি পাগল...

শ্রাবণ

আবার শ্রাবণ মাসে ফিরে এল মালা ও মদিরা
দেখা হলো নদীকূলে, অন্ধকারে, যখন বিদ্যুৎ
দু'হাতের অঞ্জলিতে প্রদীপের মতোই অদ্ভুত
আলোতে চিনিয়ে দিল ভিজে ত্বক, সবুজাভ শিরা

শিরায় বকুলগন্ধ, মৃদু গন্ধ দারুণ মাদক
নেশায় বেপথু হয়ে শুয়ে পড়ল টলোমলো রাত
নদী তাকে নিয়ে নিল, শব্দ উঠল সামান্য ছলাৎ
তখন শ্রাবণ মাস, কূলে কূলে প্লাবিত দু'চোখ

চোখের ইঙ্গিত লেগে ছলকে গেল সমস্ত মদিরা
প্রবল স্রোতের মুখে সে মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল মালা
বৃষ্টিতে বিদ্যুতে আহা নদীটি আনন্দে ফালাফালা
যেভাবে বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলে সোমত্ত নদীরা

সেইভাবে, সেভাবেই, দাঁড়িয়েছি অন্ধকার তীরে
অনেক বছর পরে শ্রাবণ এসেছে আজ ফিরে...

অভিলাষ

কাছে থাকো, যতক্ষণ পারো কাছে থাকো
এ সময়ে কাছে থাকা নিতান্ত জরুরি,
যে কোনও মুহূর্তে আমরা যেতে পারি চুরি
নিজের ভেতর থেকে।

নাম ধরে ডাকো,
শরীরী স্পর্শের চেয়ে আরও কাছাকাছি
সরে এস, এ জীবন সামান্য সময়
সেই সঞ্জীবনী দাও, যাতে মনে হয়
জীবন ছাপিয়ে আরও তীব্র বেঁচে আছি

হাত ধরো পরস্পর, আঙুলে আঙুলে
অভেদ্য বুনোট গড়ো, যেন জলোচ্ছ্বাসও
ব্যর্থ হয় এই সেতুবন্ধ দিতে খুলে
আরও দৃঢ়, আরও দৃঢ়তর ভালোবাসো

কাছে থাকো, যেন অনিবার্য পরিণামে
একটি নদী জন্ম নেয় সেতুটির নামে

তুঁহু মম

আড়াল

আমাকে একাকী রেখে ঘুমিয়ে পোড়ো না, ভয় করে
পাশ ফিরে নেমে যাচ্ছ অন্য কোনও ঘুমের শহরে
আমার কি একলা ঘুম? আমাদের ঘুম কি আলাদা?

পাশাপাশি শুয়ে আছি। মধ্যিখানে ঘুম এক বাধা...

আশ্রয়

যেভাবে আমাকে চাও প্রিয় হতে পারিনি সেভাবে
বরং অবাধ্য হয়ে হয়েছি তোমার প্রিয়তমা
যতই শাসন করো, জানি সে শাসনে মিশে যাবে
তোমার প্রেমের চেয়ে মধুর, গভীরতর ক্ষমা....

অতল

তোমাকে শরীরে চাই, শরীরের দূরতম শেষে
পৌঁছে দেখতে চাই দেহ কীভাবে মনের সঙ্গে মেশে
তোমাকে মনেও চাই, অন্তরের অতলান্ত খুঁড়ে
দেখতে চাই আছ কিনা আমার নিভৃত আত্মা জুড়ে

সেখানেও থাকো যদি, তবে তোকে চাই বা না চাই
তুইই প্রেমিক মম, তুই পিতা, পুত্র, তুই ভাই...

অশ্বারোহিণী

যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে অক্ষৌহিণী
মধ্যরাত্রি, আমি দুরন্ত অশ্বারোহিণী
অশ্ব আমায় ধারণ করেছে একটি শর্তে
পথে নয়, তাকে চালনা করব ঘূর্ণাবর্তে
স্পর্শমাত্র কাঁপছে শরীর তীব্র হ্রেষায়
মহাবেগে তাকে ছুটিয়ে দিয়েছি কী অন্বেষায়!
ছুটতে ছুটতে খসে গেল তার ছিন্ন লাগাম
কেশর ধরেছি আঁকড়ে, কেশরে অজস্র ঘাম
অশ্ব আমার বাধ্য অথচ নিজের ইচ্ছে-
মতোন আমাকে মারছে আবার বাঁচিয়ে দিচ্ছে
অশ্ব নিজেও মরছে বাঁচছে আমার সঙ্গে
উঠছে পড়ছে জীবনমৃত্যু শ্বাস-তরঙ্গে
গতি উদ্দাম, গতিতে ক্রমশ আগ্নেয় ধার
কী নিঃশব্দে কাটছি দু'পাশে কঠিন আঁধার!
অশ্ব তোমার অঙ্গে কেমন গোপন বারুদ
শরীরে ফুটছে তরল অগ্নি, ঘন বুদ্বুদ
আর দেরি নেই, এখনই ঘটবে সে বিস্ফোরণ—
না না, আরেকটু,...আরও কিছু দূরে স্বর্গতোরণ...

ঐ পথটুকু অশ্বপৃষ্ঠে উড়তে উড়তে
স্বর্গের সীমা স্পর্শ করেছি শেষমুহূর্তে
এই ঘুমন্ত প্রান্তর থেকে দূরে বহু দূরে
অশ্বারোহিণী লুটিয়ে পড়েছে অশ্বের ক্ষুরে
আহ্ কী মৃত্যু...কী আরাম এই ধ্বংস হওয়ার—

অশ্ব আমাকে বলেছিল: তুই দারুণ সওয়ার।

ভস্ম

এক

আজও আমার পেটের মধ্যে বাতাপি রাক্ষস
উবু হয়ে বসে আছে
সামনে দিয়ে সার বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে নীল স্কার্ট শাদা ব্লাউজ
ক্লাস টুয়ের দিদিরা
            ক্লাস থ্রিতে উঠে যাচ্ছে সব
আমার পাতের ভাত নিয়ে যাচ্ছে কাক বক
                                    শালিক চড়ুই

বাতাপির চুলে জবাকুসুম
বাতাপির চুলে নীল ফিতে
চোখগুলো টকটকে লাল, হাতে চৌকো টিনের বাক্স...

আমার পেটের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে
ক্লাসে পড়া না পারার ভয়

পেটের ওপর ঠাণ্ডা জল হাত বয়ে যাচ্ছে
                                    হাজার বছর

ও বাতাপি ভস্ম হয়ে যা
ভস্ম হয়েও ধুলোয় মিশে যা

আমার মায়ের হাত যে ধুলোয়
আমার ফাঁপা পেট যে ধুলোয়

আমার জন্ম জন্ম যে ধুলোয়...

দুই

যেদিন যেদিন
উত্তরপুবের মাঠ থেকে হরিসভার গান ভেসে আসে
সেদিন সেদিন
হারিকেন জ্বালাই
লম্বা লম্বা ছায়াগুলো হাঁটু মুড়ে গোল হয়ে
প্রার্থনায় বসে চাদ্দিকে
প্রার্থনা তো করে না মোটেই
শুধু সেই এক ভঙ্গি করে শোনে...

আমি খাতা বার করি

উত্তরপুবের মাঠে শচীমা কাঁদছেন
তাঁর মেঠো চিৎকারের স্বরে কাঁপে হাওয়া
রাত্রিও তরল, কাঁপে, হারিকেন শিখায় ঝটকা লাগে
পানাপুকুরের গর্তে ডাহুকের বাচ্চা কেঁদে ওঠে
ওঁয়া ওঁয়া মাগো মাগো
ঠিক মানুষের ছানার মতোন

হরিসভা থেকে গান ভেসে এলে
বুঝি আজ আরেকবার জমজমাট রাত...
স্বপ্ন দেখি খুব!

আজ সেই রাত
সেই হারিকেন
সেই ছায়া

তিন

আজ কেন শাঁখ বাজল আমি জানি না
বাজবার কথা ছিল না তার
বাতাসে উঠে এল কাটা ফলের প্রসাদী গন্ধ
আধখানা গোল গোল করে কাটা কলা
ভেজা শাঁকালু
আর দুটো গোল শসার চাকতি
সবকিছুতে দোপাটির গন্ধ লেগে আছে

আমি কোঁৎ করে গিলে ফেলি দোপাটির পাপড়িসমেত
মাথায় ঠেকাবার কথা মনে নেই...

সঙ্গে সঙ্গে উড়ে আসে আরও শালপাতা
তারও মাথায় চুলে গন্ধ, তেলসিঁদুর
আমার একবস্ত্রা মা গলায় কাপড় দিয়ে
ধূপ জ্বালছে একমনে

ওদিকে প্রদীপের বুক পুড়ছে, সর্ষের তেলের
ঝাঁঝ উঠছে খুব
লক্ষ্মীর পাঁচালি উড়ছে, ঝুরো ঝুরো আধময়লা পাতা...

আজ কেন হচ্ছে আমি জানি না এইসব
বেস্পতিবারের গোল সিঁদুরের টিপ
ধেবড়ে যাচ্ছে
মুছছে না

দেখতে দেখতে কী প্রচণ্ড ছড়িয়ে পড়ছে
সারাটা কপালে...

চার

আগে আগে ঠিক এই দিনে
আমি বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতাম

বেড়ানো মানে খুব কম পাওয়ারের
কমলা বাল্‌বজ্বলা গলি দিয়ে হেঁটে হেঁটে
পাশের গলিতে পৌঁছানো,
সেখান থেকে তার পাশের...

আর সস্তার পাউডার কেনা

ঘরে এসে দেখতাম মা রাতের বেলা চান করেছে
খুব শাদা শাদা মালতীফুল, থোকাথোকা,
তাতে পিপারমিন্টের গন্ধ,
দুলছে আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়

আজ কী দিন রে? দাদাকে জিজ্ঞেস করতাম

দাদা কী বলত ঠিক মনে নেই,
শুধু মনে আছে
আমরা দু'জন বারান্দাতেই শুয়ে,
ঘুমিয়ে কাদা...

পাঁচ

লোডশেডিং হয়ে গেলে
বঙ্কুদাদের তিনতলার ঘরে লম্ফ জ্বলে
ওটা ওদের বসার ঘর

মোটা পর্দা একপাশে সরানো
তার পাশে যেটুকু জানলা
সেটুকু কমলা লাল আলোজ্বলা কাচ

ওখানে রাত জেগে ভীষণ জরুরি চিঠি লিখছে
একজন রাজপুত্র, পালি ভাষায়

এই যে লোডশেডিং, এ তো ছাউনি,
ও দিকে নদী, নদীর ওপারে তো শত্রুসৈন্য

সন্ধিপত্র পাঠাতে হবে সেইখানে
তা নইলে যুদ্ধ চলবে আরও...

চলুক চলুক, লোডশেডিং চলুক,
আজ যেন আলো না আসে ঠাকুর!

বঙ্কুদা তো রাজপুত্র,
সে মোটেও খালি গা হয় না

ছয়

মেঘ করে আসছে, মা
রাস্তা দিয়ে তরতর করে ছুটে আসছে
বাচ্চা বাচ্চা মেঘেদের ছায়া

আমাদের লম্বাটে রাস্তা, সমান রাস্তা, বাঁক নেই
পিচ হয়েছে সবে
তার দু'দিকের বাড়িগুলোও নতুন এসেছে এ পাড়ায়
হলুদ চুনের গন্ধ, ভেতরটায় ভেজা ভেজা ধুলো

মেঘ কোন্ বাড়ি যাবে, মা?

দৌড়ে ছাতে যাব,
সন্ধ্যার ছাতে কত কাঁটা পোঁতা, মাগো
আমাদের ঘরে টিভি নেই...

সাত

আজকাল আমার নাক খুব চোখা হয়ে উঠেছে
থেকে থেকে ঝড়ের গন্ধ পাই

কেউ পাত্তা দেয়নি, কিন্তু সবাই দেখেছিল
উত্তরের আকাশ লাল
রাত্তিরের ঝোঁকে অমন লাল আকাশ দেখলে
আমার মনে পড়ে

কী জানি কী মনে পড়ে...

যে বয়েস ছিল, সে তো উড়ে গেছে উত্তরে হাওয়ায়

আট

খুব জ্যোৎস্না হলে আমার দুঃখগুলোও শাদা হয়ে যায়
খুব জ্যোৎস্না মানে শুধু জ্যোৎস্না না,
অনেকটাই মেঘ
আর লোডশেডিং
আমাদের পাড়া তখন গ্রিস কিংবা রোম
বাড়িগুলোও আর বাড়ি নয়, সব পাষাণসৌধ,
দুঃখ পেয়ে চুপ করে গেছে

রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে কুকুর দৌড়য়
তার নখের শব্দ শুনি
এক্ষুনি কোনওদিক থেকে একটা আক্রমণ হবে

সমস্ত সভ্যতা, যারা ধ্বংস হয়ে গেছে
তারা ধ্বংস হয়েছিল কোনও না কোনও জ্যোৎস্না রাতে
তাদের আত্মার মতো শাদা পরী
ডানায় সুগন্ধ নিয়ে নেমে আসে পাড়ায় পাড়ায়

আমি একটা ইস্কুল পালানো মেয়ে,
আমি ঠিক পরী হয়ে যাব

নয়

আজ তোমাকে সব সত্যিকথা বলব, মা
আজ ইস্কুলে টিফিন খাইনি
দারোয়ানের কুকুরের নাম হেমা
ওকে দিয়ে দিয়েছি সকল পাঁউরুটি

আজ বাংলা খাতা বেরিয়েছে
দশে সাত পেয়েছি, হায়েস্ট উঠেছে আট
শর্মিষ্ঠা পেয়েছে বলে ওর সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে

কিন্তু মা
ভূগোলে আমার চেয়ে বেশি কেউ পায়নি, জানো,
সাড়ে নয়!

আজ খেলাদিদি গাল টিপে দিয়েছে আমাকে
খেলাদিদি হাতকাটা জামা পরে বলে
আমাদের ক্লাসের রুবি, পাজি মেয়ে, বলেছে সেক্সি
আজ ভাঙা বাসের পেছনে ল্যাংটো ল্যাংটো খেলেছে
সুকন্যা আর চান্দ্রেয়ী
হ্যাঁ গো মা, আমি দেখেছি...

আমার পাপ হবে জেনেও চোখ বুজে ফেলিনি, মা

ও মা, আজ সব সত্যি বলছি তোমাকে
পঁচিশ বছর পর
আজ আরেকবার বারান্দায় মাদুর পাতো
মাগুর মাছের ঝোল মেখে
আরেকবার তুলে দাও মুখভর্তি ভাতের গরাস

দশ

অনেকদিন আগের একটা গরমের বিকেলে
মনখারাপ থেকে উঠে যে জামাটা পরেছিলাম
স্নান সেরে

আজ সেই জামা দিয়ে
কম্বল মুড়ে রাখছে আমার মা

শীত শেষ হয়ে গেল এবারের মতো

এই গরমের হালকা ফুল ফুল সুতির জামাটি
সামনের শীতে কি ছিঁড়ে যাবে

এগারো

আজ আর কোনও কথা বোলো না,
শুয়ে পড়ো

ভাবো, উঠোনের পাশটিতে চুপচাপ ফুটে উঠছে
গন্ধরাজ ফুল...
ওর কোনও পিছুটান নেই

এই রাত্রি
এরও যে একটা নিজস্ব সকাল রয়েছে
যার সঙ্গে তার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই—
সত্যি কথা বলতে কি,
তুমি জানো না

তা হোক, এতে লজ্জার কিছু নেই

ঘুমোও

আত্মাভিযান

দিনশেষে ছদ্মবেশে সম্মুখে দাঁড়াল এসে কবি
সেই ফাঁকে আমি তাকে কথার অমৃতপাকে ফেলে
বাঁধতে থাকি, এই ফাঁকি ধরতে সেও পারে নাকি সবই
তা জানি না তবে কিনা সূত্রটুকু এখনই না পেলে
কোন্ ছলে কী কৌশলে কিংবা কোন্ মন্ত্রবলে তাকে
ভোলাব যে! ও কি বোঝে সারাদিন তৃষ্ণা খোঁজে কাকে!

সে আমিই, আত্মকামী, যাকে চেয়ে জলে নামি একা
সে-ই শেষে ভালোবেসে তুলে আনছে সর্বনেশে লেখা...

আত্মাভিযান

আত্মাকে অপাপবিদ্ধ করো,
জলে নামি
দ্যাখো, জলে আমাদের ছায়া
তুমি, আমি
ভেঙে যাচ্ছি খরজলে
অল্পে, ক্রমে, শেষে দ্রবীভূত
প্রথম পরীক্ষা এই,
প্রমাণিত হলো জন্ম...
আমরা তবে অরূপসম্ভূত।

রূপ, তাকে কখন কোথায়
কী নামে ডেকেছ, মনে পড়ে?
কতবার দিকছেঁড়া ঝড়ে
হারিয়ে, তুলেছ তাকে কুড়িয়ে
বিপথে, বারবার!
মনে করো, সেসবই আমার
দিনান্তে খসিয়ে দেওয়া পালক,
শিকল, মনোরোগ
কাটাচিহ্ন, ক্ষত, তাকে
আড়াআড়ি এঁকে
ভাবলে,— যোগ!

এভাবেই ভুল অঙ্ক ধরে
হিসেব মিলিয়ে দিলে হিসেবের কুহকে,
গহ্বরে,
অন্ধ, অন্ধ, গুহার ওপারে
কী আছে? দেয়াল? খাদ?
নাকি তুমি নিতান্ত আঁধারে
চক্ষু হারিয়েছ,
আহা, শোনোনি অস্পষ্ট কলকল

নক্ষত্রে নক্ষত্রে, শোনো,
গ্রহে গ্রহে বেজে উঠছে
আকাশগঙ্গার চলাচল...

এস, আর একটিমাত্র ঝাঁপ—
দ্বিধা নয়, ভয় নয়,
তোমার সম্বল শুধু
অনিবার্য গভীর সন্তাপ
মহাশূন্যস্রোতগর্ভে ডুবে গেছে তোমার পারানি
এস, হাত ধরো,
এই পর্যটনে আমিই তো জানি
কোথায় তোমার ব্যথা, ক্ষত!
মোচন করেছ যত রক্ত, সবই বেদনাসম্মত
একথা নিশ্চিত জেনে
ছিঁড়ে ফ্যালো অভিকর্ষটান
পথে যত পান্থশালা পাবে,
সে তোমার নয়, ঋতবান!

ওড়ো!
এ উড়ান জ্বালাময় যত,
তত জ্যোতির্ময়,
পোড়ো—
অবশেষে যে তোমার তুমিই ইন্ধন,
সেই শ্বাস
নিয়ন্ত্রণ করো, বেগ,
বইয়ে দাও উনানের রন্ধ্রে, আহা,
কী অমৃত
সুসিদ্ধ, সুতপ্ত সর্বনাশ
নিজহাতে বেড়ে দেবে পথশ্রান্ত ক্ষুধিত আত্মাকে
সে তোমার অভিলাষী,
সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে

বলো, তুমি ক্ষুধাকে চেনোনি?
অন্নের চূড়ায় দ্যাখো জেগেছে কঠিন লিঙ্গ
অন্ন ফেটে খুলে যাচ্ছে যোনি,
সেও পথ,
সেও তো সন্ধান!
জেনেছ, প্রাণকে বড় ভেঙেচুরে জন্ম নেয় প্রাণ
তারও ভাষা আছে,
সেও বলে কিছু,
আজীবন,
আরও আরও বলতে চেয়ে শেষে
সমুদ্রগর্জনে, গানে, অরণ্যমর্মরে গিয়ে মেশে!
সে কি তার অন্ত?
নাকি আদি?
এ মুগ্ধ জীবনে জন্ম যে সুর বাজায়, আহা,
মৃত্যু তার নিখাদে সম্বাদী

ভাবো,
আত্মা শুয়ে আছে পথে,
আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব
সঙ্গে নেব,
কেননা,
সে আমাকেই চেয়েছিল পেতে
বারংবার, জন্মে জন্মে,
শব্দ হয়ে নেমেছিল মহোৎসবে, যন্ত্রণায়,
শস্য হয়ে আদিগন্ত ক্ষেতে—
সে আমার প্রিয়,
আমি তার,—
এই পরস্পরোপম
সাদৃশ্য রোপণ করো চিত্তে,
উচ্চারণ করো
সোহম! সোহম!

বলো, কত চিনেছ নিজেকে?
বলো কতবার নাম বদলে নিয়েছিলে তুমি
কতবার কত মুখ এঁকে
বহন করেছ তার গ্লানি ও চেতনা!
পাপে, পুণ্যে, প্রেমে, দ্বেষে,
বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে
তুমি ছাড়া ভাবাই যেত না
সভ্যতার সৃষ্টি, লয়,
লালন, আবর্ত ইতিহাস
তুমি! চির সময়ের নিয়ন্ত্রিত বিপর্যয়
আপাতস্বাধীন ক্রীতদাস

ক্রীতদাস? তাই অসহায়!
নিয়তিনির্দিষ্ট পথে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
চলেছে সে বিনা জিজ্ঞাসায়
সে, মানে তুমিই, তুমি,
কতবার, পড়েছিলে প্রেমে?
নারী বা পুরুষ, তুমি যেই হও, কতবার
সুনির্মিত পথ থেকে নেমে
মিশেছ প্রান্তরে, ক্ষেত্রে,
মাটি হয়ে, ধুলো হয়ে
জল হয়ে মিশেছ নদীতে...
মিলনে, বিদ্যুতে, শোনো—
একবারও, একবারও
সত্যি পেরেছ কি চিনে নিতে
আনন্দশরীর, তার
রোমে রোমে হৃদয়স্পন্দন?
নাকি, সত্য বলো,
তাকে তীব্রতম ছুঁয়েছ যখন
আকাঙ্ক্ষা জ্বলেছে আরও অনির্বাণ?
অতৃপ্তিতে ভুগে

কেবলই চেয়েছ শুধু,
জন্ম থেকে পুনর্জন্মে
মৃত্যুবিদ্ধ আবর্তনে, যুগ থেকে যুগ থেকে
যুগে...

যুগ যায়,
যুগ ফিরে আসে
তুমিও এসেছ দেখে অপার বিলাসে
সে তোমাকে ভেঙে গড়ে,
অথবা গড়ে না
ভাঙে শুধু।
তোমার এ জন্ম জুড়ে যতটাই শূন্যতার ধু ধু,
ততটাই ভাঙনের নেশা
রক্তপাতে, প্রতিশোধে,
জিঘাংসায়, আক্রমণে
অন্য এক জটিল অন্বেষা
জেনো,
সেও অনর্থক নয়!
অমোঘ অসহনীয় ক্ষয়
হতে পারে ভুল,
হোক পাপ—
সময় দক্ষিণহাতে ধারণ করেছে তাকে
পড়ে আছে মাত্র অনুতাপ।
অগ্নিমূল্যে কেনা সেই দুঃখধন
তোমার পাথেয়
সেটুকু তোমারই,
তুমি তাকেই কুড়িয়ে নিয়ে যেও...

যাবে, কিন্তু কোন্ দিকে যাবে?
চতুর্দিকে, পথে পথে ছড়ানো তোমারই খণ্ড
যে তুমিই তোমার স্বভাবে

কখনও প্রেমিক ছিলে,
কখনও কপট হত্যাকারী—
যে পথে এসেছ হেঁটে
ঐ দ্যাখো,
সে পথে তোমারই
যাবতীয় চিহ্ন, আয়ু,
পাশাপাশি ধুলো হয়ে আছে
চূর্ণ হয়ে গেছে সব কৃতকর্ম,
আগুনের আঁচে
পুড়ে গেছে যত উপার্জন।
মারাত্মক বিপুল ঘূর্ণন
অবশিষ্ট যা রেখেছে
জন্ম জন্ম তারই খোঁজে তুমি
অন্তরীক্ষে মিলিয়েছ দীর্ঘশ্বাস,
মৃত্তিকায় ব্যর্থ জন্মভূমি...
যা মেলেনি খননে বা সমর্পণে
আর্তিতে, লুণ্ঠনে, প্রতিভায়—
কী অনুসন্ধানে, প্রিয়,
তোমার সকল বেলা যায়!
জানোনি, সে আকাঙ্ক্ষিত কী যে,
সে তোমার প্রিয়তম,
বন্ধু,
শত্রু,
সে তো তুমি নিজে!

আমি সে-ই
এস, হাত ধরো,
দ্যাখো, রূপে রূপ গলে যাচ্ছে,
আর কোনও ভবিতব্য নেই।
এই হাত,
এরও কোনও স্পর্শ নেই,
শুধুই মিলন

অগ্নিতে অগ্নির মতো
মরুতে মরুৎ, আহা,
কায়াহীন এই আলিঙ্গন
শূন্য হয়ে মিশে যাচ্ছে মহাশূন্যে
যেন এক অতীন্দ্রিয় ধোঁয়া
শব্দহীন তোলপাড়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে—
ছিটকে উঠছে জ্যোতি, পুণ্যতোয়া
নক্ষত্রে, আঘাতে, স্রোতে
নিঃশেষে ভাসিয়ে দিল
পরিত্যক্ত ছিন্ন ছদ্মবেশ...

যে মৃত্যু জন্মকে ডাকে
এই তার মৃত্যুহীন শেষ



এ সবই রাতের চিহ্ন

সূচি

অবেলায়

কী করে তোমাকে আজ এ কথা যে খুলে বলব আমি...
অবিশ্বাস করবে হয়তো, কিংবা ভাববে নিছক পাগলামি
রেগে উঠলে দোষ নেই, হতে পারো বিষম বিব্রত
এমনকী, জানি না তুমি বুঝতে পারবে কি না ঠিকমতো

আমারও অবাক লাগছে, এই ঘোর গৃহস্থ বয়েসে
আবার নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি শেষে!
দশবছর বিবাহিত, অকস্মাৎ এ কী বিড়ম্বনা
সাধ বলছে : ভেসে যাই, দ্বিধা বলছে : যাব না যাব না

নীল শার্টে চেনা গন্ধ, ফিরে আসছে উন্মাদ সময়
সেই ছেলেটির সঙ্গে সদ্য সদ্য তীব্র পরিচয়
কোঁকড়া চুল, জোড়াভুরু, দুই চোখে মরমী চুম্বক
পুনর্বার আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে অসহ্য যুবক

ঐ শার্ট পরলে কেন ... বালিগন্ধ ... সামুদ্রিক নীল
কী কী ছিল আমাদের খুঁটিনাটি মিল বা অমিল
ভুলে যাচ্ছি, ... ক্ষমা করো ... দশবছর কেটে গেছে যাক
যদি আজও বন্যা আসে, আসুক সে, বসতি ভাসাক...

দ্বিধা বলছে : বেলা গেছে, সাধ বলছে : আয় জল্‌কে নামি
আবার তোমারই সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি আমি...

পিছুটান

এখনও দিগন্তমাঠে যেতে ইচ্ছে করে
যাওয়া? নাকি ফিরে যাওয়া? গূঢ় পিছুটান
বিষাদ চারিয়ে দিচ্ছে ভিতরে ভিতরে
চতুর্দিকে পল্লবিত সাজানো বাগান

বাগানে জটিল ঋতু, ক্ষুরধার হাওয়া
চিরে দিচ্ছে রোদ, জল ; ফেটে যাচ্ছে মূল

এখনও সম্ভব জানি সেই চলে যাওয়া
দিগন্তে অপেক্ষা করছে আকাঙ্ক্ষিত ভুল

ভুল বড় দুঃসাহসী, দারুণ মায়াবী,
দিগন্তরেখার মতো ঘিরে ধরছে মন
হাতে তার ঝলসে উঠছে রৌদ্রময় চাবি
ঘরদোর...আঙিনায় আনন্দস্বজন...

আহা, সে আঙিনাখানি শুয়েছে গভীরে
একটি ছোট ইচ্ছে শুধু বাঁধা আছে তীরে

মন্ত্রণা

শুধু হৃদয়ের কথা শোনো
হৃদয় কী বলে? ভালোবাসি?
তবে আর কথা নেই কোনও
হৃদয়কে দিয়ে দাও ফাঁসি
ফাঁসিকাঠে হৃদয় দুলুক
মৃদুমন্দ ফাগুন বাতাসে
জনতার কৌতূহলী মুখ
দূর দূর থেকে লোক আসে
লোভনীয় কটুগন্ধ পেয়ে
এসে দেখে সমারোহ ভারি
ফাঁসিকাঠ ফুলে গেছে ছেয়ে
ঝুলে আছে ফুলেল কুমারী!

মানুষের মুখে চাপাহাসি
মানুষের চোখ ছলোছলো

মানুষেরা বড় অবিশ্বাসী

হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলো

অহল্যা

একদিন বলছিস ফিরিয়ে নিবি মন, অন্যদিন তুই কী করছিস?
রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে রাখা সেই চিহ্ন খুঁজছিস অহর্নিশ!
চিহ্নের দরকার? তাহলে খুঁজে দ্যাখ —রাস্তাঘাট নয়, বরং তোর
নির্জন স্নানঘর, যেখানে প্রতিদিন কান্না রাখতিস, জলের তোড়
উপচায় চৌকাঠ, জলে কী চোরাটান! ভাসতে ভাসতেই নিরুদ্দেশ
ফেরবার পথ নেই, ফেরাবি কাকে মন? আজকে তোর সব পথের শেষ
সেই তার দরজায়, দরোজা ছুঁয়ে বল— খুলতে নাই চাও নাহয় থাক
আজ কাল পরশুর হিসেবও কিছু নয়, যায় তো যাক মাস, বছর যাক
একদিন ভাঙবেই পুরনো প্রতিরোধ, তার আগের এই সময় স্থির

সেই বন্ধুর হাত না ছুঁবি যতদিন মৃত্যু নেই এই শতাব্দীর।

অষ্টমী

সাতদিন সাতরাত ভেবেছি প্রতিপল আহ্, না, আর নয় এবার আর
স্রেফ ভাবনায় নয়, শরীরে ছুঁতে চাই সত্যিসত্যির শরীর তার।
সাতদিন পূর্বেই জড়িয়েছিল সেই একটি ঘন্টার প্রথম দিন,—
আজ অষ্টম দিন, এখনও কেন তার স্পর্শ ঝলসায় বিরামহীন!

স্পর্শের দোষ নেই, আসলে সে আমার কল্পনার দোষ, মনের ভুল
স্বপ্নেই সম্ভব ফুটিয়ে তোলা এই লক্ষ রোমকূপ- কদমফুল।
প্রত্যেক দিন যায়, রেণুতে সীমাহীন ইচ্ছে আছড়ায় বারংবার—
অষ্টম দিন আজ, দেখি কী দেবে দাম সপ্তাহান্তিক অপেক্ষার...

আরোগ্য নিকেতন

তোমরা কি সবাই তবে রোদচশমাই পরে ছিলে?
দ্যাখোনি, কেমন রোদ উঠেছিল, মারাত্মক নীল!

না-ই দেখলে, থাক, ভালো।
...সেই এক উলটোপালটা লোক
বলেছিলঃ আয়, হোক জ্বর, হোক দারুণ অসুখ—

তুই আমি, একসঙ্গে, রাতে, হাসপাতালের বেডে
স্রেফ ঐ রোদ লেগে মরে যাব বিনাচিকিৎসায়।

অভিযাত্রিক

কত গভীরে পৌঁছতে পারো
কত দূরে তোমার ফুসফুস
এস, এই মরণান্ত পথ
পেতে আছি, পথিক পুরুষ!

আমার অতল তল থেকে
ব্রহ্মতালু ফেটে যাচ্ছে পথে
চলে এস, এই অন্তরাল
জোগাড় করেছি কোনওমতে

সীমাহীন কাঁধপিঠ থেকে
উঠে আসে রাশিরাশি তারা
কী প্রবল অভিকর্ষটানে
কেন্দ্রমুখে নামে অগ্নিধারা

ফুলকি লেগে পাপড়ি লেলিহান
হৃৎকমলে মহাসমারোহ
এস, পথে নামো, দুঃসাহস
কোনওমতে করেছি সংগ্রহ

পরবাস

শেষ বন্ধু ট্যাক্সি ধরে চলে গেল।
আমি শুধু তোমাকে খুঁজেছি,
যে-তুমি আমাকে ভালোবাসো।

লালহলুদ আলোজ্বলা শহরের রাস্তায় রাস্তায়
আমি দুঃখ পাচ্ছি দেখে
যে-তুমি বাড়িয়ে দিতে হাত

অথচ, ঘটনা এই, সে তুমিও এ শহরে নেই।
যে বন্ধুটি ট্যাক্সি ধরে চলে গেল
তুমি তার অনেক আগেই
পিঠে ভারী ব্যাগ বেঁধে উঠে গেছ পশ্চিমের ট্রেনে

শেষ বন্ধু চলে গেলে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবি
দেবো দেবো করে যেন কী একটা ভরিনি ওই ব্যাগে,
কী সেটা? চিরুনি? উঁহু, টুথব্রাশ? আকাশি মাফলার?
নাকি সেই ছেঁড়া চিঠিগুলো...

চিন্তার জটিল সুতো টুকরো টুকরো করে দিয়ে
গড়িয়ার মিনিবাস গা ঘেঁষে দাঁড়াল, বলল—
এই সবে সন্ধেরাত্রি,
এখনই কি দুঃখ পেলে চলে!

শুভেচ্ছা

আমার তো এরকম অনেক কিছুই মনে আছে:
কায়দা নেই বিন্দুমাত্র। তবু সপ্রতিভ, কী যে ভালো!
ব্যথিত প্রেমের কবি কবিতা হাতে মঞ্চে দাঁড়াল।
বৃষ্টি এল। আলো ধরল সবুজ মেঘের গাছে গাছে।

মনে আছে বইটাতে দাদা লিখে পরে কেটে দেয়া।
যদিও আবদারে পড়ে, তবু হাসি, অনাবিল হাসি
লেগে ছিল ওষ্ঠকোণে। সে কোন্ স্মৃতিতে পরবাসী?
স্মৃতির ভরোসা লাগি দ্বীপান্তরে পাড়ি দিল খেয়া...

সেই দ্বীপে রেলপথ। শুক্রবারে টিউশনি নেই।
সেদিন শহরে আসা। দেখা হতে পারে, না-ও পারে।
বন্ধুত্ব দুর্লভ বস্তু, মেলেনি নগদে কিংবা ধারে।
শূন্য হাত। শেষ ট্রেন। ফিরে যাচ্ছ পুরনো দ্বীপেই

কোথা থেকে ফিরে যাওয়া? কোথায় তোমার ঘর বাড়ি?
সেখানে রাগে না কেউ কক্ষনো, সকলে ভালোবাসে?
মাঝেমধ্যে দেখা হলে কেবলই তোমার মনে আসে—
আমি রেগে উঠতে পারি। শুধু সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি

লিখে দিলে: শুভেচ্ছা নাও...

ঘর

ঘর বলতে ছায়ায় ঘেরা বাড়ি
দুয়োর খুলে উঠোনে পা পড়ে
ঘর বলতে ফিরব তাড়াতাড়ি
ঘর বলতে তোমায় মনে পড়ে

ঘর বলতে মাঠের পরে মাঠ
আলের ধারে রোদ মেলেছে পা
দিঘির কোলে ভাঙা শানের ঘাট
ভাত রেঁধেছি, নাইতে যাবে না?

ঘর বলতে সন্ধে নেমে এলে
পিদিম জ্বেলে বসব পাশাপাশি

নিঝুম পাড়া, আটটা বেজে গেলে
দূরের থেকে শুনব রেলের বাঁশি

ঘর বলতে সমস্ত রাত ধরে
ঘুমের চেয়েও নিবিড় ভালোবাসা
ঘর বলতে তোমার দু'চোখ ভরে
স্বপ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসা

ঘর বলতে এসব খুঁটিনাটি
ঘর বলতে আকাশ থেকে ভূমি
একদিকে পথ, বিষম হাঁটাহাঁটি
পথের শেষে, ঘর বলতে—তুমি।

পুণ্যিপুকুর

মনের নীচে মনখারাপের বিষ
গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছে অহর্নিশ
খুঁড়তে খুঁড়তে শেষে

অতল থেকে উপচে এল জল
বুকের মধ্যে পুকুর টলোমল
মনখারাপের দেশে

নিস্তরঙ্গ পুকুর শুয়ে আছে
কে জানত তার গভীর জলে নাচে
একটুখানি স্রোত

চোরা স্রোতের তিরতিরানো টানে
কখন এসে ভিড়েছে সেইখানে
সওদাগরের পোত

হীরেমোতির ভিন্‌দেশি জাহাজ
কোথায় তাকে ভাসতে দেবে আজ
পুকুর দিশেহারা

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হলো কী যে
নিজেকে সে ছাপিয়ে গেল নিজে
উপচিয়ে কিনারা

পুকুর হলো অগাধ সমুদ্দুর
ভাসল জাহাজ অনেকখানি দূর
গোপনে গোপনে

রইল পড়ে মনখারাপের দেশ
জাহাজখানি হলো নিরুদ্দেশ
সমুদ্দুরের মনে...

রোগ

সারাদিন ধরে শুধু ফোনের পাশেই বসে থাকি।
আমার অসুস্থ টেলিফোন
থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। ককিয়ে ওঠা আর্তচিৎকার
শুনি, কিন্তু কিছুই করি না।
কেঁদে কেঁদে শেষমেশ ঘুম নেমে আসে টেলিফোনে।
আর সে কাঁদে না দেখে ভয়ভয় করে। ছুঁয়ে দেখি।
অজান্তেই তুলে নিই রোগাভোগা রিসিভার-বাহু।
নম্বর ডায়াল করি।
ওপারে বিষণ্ণ গলা হ্যালো বলে। আমি শুধু শুনি।
আমি কি তখনও বুঝতে পারিনি যে বাকি আছে প্রাণ!

টেলিফোন ঘুম ভেঙে, জ্বর গায়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে
ঠাসঝনাৎ শব্দ করে চড় মারে আমার বাঁ কানে।

অবরোধ

তুই বসে থাক জানলার গ্রিলে পিঠ দিয়ে
আমি বসে থাকি এপাশে
দেখতে পাচ্ছি আঁধার উঠেছে ঠিকরিয়ে
বারান্দা থেকে আকাশে

কোনও কথা নেই। শুধু যেন সেই কথাদের
ছায়া পড়ে গেছে উঠোনে
শরীরের চেয়ে দীর্ঘতর সে ছায়া ঢের
তবু, মিল আছে গঠনে

ভেঙে পড়ছিল প্রতীক্ষাময় নিঃশ্বাস
চুপ করে ছিল ইচ্ছে
ভেতরে ভেতরে পিষ্ট সাধের নির্যাস
আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে

মনে হয়েছিল তোর কাছে এলে দিন রাত
ভাঙা যেতে পারে সহজে
ভাবিনি তোমার জানলা-গ্রিলের ইস্পাত
এতখানি ঘাতসহ যে!

সব ভেঙে পড়া প্রতিহত হলো ওখানেই
ফিরে যেতে যেতে জানলাম—
যত চাও শুধু প্রতীক্ষা আছে, দেখা নেই
ওই জাদুকরী জানলায়...

এ সবই রাতের চিহ্ন

চিহ্ন লুকাব না বলে তোর বাড়ি এসেছি সকালে।
সমস্ত না-হওয়া ঘুম জল হয়ে ঝরে পড়েছিল
কাল সারারাত ধরে। সেই জল শুকোবার আগে
ভোরের শিশিরে ভেজা এই ট্রেন, কান্নাভেজা ট্রেন
আমাকে পৌঁছিয়ে গেল তোর সদ্য ঘুমভাঙা চোখে

বাগানের দরজা খুলে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছিস তুই
আর আমি এসে বলছি: এই নে আমার বাসিমুখ,
এই উস্কোখুস্কো চুল, এই অগোছালো শাড়িজামা—
এ সবই রাতের চিহ্ন, বিনিদ্র ও তুমিহীন রাত,
চিহ্ন লুকাব না বলে তোর কাছে এসেছি সকালে

এসে দেখি, তুইও পেতে রেখেছিস দুঃখচিহ্ন তোর

বোধহয়, এ চিহ্নদুটি মিলে যেতে পারে আজ রাতে..

অনুষঙ্গ

আজ মনে হলো আমি বহুদিন বিকেল দেখিনি
কী জানি কেমন আছে তার সেই পুরনো অসুখ
আজও কি সে চারপাশে অযত্নে ছড়িয়ে রাখে রোদ?
এক আকাশ মেঘ লিখে পরক্ষণে ছিঁড়ে ফেলে দেয়?

অথবা, সে বদলে গেছে। হতে পারে সে এখন একা
আমি তো দুপুর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আঁধারে নেমেছি
আর সে কি হেলে আসা ছায়া নিয়ে দূরে সরে গেছে?
সে কথাটি জানব বলে টোকা মারছি পশ্চিম আকাশে

দরজাটা ভেজানো ছিল। খুলে গেল আলতো ধাক্কা দিতে
ঘরে ঢুকে দেখি—এ কী! চতুর্দিকে রাশিরাশি মেঘ

আলো ভারি কম, আর সে আলোতে লেখা পড়বে বলে
বিকেলের চোখে চশমা,

অন্য সব কিছু...একই আছে...

দুখজাগানিয়া

কখন ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিশিমন!
ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ঝড় লেগে গেছে নিমডালে
ঝড়ের এদিক নেই, ঝড়ের ওদিকও নেই বলে
অনায়াসে লাফ দিল, এ কেমন আলুথালু বলো!
ঝাঁপ দিয়ে এল ঝড়, কাঁপ দিয়ে এল নিমডালে

কখন ভোরের দিকে সুখ লেগে ঘুমিয়ে পড়েছি
ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সুখ নিয়ে চলে যাচ্ছে হাওয়া
বঙ্গোপসাগর থেকে পাহাড়তলির দিকে ভেসে...

উত্তরায়ণ

তোমার আমার মধ্যে একমাত্র দূরত্ব, — সময়।
আবার কুড়িয়ে পাব তোমাকেই, দৈব দ্বিপ্রহরে
যখন আমারই জন্য অপেক্ষায়, রিক্ত পথে পথে
ঝরে থাকবে তুমি, আর তোমার পরাগধানী থেকে
স্বেদগন্ধ নিতে গিয়ে হলুদ কলঙ্ক লেগে যাবে
আমার বে-আব্রু মুখে।

লেগে যাক। তবু গন্ধ নেব।
আমার মরণঋতু ঘুরে আসবে পুরনো বাতাসে
তোমার ঝরার সেই উষ্ণ দিন, দীর্ঘ সূর্যালোক
ফিরে আসবে ধুলোপথে। ফিরে দেখা হবে, মনোরম

তোমার আমার মধ্যে দূরত্ব তো কেবলই সময়!

অস্তমেঘ

পুরনো প্রেমের মতো এই মুহূর্তটি
বেদনা গোপন করে, সত্যি হতে হতে, থেমে গেছে।

সূর্য ডুবে গেছে তাই খাদ বেয়ে উঠে আসছে শীত,
আকাশে এখনও মায়া,
আরক্ত স্মৃতির মতো মেঘ,
সবকিছু শেষ, তবু আজও ফিরছি ... অনিঃশেষ ফেরা ...

পুরনো প্রেমের মতো এই সূর্যডুবি

কী জানি,
কাকে যে মনে পড়ে ...

উজান

নয়ন, এক নৌকো।
ওরই মধ্যে এক ফোঁটা জল
দুলতে দুলতে এপার থেকে ওপার।

ওইপারে সে নেইকো,
থাকার মধ্যে বালিই কেবল ;
বালির নীচে কান্নাটুকু চাপার

গল্প জানে ক'জন!
ছইয়ের তলে লণ্ঠন জ্বলে,
ভাঙছে আলো চোখের পাতার দাঁড়ে

ও মাঝি! ও সুজন!
কেমন করে ঝড়বাদলে
জল ভিড়াবি নাও দু'খানির পাড়ে?

কাঞ্চনজঙ্ঘা

পাতালে প্রোথিত চূড়া, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নামে সিঁড়ি
কাঞ্চনজঙ্ঘাও ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি
ভিতরে অগ্নিবীজ, ভিতরে ধাতব লাভাখনি
শীতঘুমে কাদা ছিল, তাকে তুমি ডেকেছ যখনি
তখনি শিয়রে তার পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া
কাঞ্চনজঙ্ঘাতে এই অভিযাত্রিক ছোঁয়া
কখনও লাগেনি আগে এত নীচে এমন গভীরে
শরীরে বরফ দ্যাখো, সব গলে যাবে ধীরে ধীরে
সাগরও উপচে যাবে, এত জল রাখব কোথায়!
জলে যে আগুন লাগে...জ্বলে জ্বলে মেঘ হয়ে যায়...

মেঘেও আগুন দেবো, অগ্নি ঝরাব ঝিরিঝিরি
কাঞ্চনজঙ্ঘা কি সামান্য আগ্নেয়গিরি!

আরণ্যক

হাতে হাতে নদী বইছে, চোখে চোখে উড়ে যাচ্ছে পাখি
মনে মনে বৃষ্টি এল, শরীরে সবুজ মাখামাখি
পায়ে পায়ে পাকদণ্ডী, নখে নখে ঘষা লেগে—ও কী!
দাবানল জ্বলে উঠছে, নখ কি গোপনে চকমকি!

কেমন রহস্য বলো, বৃষ্টি যত জোরে আসছে ঝেঁপে
অগ্নিশিখা তত তীব্র, ঊর্দ্ধপানে উঠছে কেঁপে কেঁপে
অরণ্যে অরণ্যে সেই দহন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত
অথচ আশ্চর্য দ্যাখো—অরণ্য কুসুমে অভিভূত!

আগুনে বৃষ্টিতে আজ মুছে যাচ্ছে সমূহ নিশানা

হাতে হাতে মুগ্ধ ঢেউ, চোখে চোখে দুঃসাহসী ডানা...

শিলালিপি

খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ভালোবাসা শব্দখানি
আধোভাঙা প্রাচীরের গায়
কবে থেকে ফুটে আছে? সভ্যতার আদিম কুসুম
স্রোতে ভেসে গেছে কত ভাঙা ধ্বনি, আহা, পাপড়িগুলি—
কূলপ্লাবী রক্ত কিছু শুষে নিল ধ্বংসস্তূপ
বাকিটুকু বাষ্পীভূত ... ধোঁয়া ...

ধোঁয়ার ভিতর থেকে ভেসে উঠছে অলৌকিক গলি
কালো পাথরের ইট, পয়োনালী, বাতিস্তম্ভ, বাঁক,
শিলালিপি ঝরে পড়ছে পথে পথে
মুঠোমুঠো ভেসে যাচ্ছে গান
খরোষ্ঠী লিপিতে আঁকা সেসব অদ্ভুত আলো
অস্ত যেতে যেতে, দ্যাখো,
শেষমুহূর্তে... ওই...
ওই ফিরিয়েছে দ্বিধান্বিত মুখ—

এ মুহূর্তে লিখে রাখো আরও কিছু প্রেমের কবিতা

অসংলগ্ন

বিকেলের মুখেই সে এল।
ঝাপসা লাগে। বুক ভাঙে। ঐ
দাঁড়ানোর ভঙ্গিটুকু চেনা।

ঠিক চেনা নয়। চেনাচেনা।
এ জীবনে দেখা হয়েছিল।
মনে নেই...কখন... কোথায়...

কথা বলল অচেনা ভাষায়।
স্বর নয়, মনে পড়ল কোনও
শব্দমধ্যবর্তী শ্বাসাঘাত।

তাকে চিনি। শুধু সে বিদ্যুৎ
মনে আনতে পারি না সহসা।
সেই দোষে সেও ফিরে যায়।

চৌকাঠে চিহ্নটি পড়ে থাকে
চেনাচেনা আসা ও যাওয়ার...

ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস

ম্যানিয়া

ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। ফিরে এস চলে গেছ যারা।
সূর্যাস্তের রং দেখে বলতে ইচ্ছে করেঃ দ্যাখো দ্যাখো!
দু'পাশে যাদেরই পাই তাদেরই বিরক্ত করে ফেলি
চুম্বনে চুম্বনে

ইদানিং যেন একটু বেশি...

ডিপ্রেশন

সঙ্গে তেমন কেউ নেই, তাই সাগরে নামিনি।
একা একা বসে আছি সৈকতে, জলের কিনারে।
আমার সঙ্গে কেউ নেই। ওরা জলে নেমে গেছে।
বালিতে পায়ের ছাপ মুছে নিয়ে সরে গেল ফেনা

আমার তেমন কেউ নেই, জল একথা জানে না...

শিমূলতলা, রাত বারোটা

কব্জি ভরে কাটাচিহ্ন আঁকা
আমাকে যেও না রেখে একা হৃদয় ধারালো

শক্ত করে ধরে আছি মুঠো
রক্তমুখী ফিনকি দিয়ে উঠে পাথর সরালো

পাথর কেটেছি ফালাফালা
দু'হাতে পাথুরে নীল জ্বালা আগুন ছোটায়

জীবনে কে কবে কিছু ভোলে
কড়িকাঠে শূন্য শাড়ি দোলে রাত বারোটায়

যুদ্ধকালীন

আমি তাকে ছুঁই আর সে ক্রমশ আলো হয়ে ওঠে
আলো তার দুই ভূর মাঝমধ্যিখানে ঠিকরে পড়ে
নাসাগ্রে গড়িয়ে পড়ে আলো তার ঠোঁটে মাখামাখি
আমি ওই আলো খাই, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খাই
আলো চোখ, আলো নাক, আলো মুখ, আলো জিভ ঠোঁট
আঁধার ট্যাক্সির গর্ভ, রাস্তাঘাট সকলি আঁধার

এত আলো জ্বালিও না
ব্ল্যাক আউট
বোমারুর হানা...

অরাজনৈতিক

আমি যে ছেলেটিকে খুঁজছিলাম
তার বাঁ পায়ে কিছু খুঁত ছিল
ঝুঁকে, পা টেনে টেনে হাঁটত সে
ঈষৎ ভারী, যেন ক্লান্ত শ্বাস

আমি সে আলোটিকে খুঁজছিলাম
যখন আঙিনা সবুজ ছিল
তাকে কী অকাতরে মুছছো রাত!
আলোটি ছিল বড় মুখচোরা...

করেনি এতটুকু আর্তনাদ
সে জানে, ছটফট করতে নেই
ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে এক হাঁটু
অন্য পায়ে, টেনে, ঝুঁকে হাঁটে

সে আলোছেলেটির সন্ধানে
এনেছি একফালি সন্ধ্যা নীল
সে বড় উদাসীন, ঘাড়বেঁকা,
আমাকে চিনে নিতে পারবে কি...

মেরুন

এমন বিদ্যুৎবাহী তার ঐ মেরুন টিশার্ট
ও ছেলের চারপাশে ছটফট ছটফট করে হাওয়া
হাওয়াদের নাম, —এই ধরা যাক: মধুরা, মৃদুলা
কলেজবালিকা, দুই একজন সদ্য মাধ্যমিক...
এমন বসন্তবাহী তার তীব্র ঝাউগন্ধী ঘাম
ও ছেলের চারপাশে ছিটকে ছিটকে ওঠে রং
ওড়না রং, হাসি রং, আঁখিকোণে ইশারার রং
রঙিন, তড়িদাহত ; অপেক্ষায় বাসস্টপ কাঁপে

রোস্তোরাঁ সিনেমাহলে গুনগুন গুঞ্জরিত দিন
শুধু তারই কথা বলে। শুনতে চায়। চিঠি... নিশিফোন—
একবার দেখা হতে পারে, প্লিজ! প্লিজ দেখা করো
মধুরা মৃদুলা আর সুদক্ষিণা, প্রত্যেকে আকুল

আমিও, আমিও সোনা! এ বয়েসে, কী করি কী করি...
তোর সব শয়তানি আমারই কপালে লেখা আছে!

দেহতত্ত্ব

তোমার কথার চেয়ে মোহময় তোমার ফিসফিস
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তুই আমাকে পাগল করেছিস

আশরীর রোমকূপে ঠোঁট রেখে কোন্ মন্ত্র দিবি?
এই ঘরে একটানে খুলে ফেললি গোপন পৃথিবী!

পৃথিবী রহস্যময়, ছোট্ট এই দরজাবন্ধ ঘরে
পর্বত দাঁড়িয়ে ওঠে, চূড়া থেকে নদনদী ঝরে

সমস্ত নতুন চূড়া, সমস্ত নতুন জলরাশি
কতদূর থেকে রোজ তোর সঙ্গে স্নান নিতে আসি!

লবণাক্ত স্নান লেগে স্নানাগারে চলকে ওঠে ফেনা
ফিসফিসিয়ে ফেনা ভাঙে, অন্য কেউ জানতেও পারে না

সমুদ্র-পাতাল থেকে জেগে ওঠে অলৌকিক ক্ষেত
তোমার ডাকের চেয়ে আরও তীব্র তোমার সংকেত

সংকেতে সংকেতে তুই খুলে ফেললি লুকোনো আগল
আদিগন্ত দেহময় চারণের অবাধ অঞ্চল

এমন উধাও মুক্তি গুপ্ত রেখেছিলি কোন্ বীজে?
সমস্ত স্বপ্নেরও চেয়ে আরও স্বপ্নময় তুমি নিজে...

শর্ত

এস, তবে অন্ধ করে দাও!

তোমাকে দেখেছি তাই বেড়ে গেছে আমার অসুখ
বেড়ে গেছে উন্মাদনা, অপরাধপ্রবণতা, নেশা...
নিজেকে ঠেকাতে চেয়ে হাত দিয়ে বেঁধে রাখছি হাত
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চাপছি, তবু দৃষ্টি ফেরাতে পারছি না
তোমাকেই দেখছি আর নখ বিঁধছি নিজের মুঠিতে
মুঠি থেকে রক্ত ঝরছে, রক্ত নয়, আকাঙ্ক্ষার স্রোত
নিম্নগামী ... নিম্নগামী ... বাঁধ তাকে ঠেকাতে পারছে না
উপচে যাচ্ছে আহ্ আমি স্বভাবত যন্ত্রণাপ্রবণ
শাস্তি পেতে ভালোবাসি, আমার দু'চোখে প্রিয় পাপ
শরীর মরিয়া, হিংস্র, সামাজিক মুদ্রাদোষহীন—
এখনই পালাও, নয়তো কাছে এস, পরিত্রাণ করো
একটিবার স্পর্শ করে, স্পর্শ করতে দিয়ে ... ফিরে যাও ...

আমি শান্ত হয়ে যাব, সত্যি বলছি, ফেরার সময়
পুনর্বার আকাঙ্ক্ষায় ঝলসে ওঠা এই ধৃষ্ট চোখ

যদি অন্ধ করে দিয়ে যাও...

মরণোত্তর

হাসি, তীক্ষ্ণ হাসি লেগে কেটে যাচ্ছে আমার শরীর
হাসি বন্ধ করো, প্লিজ। এর চেয়ে ভালো ছিল তীর
ছুরি কাঁচি আরও যা যা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্র আছে
নিয়ে এস, বিঁধে দাও শরীরের আনাচে কানাচে
সহ্য করব, রক্ত দিয়ে ধুয়ে নেব ছেঁড়া ক্ষতস্থান
জানো না, হাসির চেয়ে মারে কত অধিক সম্মান!
মারো, আর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো, সেই ভালো
জোর করে হাসছ, তাই তোমারও সমস্ত মুখ কালো

তার চেয়ে অকপটে ঘৃণা করো, সহ্য করব আমি
পবিত্র ঘৃণাও এই সাজানো ব্যঙ্গের চেয়ে দামি...

হাসি বন্ধ করো, প্লিজ। আমাকে নির্দয় হাতে বাঁধো
বেঁধে মারো। মারতে মারতে মেরে ফ্যালো।
মেরে ফেলে, কাঁদো...

খেলা যখন

—নয় নয় এ মধুর খেলা
কাল তুমি কাছে টানলে, আজ মারছ ঠেলা

নয় এ মধুর খেলা নয়
সুযোগ বুঝেই ঠিক ভুলে যাচ্ছ পুরনো সময়

নয় নয় এ খেলা মধুর
ভালোবাসছ, চুমু খাচ্ছ, ওমা! তারপরই দূর দূর!

— কে বলেছে খেলতে তোকে, যাঃ
পুরনো প্রেমের রুগী, রবীন্দ্রসঙ্গীতসেদ্ধ খা

গীতবিতানের খাঁজে গোঁজা আছে মুখছেঁড়া খাম
ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে, সাক্ষী শুধু হারমোনিয়াম।

সোহাগবালা

আমাকে ততটা নিষ্ঠুর হতে দিও না
যখন তোমার মুখ স্বভাবত ম্রিয়মাণ
কাঁধ ঝাঁকাচ্ছ কেন অভ্যাসবশত
আমি কি জানি না বুকের মধ্যে রসাতল!

বোঝাতে চাইছ যন্ত্রণা নেই কিচ্ছু
অথচ আমিও তোমাকে বোঝাতে ইচ্ছুক
যতখানি ভাবো নই ততখানি শহুরে
যদিও হেলায় উড়িয়ে দিয়েছি বহু প্রেম—

এইবার, তবু এইবার, শুধু এখনই
দ্যাখো, এই মুখে অন্য পথের রেখা নেই
পথে পড়ে আছে রক্তমাংসে গড়া মন
তলে তলে তার শিকড়ে শিকড় জড়ানো

নতজানু হও, ফিরিয়ে নিচ্ছি সব তীর

আমাকে কি তুমি চলে যেতে দেবে সত্যি!

আসঙ্গ

এস, আজ এই বুকে মাথা
রেখে বলো, মনখারাপ কেন
তেমন কারণ আছে? নাকি
মনখারাপ ভালোবাসো বলে?

মনোমতো মনখারাপ জল
ঢেলে দাও কাঁধের ওপরে
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে ধারা
আহা, সে কী মনোরম স্নান!

এস ভিজি, এস ভিজে যাই
পরস্পর দুঃখে রাখি মুখ

শুষে নিই জিভ থেকে জিভে
ভালোবাসা ... মনখারাপ ... সুখ

ভোরাই

তোকে যে কীভাবে চাই নিজেই জানি না
মেরে ফেলতে চাই তোকে আদরে আদরে
স্বপ্ন দেখি তোর উপরে আমি লজ্জাহীনা
কামড়ে খেয়ে ফেলছি তোকে টুকরো টুকরো করে

জানি না কীভাবে কাটে দীর্ঘতম দিন
মনে হয় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি অহরহ
প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষিত, কামনারঙিন
মিলনে পুষিয়ে নিচ্ছি প্রতিটি বিরহ!

শরীর ফুরিয়ে আসে মহোৎসব শেষে
শব্দহীন হয়ে আসে মুখর চেতনা
স্পর্শ ডুবে যেতে চায় স্খলিত আবেশে
তোর সঙ্গে ছাড়া এত ঘুমোনো যেত না ...

ঘুম ভেঙে তোকে দেখি তন্দ্রামুগ্ধ ভোরে
ভালোবাসতে ইচ্ছে করে আরও সত্যি করে ...

পাহাড়ি

পাহাড়ের মাথায় ছিল মস্ত একটা খোঁপা
কী ভেবে সেই খোঁপা সে আলতো হাতে খুলে
দু'দিকে ছড়িয়ে দিল এপার থেকে ওপার
বুকপিঠ জড়িয়ে গেল ঢেউখেলানো চুলে

সে চুলের একটি গুছি আঁকড়ে নিয়ে উঠি
আমি আর আমরা সবাই দুঃসাহসী জিপে
এলোকেশী ঐ রূপসীর সবুজ নয়নদুটি
ইশারায় সূর্য জ্বালায় ভ্রূবিলাসী টিপে

টিপ থেকে পড়ছে ঝরে সিঁদুর গুঁড়ো গুঁড়ো
ও মেয়ে পরস্ত্রী, তাই লুকোচুরির প্রেমে
আগুনে জ্বালিয়ে দিল ঢেউপাহাড়ি চুড়ো
লুটোনো চুল বেয়ে তার হলকা এল নেমে

সে মেয়ে বাছবে কাকে, পুড়তে পুড়তে ভাবি
আপাতত আমরা সবাই পতঙ্গস্বভাবী...

ফেরারি ফাল্গুন

দুয়ারে দাঁড়িয়ে শালবন, অন্ধকার, একলা চুপচাপ
বুকে টেনে নিতে তার মুখ, ইচ্ছে হয়, কিন্তু এই পাপ
কীভাবে লুকাবে রাত্তির! মঞ্জরীর তীব্র গন্ধেই
পড়ে যেতে পারে শোরগোল, জঙ্গলের আজ তো হুঁশ নেই
সে ছেড়ে এসেছে তার ঘর। ঘর কোথায়! তুই যে শালবন
ফেলে এলি পাহাড়ের ঢাল, পূর্ণিমার রাত্রি নির্জন
সে শুধু আমাকে চাস তাই? হায় কপাল, তুই কি উন্মাদ?
তবে কেন এত নিশ্চুপ? বল্ আমায়, তোর কীসের সাধ
কতদূরে যেতে চাস বল্। এই নে হাত, ধরতে চাস ধর—

পালিয়ে এসেছে শালবন। ওর সাথেই ছাড়ছি আজ ঘর ...

বেনোজল ও একটি মাটি

বেনোজল ঢুকছে ঘরে
পলিতে সবুজ ঢালো

সারাদিন মাঠের সাথে
এত সুখ পায়নি মাটি

বুকে ওর জমছে পলি
ও জমি দিনফসলি

বেনোজল প্রেম করেছে
শ্রাবণে, কি জলসেচে

পলিতে বীজ পড়েনি
ওরা তার ফসল তোলে

মাটি তুই মরলি কেন
বেনোজল ফিরবে ঘরে

বেনোজল বাঁধ ভেঙেছে
পলিতে শহর গড়ো

সংসারে সুখ বসেনি
বেনোজল দুঃখশিলা

চোরাসুখ লতিয়ে ওঠে
ওরা তার শরীর লোটে

মাটি তুই সর্বনাশী
ঘরে কি তুলবে চাষি?

শরীরে জমছে পলি
শহরে আদিম গলি

কী কঠিন অপেক্ষা তোর
ভাসাবে আসছে বছর

ঝড়ের রাতে

তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে আছি বলে
রাত্রি শান্ত মনে হয়েছিল।

ঝড় কিন্তু এসেছিল ঠিক। আক্রমণ করেছিল পাড়া।
এমনকী, পশ্চিমের শার্সি ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে
সামনে পেয়ে গেছিল তোমাকে।

হ্যাঁ, শুধু তুমিই ছিলে, অন্তত, ঝড় তো তাই জানে...

লুকিয়ে ছিলাম আমি তোমার বুকের মধ্যে, ঘুমে,
কখন ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছ একা
আমি কিচ্ছু টের পাইনি

...অথচ... তোমারই মধ্যে...

সুইসাইড পয়েন্ট

শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শুনে
হঠাৎ চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি
বিকেল কেমন সরে গেল দ্রুত পায়ে
খাদের কিনারে, যেন নীচে ঝাঁপ দেবে

আমি পড়িমরি ছুটি বাধা দেবো বলে,
পারি না। কেবল অসহায় আফশোসে
খাদের কিনারে ঝুঁকে পড়ে দেখি—ঐ...
নীচে বহু নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে আলো

ঝরা পাতারাও কুয়াশায় ভিজে গেছে

সন্ধে নামছে দীর্ঘশ্বাসের মতো

উচাটন

দ্যাখো, আজ এই যে অনেকদিন পর এমন মেঘ করল,
হাওয়া দিল পাগল পাগল,
মাটির ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল
অদ্ভুত সোঁদা গন্ধটা...
তাও কেন তোমার মনে পড়ল না গো, আমার কথা?

এই যে বৃষ্টি নামল,
ওই যে পশ্চিমের মাঠ উঠল ধোঁয়া হয়ে জলের ঝাপটায়,
আকাশ কাঁপিয়ে দিল বাজ,
তুমি বুঝি এখনও বুঝলে না,
এ আয়োজন কীসের জন্য?

দ্যাখো, বৃষ্টি বেড়েই চলেছে
বান ডাকবে, বান ডাকবে সোনা!
আমিও যদি আরও একটু কষ্ট পেতে পারি,
আরও আরও আরও একটু ভয়...

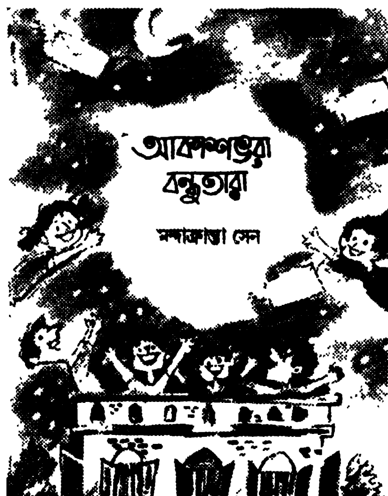
ততদিনে, ততদিনে নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে যাবে...

বিভাব

এভাবে হবে না বলছ? কোন্ ভাবে হতে পারে তবে?
আমি কথা বলে যাব, আর তুমি নিতান্ত নীরবে
কোথাও তাকিয়ে থাকবে, হয়তো কোনও আকাশের দিকে
তুমি জানো রৌদ্রভাষা, তুমি জানো কীভাবে বৃষ্টিকে
আবাহন করতে হয়... সে সমস্ত অপার্থিব স্বর
তোমার মুখস্থ, জানি। জানি বন্ধু। তাই পরস্পর
এত কথা বলে যাচ্ছ অনর্গল, শব্দ ব্যতিরেকে
আলাপ জমিয়ে তুলছ আমাকে একাকী ফেলে রেখে

আমি ভাবছি শেষ কবে ডেকেছিলে তোমার উৎসবে

ভাবতে ভাবতে কান্না এল।
তুমি বললে, এভাবেই হবে...



আকাশভরা বন্ধুতারা

ছড়ায় গাঁথা যে সব পাতা

নেমন্তন্নের চিঠি

তোমাদের হাতে দিই একমুঠো ছড়া,
কিছু তার মিঠে আর কিছু তার কড়া।

ভারি খুশি হব যদি নাও হাত পেতে,
চুষে ও চিবিয়ে দ্যাখো কীরকম খেতে!

মন দিয়ে খাও যার যেরকম শখ—
মিষ্টি বা ঝালঝাল, মোন্‌তা বা টক।

ভালো যদি লাগে তবে চেয়ে নিও আরও
যত খুশি এনে দেবো, যত খেতে পারো।

সবশেষে ভালোবেসে হেসো খিলখিল
শেষপাতে তা-ই সেরা ছন্দ ও মিল!

আকাশভরা বন্ধুতারা

আকাশ জুড়ে তারার বসতবাড়ি,
ক'জন তারা তোমার ছাদে নামে?
তারার নামে ইচ্ছে-চিঠি লিখে
পাঠিয়েছিলে, স্বপ্ন-রঙা খামে?

ঠিকঠিকানা ভুল কোরো না যেন,
আলোকবর্ষ বড্ড দূরের পাড়ি।
মাটির চিঠি তারার ঘরে দিতে
মেঘ-পিওনও যায় না তারার বাড়ি।

বৃষ্টি দিয়ে ইচ্ছে-চিঠি লিখে
খামটা দিও শিশির দিয়ে জুড়ে,
তবেই দেখো, তোমার চিঠিখানা
তারার দেশে পৌঁছে যাবে উড়ে।

ডাকটিকিটে ঝামেলা নেই কোনও
যোলোকলার চাঁদকে রেখো কেটে,
কাছেপিঠে কাস্তেচাঁদেই চলে,
নইলে দিও পূর্ণিমাচাঁদ সেঁটে।

যে তারাকে তোমার ভালো লাগে,
তাকেই তুমি জানিয়ে দিও লিখে—
একে একে আপন করে নিও
আকাশজোড়া তারার বসতিকে।

তোমার লেখা ভালোবাসার কথা
পৌঁছে যখন যাবে তাদের কাছে,
অবাক হয়ে ভাববে সকল তারা—
মাটির দেশেও তাদের বন্ধু আছে!

সবাই মিলে আকাশ থেকে ঝুঁকে
খুঁজবে তারা তোমার বাড়িখানা।

কাজেই, তুমি খামের উলটোদিকে
লিখে দিও তোমার নাম-ঠিকানা।

ইচ্ছে-চিঠির তলায় ছোট্ট করে
ওদের তুমি আসতে বলে দিও,
হয়তো কবে তোমার ছাদেই হবে
হরেক তারার জমাট আড্ডাটিও!

আর কখনও লাগবে না তো একা,
আকাশভরা তোমার সঙ্গীসাথী—
দূরের, তবু সন্ধেবেলা হলে
দেখতে পাবে তাদের ঘরের বাতি।

ভাববে, তুমি ইচ্ছে করেছিলে,
তাই তো ওরা তোমার ছাদে নামে ;
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন-খেয়ায় চেপে
ঘুরিয়ে আনে ওদের শহর-গ্রামে!

রাত্রে যদি ঘুম না নামে চোখে,
আকাশ খুলে দিও বাইরে এসে।
পছন্দসই হাসিমুখের আলো
তোমার মুখে ঝরবে ভালোবেসে।

তারারা খুব বন্ধু ভালোবাসে,
বন্ধু ছেড়ে যায় না কোনওখানে।
বড় হয়েও আকাশ দ্যাখো যদি,
বুঝবে তখন এই কথাটার মানে।

ভোর

সুয্যিকে ডাক দেয় ভোর,
বলে : কাজ শুরু কর তোর—
ঘুম থেকে ওঠ্ তাড়াতাড়ি।

সুয্যি অম্‌নি উঠে পড়ে
আকাশের গামলাটা ভ'রে
রোদ ঢেলে দেয় বাড়ি বাড়ি।

বাড়িতে যেসব লোক থাকে,
রোদ্দুর তাদেরকে ডাকে,
ঘরে ঘরে পড়ে যায় সাড়া—

গত রাত্রির ঘুম ভুলে
দরজা জানলা সব খুলে
জেগে ওঠে মানুষের পাড়া।

ফুলছুটি

চেঁচিয়ে বলল গন্ধরাজ—
'আজ আমাদের ধর্মঘট,
ফুল ফোটানো বন্ধ আজ।'

হাই তুলে তাই বলল জুঁই—
'আজ তো তবে ছুটির দিন,
তাহলে আর-একটু শুই?'

পাশ ফিরে শোয় কামিনী
বলে,—'আমি আগেই জানি,
খাট থেকে তাই নামিনি!'

ছুটির মেজাজ, তাই কদম
সবার জন্যে রান্নাঘরে
রাঁধছে লুচি-আলুরদম।

বকুলতলার বড়দা

বকুলতলার বড়দা
জলের দরে আনল কিনে
খানপনেরো পর্দা।

তাই দেখে তার ছোড়দি
বললে : আমি শিগ্রি করে
এক্ষুনি সব দোর দি'।

জানলা করি বন্ধ,
পর্দাগুলোয় বাপ্‌রে এ কী
বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ!

একটা খুলে ধরতে,
দেখল সবাই ভর্তি সেটা
ছোট্ট ছোট্ট গর্তে।

ছোড়দি বলে : ভাইরে,
দরজা জানলা এম্‌নি থাকুক
ফ্যাল ওগুলো বাইরে।

বড়দা ভেবেই পায় না,
পর্দাগুলো কিনল পেয়ে
মাসপয়লার মায়না—

হোক না দারুণ সস্তায়,
খানপনেরো পড়েই ছিল
দোকানঘরের বস্তায়।

হয়নি তখন হুঁশটি,
দ্যাখেইনি ওর মধ্যে ছিল
নেংটি-ইঁদুর-গুষ্টি!

নকল সায়েব

শোনো শোনো সবাই, একটা মজার কথা শোনো—
ব্যাপারখানা রহস্যময়, সন্দেহ নেই কোনো!

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকল ছেলেমেয়ে
হঠাৎ এমন ক্ষেপলো কেন সায়েব হতে চেয়ে?

বাঙালি বাপ-মায়ের শিশু, যখন গেল স্কুলে
অন্য ভাষার চাপে নিজের ভাষাই গেল ভুলে!

ইংরিজি আর হিন্দি জানে, জানে না কেউ বাংলা—
শিক্ষিত কি বলে এদের? এদের বলে হ্যাংলা।

অন্য লোকের নকল করে, নকল করেই ধন্য,
আমাদের তো লজ্জা পাওয়া উচিত ওদের জন্য।

এই ভাষাতেই রবি ঠাকুর লেখেন গীতাঞ্জলি,
নোবেল পাওয়া সেই ভাষাতেই আমরা কথা বলি।

এমন বিরাট মর্যাদা আর ক'টা ভাষার আছে?
আমরা কেন বিকিয়ে যাব অন্য ভাষার কাছে!

তাই তো বলি, আপত্তি নেই অন্য ভাষা শিখতে,
আপত্তি নেই হিন্দি বলায়, ইংরিজিতে লিখতে,—

কিন্তু যারা নিজের ভাষা বাংলা গেছে ভুলে,
তোমরা তাদের কানটি দিও আচ্ছা করে মুলে।

রৌদ্র-সওয়ার

বিকেলে কোণের ঘরে
দেখেছি জানলা খুলে,
রাঙা রোদ কেমন করে
এসেছে রাস্তা ভুলে!

মনে হয় জানলা বেয়ে
নেমেছে আলোর নদী,
ঘরে খুব আঁধার ছেয়ে—
শুধু ঐ একলা রোদ-ই

ঝাঁপ দেয় ঘরের মাঝে
যেন কোন্ দুঃসাহসে,
আলোকেই এমন সাজে,
সাহসেই অদম্য সে।

যেন সে আরবী ঘোড়া,
ধরো সে পক্ষিরাজ-ই,—
সারা গা সোনায় মোড়া,
ছুটেছে বে-আন্দাজি।

আমারও ইচ্ছে করে
অমনই দস্যি হওয়ার,
জনহীন তেপান্তরে
আমি এক রৌদ্র-সওয়ার!

শারদীয়া

বর্ষাশেষে উঠল বেজে দুর্গাপুজোর ঢাক,
বাদলা মেঘের জানলাখানি হঠাৎ হলো ফাঁক।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে
দূর আকাশের বুক ছাড়িয়ে
মাটির দেশে কে পাঠাল মহোৎসবের ডাক!

ডাক দিয়েছে মেঘভাঙা রোদ, চোখধাঁধানো আলো
খুশির আলোয় যাক ধুয়ে যাক মনখারাপের কালো
শিউলিতলায় সবুজ ঘাসে
রোদ ঝরেছে ফুলের পাশে
শিউলিকে রোদ বলল ডেকে — 'তুই না, ভীষণ ভালো!'

ভোরের দোয়েল

ভোরের দোয়েল দিল শিস—
'তুই কি আমাকে ডেকেছিস?'

আসলে তো সে-ই দেয় ডাক
ভাবে, তার ডাক পৌঁছাক

ঘুমন্তদের কানে ঠিক,
কেননা তখন পুবদিক

ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে
আঁধারে আলোক ফুটছে

দোয়েল পাখির শিসটি
লাগছে কেমন মিষ্টি

দোয়েল, তুই না ডাকলে,
আমিও ঘুমিয়ে থাকলে

দেখতাম না তো এই ভোর,
শুনতাম না তো গান তোর!

বাতাস বইছে ঝিরঝির
পুকুরের ঢেউ তিরতির

গাছে গাছে ফুল ফুটল,
মৌমাছিরাও জুটল

আকাশে মেঘের নকশা
রঙে রঙে হলো একশা!

নতুন দিনের পার্বণ—
নাচতে না চায় কার মন?

দোয়েল, কী করে আর শুই,
আমাকে যে ডেকেছিস তুই!

সুয্যিদেবের খুকি

টুকি!
এই বলে কে গাছগাছালির
আড়ালে দেয় উঁকি?
সবুজরঙা ঘাসের বনে
ফুটল কখন সঙ্গোপনে
সোনার বরণ পাপড়ি মেলে
হলুদ সূর্যমুখি!

টুকি!
কার সাথে সে সারাটা দিন
খেলছে লুকোলুকি?
তক্ষুনি ঐ আকাশ থেকে
তার মুখে রোদ পড়ল বেঁকে,
খিলখিলিয়ে উঠল হেসে
সুয্যিদেবের খুকি।

সাধাসাধি

লালগোলা বাড়ি তার
লালমণি নাম,
সম্বল শুধু এক
হারমোনিয়াম।

শখ আছে ষোলো আনা
গায়ক হবার,
রেডিও টিভিতে ঘুরে
এসেছে ক'বার।

সুযোগ জোটেনি কোনও,
সহজে কি জোটে?
তার ওপর, গলাতে যে
সুর নেই মোটে!

লালমণি নয় তাতে
দমবার লোক,
গায়ক হতেই হবে
যে করেই হোক।

শুরু হলো দিনরাত
দারুণ রেওয়াজ,
বাপ্‌রে কী ভয়ানক
গলার আওয়াজ!

কাক চিল যত ছিল
যে বাড়ির ছাদে,
সবাই পালিয়ে গেল
মুর্শিদাবাদে।

তাই বলে সাধনায়
নেই তার ফাঁকি,
এই শুধু গলাতেই
সুর আসা বাকি!

যত লোকে গান শেখে
এই ধরাধামে,
সকলেই গলা সাধে
হারমোনিয়ামে।

কিন্তু কী মুশকিল,
লালমণি রায়
হারমোনিয়াম সাধে,
গলাটি বাজায়!

সজনেগাছ ও টুনটুনি

গাছের মধ্যে সজ্জন কে? খোঁজ নে।
কেন, ঘরের পাশেই আছে সজনে!

ঝিরঝিরে যার পাতায় নাচের ছন্দ,
এমন গাছের মনটা কি হয় মন্দ?

একটু সরল একটু লাজুক ভঙ্গি,
টুনটুনি তার মনের মতোন সঙ্গী।

মগডালে তাই উঁচিয়ে তুলে পুচ্ছ,
টুনটুনি খায় সজনেফুলের গুচ্ছ!

বৃষ্টিদিন

*

একটু আগেই আকাশখানা ভাসতেছিল রোদ্দুরে
হঠাৎ দেখি একটুখানি মেঘ জমেছে কদ্দুরে
ঈশানকোণের মেঘ থেকে
সারা আকাশ যায় ঢেকে
বৃষ্টি-ঘোড়া ছুটিয়ে ক্ষ্যাপা শ্রাবণ এল ভাদ্দুরে!

*

কেমনতরো দস্যি বলো, সন্ধেবেলা দুই বোনে
ফন্দি করে লুকিয়ে ছিল পুকুরপাড়ের ওই বনে
বাঁশবাগানের আবছায়ায়
ফিরছে পথিক ব্যস্ত পা'য়
ঘরমুখোদের ভিজিয়ে দিল দুষ্টু আষাঢ়-শ্রাবণে।

*

বৃষ্টি মানে রাজকুমারীর মেঘমহলা বাড়ি
বারান্দাতে শুকোচ্ছে তার মেঘলা-রঙা শাড়ি
শাড়ি তো আর শুকোয় না
কন্যাও রাগ লুকোয় না
সুয্যিদেবের সঙ্গে মেয়ের চিরকালের আড়ি।

সুয্যি আর বুবলু

বুবলুসোনা ছোট্ট ছেলে
সারাটা দিন বেড়ান খেলে,
শেষে—

সন্ধেবেলা আঁধার হলে
বসেন এসে মায়ের কোলে
হেসে।

কানে কানে বলেন মা-কে
—সুয্যিমামা কোথায় থাকে,
মাগো?

পুবের ঘরের জানলা ধরে
বললে আমায় আজকে ভোরে
—জাগো!

আবার দেখি বিকেলবেলা
পণ্ড করে সকল খেলা-
ধুলো

ডুব দিল সে নদীর জলে,
সুয্যি বুঝি জলের তলে
শুলো?

মামণি তার চিবুক ধরে
আদর করে বলেন—ওরে
বোকা,

মেঘ-পেরোনো দূরের গাঁয়ের
সুয্যিমামা আকাশ-মায়ের
খোকা।

সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায়
তোর মতো সে খেলে বেড়ায়,
তাই

সন্ধে হলে তারও কোনো
ঠাণ্ডা জলে গা জুড়োনো
চাই।

তারপরে তো মায়ের কাছে
গল্প শোনা বাকিই আছে
ঢের—

শুনতে শুনতে খাবার খাওয়া
খেতে খেতেই ঘুমিয়ে যাওয়া
ফের!

তুইও এবার পেটটি ভরে
মায়ের পাশে কোণের ঘরে
ঘুমো,

খাইয়ে দিয়ে ভাত ক'খানি
মাথায় দিলাম ঘুমপাড়ানি
চুমো।

আরশোলা-পর্ব

বাপ্পাবাবুর হাতে কী দারুণ টিপ রে,
দু'আঙুলে টিপে মারে তিনখানা পিঁপড়ে!

কতবার এক চড়ে মেরেছে সে মশাকে,
বীরের মেডেলগুলো আঁটা তাই পোশাকে।

আজকেও বেধেছিল হৈ চৈ যুদ্ধ—
একদিকে আরশোলা দলবলসুদ্ধ

সে একা আরেকদিকে, —মহাবীর বাপ্পা
লড়তে লড়তে শেষে খেয়ে গেল ধাপ্পা

আরশোলা ওড়ে নাকি? এ কথা কে জানত!
বিমানহানায় শেষে যাবে তার প্রাণ তো!

ঘাড়ে উঠে চড়ে বসে আরশোলা-সকলে,
মাথাটিও গেল হায় শত্রুর দখলে।

ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে মহাবীর দৌড়ায়
ছুটতে ছুটতে এক কৌশল ঠাউরায়—

একটানে জামা খুলে ঢেকে নেয় মাথাটি,
বহুদূর চলে এসে তারপরে হঠাৎ-ই

পিছনে তাকিয়ে দ্যাখে কেউ নেই কোত্থাও,
তাড়া করছে না কোনও আরশোলা-যোদ্ধাও।

জামাখানা গায়ে দিতে গিয়ে নিশ্চিন্তে
দ্যাখে সে নিজের জামা পারছে না চিনতে!

কোথা গেল মশামারা মহাবীর চাক্‌তি?
টান মেরে জামা খুলে ঘটেছে বিপাকটি—

সাধের মেডেলগুলো পড়ে গেছে রাস্তায়,
মহাবীরও শেষকালে এইভাবে পস্তায়!

পিঁপড়ে ও মশা মেরে ছিল মহাগর্ব,
হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল আরশোলা-পর্ব।

সত্যি মানুষ

ক্লাস ওয়ানেই পড়ার সময় মা বলেছেন,—
পড়াশুনোয় হতেই হবে অমর্ত্য সেন।

খেলাধূলাও করতে হবে, —যুক্তি বাবার
খেলার মাঠেও হতেই হবে তেন্ডুলকার।

এসব ছাড়াও আঁকতে হবে, গাইতে হবে
এখন নইলে বেহালাটাও শিখবে কবে?

এই বয়েসই সাঁতার শেখার পক্ষে ভালো—
ছোট্‌কা থাকে পাশের বাড়ি, সে জানালো।

বাবা বলেন, —কিনেই আমি কম্পিউটার।
এখন থেকেই করলে শুরু ভাবনা কী আর!

ভাবনা তবু ফুরোয় নাকো, বেড়েই চলে,
কতকিছুই শেখার আছে জলেস্থলে।

জোর করে কি সেসবকিছু শেখানো যায়?
শেখার জিনিস ছড়িয়ে আছে হেথায় হোথায়..

খেলতে খেলতে শেখার মতো আনন্দ কই?
পড়তে পড়তে খেলার জন্য গল্পের বই?

সবই এখন রুটিনমাফিক, বাঁধাধরা,
রুটিন ভাঙা মানেই সময় নষ্ট করা।

এমনতরো চাপেই যারা যাচ্ছে পিষে
ঝকমকানো বুদ্ধি তাদের খুলবে কীসে?

ছাত্র তো নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে বাধ্য সেনা!
মুখটি বুজে লড়তে ওদের ভাল্লাগে না।

না হয় তারা না-ই বা হলো বিখ্যাত লোক—
সহজ স্বাধীন সুশিক্ষিত মানুষ তো হোক!

লেজবতী রাজকন্যে

এক যে আছে মেনিবেড়াল, তাহার
এম্‌নিতরো রেশমি লেজের বাহার,—
মেনির ভারি গর্ব লেজের জন্যে

চিরুনি দিয়ে লেজটিকে আঁচড়িয়ে
নিত্য রাখে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে,
সবাই বলে — লেজবতী রাজকন্যে!

শীতকাতুরে

শীত পড়েছে হুট্ করে
পাগলা হাওয়া উত্তরে
কাঁপাচ্ছে হাড়,
লেপের পাহাড়
সরিয়ে কখন উঠব রে!

তার চে' থাকি আধশোয়া,
ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোয়া
শক্ত বড়,
তার চে' ধরো
গরম চায়ে নীল ধোঁয়া—

পেতাম যদি বিছ্নাতে!
একটু মুড়ি তার সাথে,
না চিবিয়েই
খেতাম রে এই
ঠক্ঠকাঠক্ঠক্ দাঁতে!

কুস্তিগিরের ফিরিস্তি

তিস্তামাসির পিসতুতো ভাই, লড়তে জানেন কুস্তি।
মস্ত খ্যাতি বিস্তৃত তাঁর পোস্তা থেকে উস্তি।

আস্ত কাঁঠাল হজম করেন, নাস্তাতে খান গোস্ত,
সস্তা পেলে গিলতে পারেন বস্তাখানেক পোস্ত।

আস্তিনটি গুটিয়ে তুলে করেন ধস্তাধস্তি,
কুস্তিগিরের মস্তানিতে কোথাও নেই স্বস্তি!

ইস্তাম্বুল গেলেন তিনি কিনতে বাদাম পেস্তা,
দরদস্তুর করার পরে ভেস্তে গেলেন শেষটা।

সমস্তটা পয়সা ছিল দস্তানাতে ন্যস্ত,
আসতে গিয়ে ফেলেই এলেন হয়ে শশব্যস্ত।

পেস্তা-অলা পুস্তু ভাষায় বলল হাসতে হাসতে,
দোস্ত তুমি কিস্তিতে দাম চুকাও আস্তে আস্তে।

কিন্তু তখন কুস্তিগিরের অবস্থাটি বেশ তো,—
আস্তানাতে খাচ্ছে হাওয়া মাস তিনেকের রেস্ত!

বস্তুত ঐ পয়সা তো আর ফিরল না তাঁর হস্তে,
রাস্তাখরচ জোগাড় হলো অনেক বন্দোবস্তে।

পোস্তা থেকে বাস্তু তুলে পাড়ি দিলেন বস্তার,
কুস্তি লড়ায় ইস্তফা দ্যান, ব্যবসা ধরেন দস্তার।

দিস্তে দিস্তে কাগজ গেল বিস্তারিত লিখতে,
ভাবিস তোরা, ––সমস্তটাই মস্ত বড় মিথ্যে!

অভাবে নয়, স্বভাবে

সকাল হতেই ডাক দিল কাক : কা-কা
বলল রেগে : এক্ষুনি চাই টাকা।

ক্ষিদের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি
পয়সা পেলে কিনতে যাব কী কী?

চালডাল না নুনতেল না ময়দা?
ওসব কিনে নেইকো আমার ফয়দা।

রান্নাবান্না নয় তো আমার সাধ্য
খুঁজতেছি তাই রান্না-করা খাদ্য!

পয়সা পেলে বেরোই খাবার কিনতে,
তা নইলে কি জুটবে চেয়েচিন্তে?

ভিক্ষে করে চর্ব্যচোষ্য হয় না,—
এমন গভীর দুঃখ প্রাণে সয় না।

টাকার খোঁজে হাপসে অনেক দিন তাই
লোকের ঘরে করছি চুরি ছিনতাই।

*

কাকের কথায় মানুষ হাসে : হা-হা
কী ঘোরালো যুক্তি তোমার, আহা!

আর বলে না, আমরা সবাই জানি
কেমন তোমার মিটমিটে শয়তানি

টাকার জন্যে করছ ফেরেব্বাজি
কাজের বেলায় নওকো তুমি কাজী

চোরডাকাতি করছ কেন মরতে?
পয়সা পাবে কাজের পরিবর্তে।

মাছের গন্ধ ঢাকবে এমন শাক কই?
আমরা জানি অনেক প্রবাদ-বাক্যই

ভাত ছড়ালে হয় না কাকের অভাব।
চোরডাকাতি চোরডাকাতের স্বভাব।

টিক টিক, ঠিক ঠিক

কোচবিহারের কাচ্চুমামা বলেন : এটা সত্যি কী—
লতায় পাতায় আত্মীয় হয় ঘড়ি এবং টিকটিকি?

এদের মধ্যে মিলটা কোথায় চিন্তে-ভেবে বলুন তো?
দুটোই থাকে সবার ঘরে দেওয়াল বেয়ে ঝুলন্ত!

এতেই বুঝি আত্মীয় হয়? মানতে তেমন ইচ্ছে নেই?
কাচ্চুমামা প্রশ্নগুলো করেন কিন্তু ঠিক জেনেই।

বলুন দেখি বিশ্ব জুড়ে দেওয়ালঘড়ির কোন্ ভাষা?
জবাব দিতে গিয়েই দেখি একেবারে কোণঠাসা!

বলছে ঘড়ি টিকটিকিয়ে : বাজছে ক'টা দ্যাখ্ দিকি!
টিক-টিক-টিক! — দেওয়াল থেকে টিটকিরি দেয় টিকটিকি!

মানুষ নামে জন্তু

সিংহ বাঁচে হরিণ খেয়ে,
হরিণরা খায় ঘাস।
পাখপাখালি পোকার খোঁজে
ঘুরছে বারোমাস।

বাঘ তো বেজায় হিংসুটে, আর
তেমনই বদরাগী—
একটা ছাগল একাই খাবে,
নেই তো ভাগাভাগি।

সুযোগ পেলে মানুষও খায়,
কিন্তু বলি শোনো—
বাঘের মাংস বাঘ খেয়েছে
শুনেছ কক্ষনো?

হাতির মতো বিশাল প্রাণী
ডাঙায় কে আর আছে,
কিন্তু তারও পেট ভরে যায়
গোটা দুয়েক গাছে।

তিমিমাছের পেটখানা তো
মস্ত সবার চেয়ে,
তার খিদে তো দিব্যি মেটে
শ্যাওলাপোকা খেয়ে!

নিজের মনে পিঁপড়ে তুলে
খাচ্ছে আর্মাডিলো,
অন্য কোনও চিলের ভাগে
ছোঁ মারে না চিলও।

কুকুর বেড়াল গরু এবং
আরও হরেক প্রাণী—
নিজের নিজের খাদ্যটুকুই
সংগ্রহে সন্ধানী।

কেউ বা শুধুই মাংসাশী, আর
কারোর রুচি ঘাসে,
সবাই কেমন নিজের মতো
বাঁচতে ভালোবাসে!

সবাই? উঁহু! এক যে আছে
জন্তু পৃথিবীতে—
যারা শুধুই পরস্পরের
শিখেছে প্রাণ নিতে।

তাদের ভারি গর্ব, কারণ
তাদেরই শিরদাঁড়া
মগজটাকে উঁচিয়ে তুলে
এক্কেবারে খাড়া।

উঁচু মাথায় বুদ্ধি বেশি
অন্য সবার চেয়ে,
মানুষ নামে বিচিত্র এই
জন্তুটি দু-পেয়ে।

এরাই কেবল অন্য প্রাণী
মারার সাথেসাথে
মানুষ হয়ে মানুষ মারে
হিংস্র নখে দাঁতে!

গায়ে তেমন জোর নেই, তাই
এড়িয়ে হাতাহাতি,
নিত্য নতুন অস্ত্র নিয়ে
খুন করে স্বজাতি।

বাচ্চাদেরও হত্যা করে
সশস্ত্র সৈন্যেরা—
এরাই নাকি জীবজগতে
সবার চেয়ে সেরা!

আসলে তো এসবকিছুই
ভণ্ডামি ও ফাঁকি,
মানুষ কেমন জন্তু সে আর
জানতে তো নেই বাকি!

আমরা যদি বুঝতে পেতাম
অন্য প্রাণীর ভাষা—
ওরাও কেমন মানুষ নিয়ে
করতেছে তামাশা—

তখন কি এই উঁচু মাথা
হেঁট হতো না লাজে!
আমার তো ভাই ক'দিন থেকেই
কেবল মাঝেমাঝে

হচ্ছে মনে — বন্ধ না হয়
নিজের পাড়ায় ঢোকা,
কুকুর বেড়াল দুয়ো না দেয়
— বোকা! বোকা! বোকা!

বসন্ত উৎসব

বসন্তকাল আস্‌লে পরে গাছগাছালির মজা,
সবাই মিলে উড়িয়ে দিল কিশলয়ের ধ্বজা।

সেজেগুজে চলল সবাই উৎসবে যোগ দিতে,
শিমূল পলাশ সবার মাথায় টুকটুকে লাল ফিতে।

কৃষ্ণচূড়ার আগুন রঙের ওড়না-চুড়িদার,
রাধাচূড়ার মতোন আছে স্বর্ণচুড়ি কার?

জারুল পারুল ভাইবোনেতে করছে কী হাঙ্গামা—
ওদের যে চাই গোলাপি আর বেগ্‌নিরঙের জামা!

আলোকসজ্জা নইলে কী আর তেমন শোভা খোলে?
অমলতাসের ডালে সোনার ঝাড়লণ্ঠন দোলে।

মুখ শুকিয়ে লুকিয়ে ছিল মাদার গাছের ডাল,
দখিন হাওয়ায় খবর পেয়ে সাজলো লালে লাল!

ভিন্‌দেশি এক অতিথ্‌ এল, সাকিন মাদুরাই,
নামখানি তার ছায়াতরু, রূপের সীমা নাই।

রুদ্রপলাশ নামটি বড্ড কঠিন এবং ভারী,
কমলা রঙের পাগড়ি তারও কেমন মনোহারী!

এম্‌নিতরো নানান সাজে সেজে সকল গাছ
সবাই মিলে করল শুরু মহোৎসবের নাচ।

নাচে গানে খুশির টানে উঠল সবাই মেতে,
কেউ দ্যাখেনি মাঠের ধারে কে ছিল ওৎ পেতে—

হিংসুটে এক কালবোশেখি হঠাৎ এল তেড়ে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছগাছালির সজ্জা নিল কেড়ে।

ফেলল ছিঁড়ে নতুন জামা, ঝাঁকিয়ে দিল চুল,
পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিল সদ্যফোটা ফুল।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে উধাও হলো শেষে,
কেন এমন দুঃখ এল হাসিখুশির দেশে?

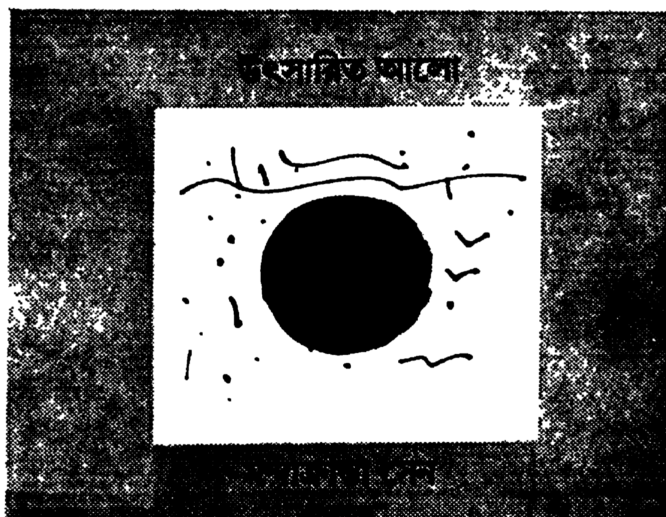
আসলে কি, এম্‌নি করেই জীবনধারা বয়,
সুখের ভীষণ কাছেই থাকে দুঃখ পাওয়ার ভয়।

ফুল ফোটানোর মাসেই আসে কালবোশেখির হানা—
বিপদ কোথায় লুকিয়ে থাকে যায় না তাকে জানা!

তাই বলে কি শিমুল পলাশ ফুটবে না আর কাল?
রাত পোহালেই উঠবে ভরে কৃষ্ণচূড়ার ডাল।

হিংসুটে ঝড় আজকে যাদের হাত-পা দিল ভেঙে,
কালকে তারা নতুন রঙে উঠবে দেখো রেঙে!

না হয় আবার ঝড়ের হাতে দুঃখ পেতে হবে,—
ফুল ফুটিয়ে যাবেই তারা বসন্ত-উৎসবে।



উৎসারিত আলো

উপাসনা, উপাসনার মা, অমৃত, মুকুল, অমৃতর স্ত্রী এবং অন্যান্য

কবিতা তো কিছু নয়। কবিতা তো সত্যটুকু বলে।
আমি সে সত্যকে শিখি, মন্ত্র শিখি, কবিতার ছলে।

দৃশ্য : ১

● **মেয়েটি একা বসে আছে। নতজানু। চোখ বন্ধ। হাত দুটি উপাসনার ভঙ্গিতে কোলের ওপর জড়ো করা। তার নাম ধরা যাক, উপাসনা-ই।**

উপাসনা।। কে জানে কখন দেখব তাকে
যার জন্য একা একা থাকা
এলোমেলো ব্যস্ততার ফাঁকে
অবসর জড়ো করে রাখা
শুধু যার কথা ভাবব বলে
আমাকে সে কতখানি ভাবে?
আমি যেন ভেসে আছি জলে
... সে কখন তরণী ভাসাবে!

● **উপাসনার মায়ের প্রবেশ**

মা।। কী রে মেয়ে, এমন বিকেলে
বই পড়া, গান শোনা ফেলে
একা একা ঘরে বসে কেন?
একবার মনে হলো যেন
তুই বুঝি বাড়িতেই নেই
দুপুরে খাওয়ার পরে সেই
ঘরে ঢুকেছিস, এতক্ষণ
চুপচাপ কেন রে এমন?

উপাসনা।। (চমক ভেঙে)
এস মা, ঘরে এস। আমি তো এভাবেই থাকি।
এমন কথা বলো! নতুন মনে হলো নাকি!
কী আর একই বই, একই কথার নাড়াচাড়া
গানেরও রস কই—সবই কেমন ছাড়াছাড়া ...

মা।। হয়েছে। থাক, বলো, আবার মন খারাপ কেন?
ভুলেছ কেনি জি-কে, আর স্যাভেজ গার্ডেন-ও!

উপাসনা।। ওরা কোন দেশে থাকে, মাগো!
ঐ তীব্র স্বপ্ন যুবকেরা?
ওরা কি কখনও সত্যি হয়
যত সত্যি ওদের সুরেরা!

মা।। (হেসে)
সে কী কথা, ওরা তো মানুষ-ই
মানুষই তো শিল্প সৃষ্টি করে।
সে শিল্পই সীমানা পেরিয়ে
পৌঁছে যায় দূরান্তের ঘরে।
শিল্প যদি মনকে ছুঁয়ে থাকে
শিল্পী হতে বড় সত্য সে-ই
স্রষ্টা তার সৃষ্টিতে বাহিত
সামনে তার কোনও বাধা নেই।

এ সব কথা যাক,
তোর কী হলো তাই বল!
ওরা ও-দেশে থাক
আমরা ছাদে যাই চল।

দৃশ্য : ২

- **একজন বিষণ্ণ মধ্যবয়সী পুরুষ একটি কম উচ্চতার শয্যায় আধশোয়া। চারপাশে এলোমেলো বই ও কাগজপত্র ছড়ানো। তার মাথার ওপরে দেওয়ালে একটি ঘড়ি টাঙানো। মঞ্চের একপাশে লেখার চেয়ার টেবিল। পুরুষটির নাম, ধরা যাক, অমৃত।**

অমৃত ।। আজও সে এল না। কিন্তু, মনে হয় কাল আসতে পারে।
তার ক্ষীণ আসা-যাওয়া ধরা পড়ে চোখের ওপারে।
আমার দৃষ্টিতে নয়, আমার সৃষ্টিতে তাকে চিনি।
বলো, কতদূরে আছ, কবে আসবে তুমি, বিরহিনী!

- **সে শয্যা থেকে উঠে পড়ে। পায়চারি করে। লেখার টেবিলে গিয়ে বসে। আমরা তার উপবিষ্ট ফেরানো পিঠ দেখতে পাই। সে অস্থির। ত্রস্তহস্তে কিছু লেখে ও**

পাতা ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে ইতস্তত।

অমৃত।। আরও কত রাত্রিকাল এইভাবে আলো জ্বালতে হবে!
আলো জ্বেলে বসে থাকব আত্মা খুলে রেখে, নতজানু?
শরীরে আগুন দেবো ভয়ঙ্কর একাকী উৎসবে—
ঝরে যাবে, মরে যাবে, উড়ে পুড়ে যাবে পরমাণু...

● **অমৃতর স্ত্রীর প্রবেশ। ঘুমচোখ। বিরক্ত, উস্কোখুস্কো।**

স্ত্রী।। কী হলো কী। সারারাত ধরে
বিড়বিড় আর পায়চারি
উদয়াস্ত খেটে তার পরে
রাতে একটু ঘুম না হলে পারি!
সারাক্ষণ আলো জ্বেলে রাখা
কাগজ ফেলেছ ঘরময়
এত ফেলাছড়া! কত টাকা
আনলে তবে এত কিছু সয়?
শোনো, আলো নেভাও এক্ষুনি
আর শুয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি
ও ঘরে জেগে না যায় টুনি
কাকে সামলাই, কাকে ছাড়ি...

● **স্ত্রীর প্রস্থান। অমৃত এতক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিল। এবার সে ওঠে। কাগজের গোল্লাগুলো ধীরে ধীরে কুড়োতে থাকে।**

অমৃত।। না, এ সে জীবন নয়, এ জীবন আমাকে চেনে না।
এ জীবন চাকরি করে। এ জীবন ইতস্তত দেনা।
এ লোক বাজার করে। এ লোকে অটোতে চেপে ফেরে।
এই লোক স্বামী আর পিতার ভূমিকাটুকু সেরে
তবে আমি হয়, আমি হই। আমি তাকে চিনতে পারি
(সে আলো নেভায়। শুয়ে পড়ে।)
এবার ঘুমোও। ফের জেগে উঠতে হবে তো, সংসারী!

দৃশ্য : ৩

● **খোলা ছাদে মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে উপাসনা। নরম আলোর বিকেল। পাখিদের ঘরে ফেরার কলরব শোনা যায়।**

উপাসনা।। ঐ দ্যাখো মা, চড়ুইপাখি দুটো
ওরা দু'জন ঐ দেওয়ালের ফুটোয়
কেমন ছোট্ট ঘর বেঁধেছে, বলো?
দু'জন ওরা কবের থেকে চেনা?
কোথায় ওদের প্রথম দেখাশোনা
কেমন করে দু'জন বন্ধু হলো?

মা।। কী করে তোর কথার জবাব দিতে
পারব আমি! মুখ্যু তো এমনিতে
আমি আমার যা মনে হয় বলি
তুই তো ভাবিস তোর মা সবই জানে
এদিকে তোর প্রশ্নগুলোর মানে
খুঁজতে খুঁজতে পেরোই অলিগলি।
চড়ুই দু'জন কেউ কারও নয় চেনা
যদিও ওরা কক্ষনো ভাববে না
এসব কথা। এসব মানুষ ভাবে।
ওরা দু'জন বাসা বাঁধবে সুখে,
বাচ্চা দেবে, খাদ্য দেবে মুখে,
তারপরে দু'দিকেই উড়ে যাবে।
পশুপাখির সঙ্গেথাকার রীতি
এসব খেলা চালাচ্ছে প্রকৃতি
মানুষ তবু অন্য কিছু চায়

উপাসনা।। হ্যাঁ মা, আমি অন্য কিছু চাই
প্রেম তো করে বন্ধুরা সব্বাই
আমি আছি কীসের অপেক্ষায়!
সবাই কেমন প্রেম করে মা, দেখি,

আমায় বলে : সিঙ্গল তুই? সে কী!
কত ছেলে রোজই প্রপোজ করে
আমার কেন ভাল্লাগে না ওদের
কেমন যেন ফারাক আছে বোধের
ওরা সবাই কেরিয়ারেই মরে
ওরা সবাই গান শোনে না-শুনে
শিমূল পলাশ দ্যাখেই না ফাল্গুনে
অথচ এই কলকাতাতেই থাকে
ওরা সবাই দারুণ পোশাক পরে
কোকাকোলা পেপসি খেয়ে ঘরে
ক্যান ছুঁড়ে দেয় নোংরা শহরটাকে!

মা।। থাক্ থাক্। আর নয়। যথেষ্ট নালিশ
করেছ ওদের নামে। —তুইই তো বলিস
নালিশ খারাপ কাজ! ওরা তো বন্ধুই।
তাহলে ওদের কেন বোঝাস না তুই?

উপাসনা।। (উত্তেজিত হয়ে ওঠে)
বোঝাব না কেন মাগো! বোঝাতে তো যাই।
নিষ্ফল বোঝানো। ভাবি, আমি তো বোকাই,
আমি তো পাগল, তাই একা একা থাকি।
কেউ কাছে এলে তাকে দূরে দূরে রাখি।
আমাকে বোঝে না কেউ। আমার কথারা
একা একা ওড়াউড়ি করে, অর্থহারা।
আমি বুঝে গেছি কেউ এই পৃথিবীতে
আমার হবে না। তাই গোপনে, নিভৃতে
তার সঙ্গে কথা বলি, যে আমার চেনা,
যে আমার কথা বুঝবে, উড়িয়ে দেবে না।
সে আমার রাজকুমার, সে আমার ছেলে,
আমি তার সঙ্গে থাকব তাকে খুঁজে পেলে।

মা।। এ বেশ ভালো কথা,
মন খারাপ কেন তবে?

ঠাণ্ডা রাখো মাথা,
সময়ে সবকিছু হবে।
হতাশা কেন এত,
অস্থিরতা কেন, মেয়ে—
যা চাও সেইমতো
পেয়ে, অথবা, না-ই পেয়ে
জীবন কেটে যাবে
শুধু তাকেই খুঁজে খুঁজে—
তবেই তাকে পাবে,
আমার কথা দেখো বুঝে।

নীচে চল, রাত হলো। এই হাওয়া লাগানো ভালো না।

উপাসনা।। যাব। একটু পরে যাচ্ছি। মাগো, একটা কবিতা বলো না। কিংবা, না, কবিতা নয়। গান করো। রবিঠাকুরের। এক ফাগুনের গান সে আমার আর ফাগুনের...

● **মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। প্রেক্ষাপটে আকাশ। সেখানে তারা ফুটে ওঠে।**

দৃশ্য : ৪

● **অমৃতর ঘর। খাটের ওপর বালিশে ঠেসান দিয়ে অমৃত বসে আছে। মেঝেতে বসে আছে এক তরুণ। তার নাম, ধরা যাক, মুকুল।**

অমৃত ।। আজকে কবিতা নয়
আজকে অন্য কথা বলো
অন্য কোনও বিষয়,
যা ইচ্ছা কথা এলোমেলো...
সে আসেনি কবিতায়
সে এল না ছন্দের টানে
যাকে খুঁজি নিরুপায়
সে আছে কোথায় সে-ই জানে।

আজ থেকে তাকে আমি
রাখব না কবিতায় বেঁধে,
কামনা আকাশগামী
কামনা গড়িয়ে গেল জেদে।
তাকে আমি খুঁজে নেব
পৃথিবীতে, স্বর্গে, নরকে,
তাকে কবিতাই দেব
উৎসবে অথবা মড়কে।

মুকুল ।। কে সে? কবি, সে কি কোনও নারী!

অমৃত ।। হ্যাঁ মুকুল, প্রেরণা আমারি।
যে আমার কবিতার মূলে,
ছন্দ নামে সে লেখনী ছুঁলে।
এতদিন তারই পিছু পিছু
ছুটেছি। ভেঙেছি উঁচুনিচু
জীবন, সম্পর্ক, ভালোবাসা,
সে নিয়তি—অতি সর্বনাশা।
সে আমাকে টানে পথে পথে,
পৌঁছে দেয় আঁধারে আলোতে।
পৌঁছে দিত। পৌঁছে দিতে দিতে
লবণাক্ত কাঁকরে বালিতে
আমাকে সে ফেলেই পালালো—
কোথায় কবিতা! কই আলো!
অন্ধকার সমুদ্রের তীরে
বসে আছি, থাকব, সশরীরে
যতদিনে না-ই ছুঁতে পারি—
খুঁজব তোকে, সর্বনাশী নারী ...

মুকুল ।। এই তীব্র অস্থিরতা দেখে ভয় করে
সে মেয়ে কোথায় আছে ... গ্রামে, কি, নগরে!
কোথা থেকে খুঁজে আনি তাকে, প্রিয় কবি
কেমন গড়ন তার, কী বা মুখচ্ছবি!

অমৃত ।। (হেসে উঠে)
না মুকুল, কেন তুমি অত কষ্ট পেলে!
এ আমারি ভুল। তুমি অনাবিল ছেলে,
তোমাকে কেন যে আমি এসব বললামও—
ছেড়ে দাও, ছাড়ো। ও তো নেহাতই পাগলামো ...
এখন তোমার কথা বলো কিছু, শুনি।
তুমি কি পড়েছ, প্রেমে? কে সেই তরুণী?
একথা বলেছ তাকে? সে কি ভালোবাসে?
কোথায় থাকে সে? দূরে? নাকি আশেপাশে?

মুকুল ।। হ্যাঁ কবি, ভালোবাসি।
না কবি, বলিনি তো তাকে।
হেঁটেছি পাশাপাশি,
আমারই পাড়াতে সে থাকে।
সে খুব আনমনা,
অন্যরকমের মেয়ে;
সে মেয়ে উপাসনা
আপনমনে গান গেয়ে
ছাদে বেড়ায় ঘুরে।
কবিতা ভালোবাসে, জানি,
সে যেন বহুদূরে,
কী করে তাকে কাছে টানি—
ভেবেই পাই না তো,
সে মেয়ে এমনই উদাসী
সে আছে তার মতো,
আমি একাই ভালোবাসি ...

অমৃত ।। কী সুন্দর ছেলে তুমি, কী সহজ তোমার হৃদয়!
কিন্তু কেন জানাবে না তাকে, বলে দ্যাখোই-না কী হয়?
সেও হয়তো এরকমই চুপিচুপি প্রেমে পড়ে আছে,
তোমাকে জানাতে চেয়ে, কতবার আসতে চেয়ে কাছে
হয়তো সে পিছিয়ে গেছে! হয়তো সেও মায়াবী বিকেলে

তোমাকেই, কিংবা ধরো, তোমার মতোন কোনও ছেলে—
তার কথা ভাবতে ভাবতে ছাদে ঘোরে, গুনগুনিয়ে গায়,
তুমি যাকে ভালোবাসো, জানো না, সে তোমাকেই চায়!

মুকুল ।। জানি না, ভয় করে। চাইতে ভয় করে খুব।
তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় ডুব-
সাঁতারই নিরাপদ, ও-জলে ভাসবার চেয়ে ...
দু'কূলপ্লাবী আর বড় গভীর সেই মেয়ে

অমৃত ।। মুকুল, কতটা ভালো আছ
দূরে, এতদূরে, এইভাবে!
এমনকী নিশ্চল গাছ-ও
রোদ্দুরে প্রশাখা বাড়াবে
দূর মহাসূর্যের দিকে
কী সাহসে, কোন স্পর্ধায়?
(সে উঠে এসে মুকুলের কাঁধ স্পর্শ করে। মুকুল উঠে দাঁড়ায় অমৃতর মুখোমুখি)
যাও, বলে এস মেয়েটিকে
তোমার পরাণ যাহা চায়
সে যে তাই ...

● মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।

দৃশ্য : ৫

● উপাসনাদের বাড়ির ছাদ। মুকুল একা। সে কিছু অস্থির।

মুকুল ।। আজ তাকে বলে যেতে হবে সেই কথা—ভালোবাসি।
—এ আমার কবির নির্দেশ।
যাঁর প্রতি উচ্চারণে দুলে ওঠে চির-শব্দরাশি
অবাক সমুদ্র থেকে জেগে ওঠে কী বাঙ্ময় দেশ!—
তিনি, তিনি, তিনি চান আমার প্রেমের পরিণতি

(সে নতজানু হয়। প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে মেলে দেয়)

প্রিয় কবি! কাব্য-অধিপতি!
তোমার কাব্যের কাছে জন্ম জন্ম রয়ে গেছে দেনা
আমার নিজের ভাষা ফুরিয়েছে, তুমি কি দেবে না?

● **উপাসনার প্রবেশ। মুকুল স্রস্ত উঠে দাঁড়ায়। উপাসনা বিস্মিত।**

উপাসনা ।। মুকুল, এখানে তুমি? এই ছাদে? কোথা থেকে এলে?
এখানে তো কেউ নেই, দশটা ফ্ল্যাটের সব ছেলে
সব্বাই মাঠে গেছে। আজকে তো সেমিফাইনাল।
মালবিকারাও গেছে। মনে হয়, তুমি যদি কাল
সকালের দিকে আসো, ওদের সঙ্গে দেখা হবে—

মুকুল ।। **(স্বগতোক্তির ঢঙে সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে)**
না, কাল সকালে নয়। ওরা নয়। কে কখন কবে
ছাদে আসে, উপাসনা, তুমি ছাড়া! যে, এই বিকেলে
ওদের জন্য ছাদে দাঁড়িয়েছে একা কোনও ছেলে!
(উপাসনার দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ্য করে)
জানি, কেউ নেই, আমি এমনিই এসেছি এখানে।
এ বাড়িটা এত উঁচু, ছাদটা আমাকে খুব টানে ...
কখন আসিনি আগে। আজ দেখি নীচে দরজাটা
খোলা রেখে দারোয়ান টেলিভিশনেই চোখ-সাঁটা
সেই ফাঁকে চুপিচুপি একেবারে ছাদের ওপরে—

উপাসনা ।। **(প্রথম সকৌতুকে, হাসতে হাসতে; পরে খুশির স্বরে ও সোৎসাহে)**
আহা, দারোয়ান বুঝি তোমাকে পুলিশে দিত ধরে?
এসেছ তো কী হয়েছে?— সত্যি, ছাদটা এত ভালো!
এখানে বিকেল এত সুন্দর! রাত, বা, সকাল-ও।
ঐ দ্যাখো পশ্চিমে কী দারুণ মেঘ করে আছে—
নীচের শহর দূরে, মেঘের শহর কত কাছে!

চেনা যায় তার প্রতি অলিন্দ, তোরণ, খিলান-ও।
ঐ দ্যাখো, আকাশের রাজবাড়ি, কী চকমিলানো!
একটু পরেই ঐ প্রাসাদটা ভেঙে চুরে যাবে,
পুরোটা নগর কোনও সাগরের অতলে তলাবে।
সাগরে প্রবল ঢেউ। ঐ দ্যাখো বিরাট জাহাজ
ভাসতে ভাসতে দূর বন্দরে পাড়ি দিল আজ—
আগুন রঙের পাল, মাস্তুল ঈষৎ বেগুনী,
কালবৈশাখী এলে ও জাহাজও তলাবে এখুনি
(হঠাৎ থমকে গিয়ে, যেন নিজেকে সামলে নেয় সে)
এমা, এ কী করছি বলো তো
যতসব বোকাবোকা কথা
একেবারে পাগলের মতো
কী যে বকে চলেছি অযথা!

মুকুল ।। এভাবে বোলো না, উপাসনা!
এ যদি তোমার পাগলামি,
তবে সব শিল্প-রচনা
বা, কবিতা, যা পড়েছি আমি,
তাদের মধ্যে তো বেশিটাই
অর্থহীনের দলে পড়ে।
এই পাগলামিটুকু চাই।
তা নইলে মানুষের ধড়ে
প্রাণ থাকে, জীবন থাকে না

উপাসনা ।। **(ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে)**
তুমি যেন বড় চেনাচেনা!
নাকি, কথাগুলো চেনা লাগে,
কোথায় শুনেছি যেন আগে?
নাকি, ওরা আমার কথাই,
চেনাচেনা মনে হয় তাই?
(অন্যমনস্কতা থেকে সে বেরিয়ে আসে। সরাসরি মুকুলের দিকে তাকায়)

আসলে, যে কথা আমি বলতে চাইছি
যা না বলে কী যে বলে গেছি মিছিমিছি—
তা হলো, এ ছাদে তুমি আসতেই পারো।
সেখানে তো একটুও আপত্তি কারও
থাকবার কথা নয়! যারা ছাদে আসে
তারা অনুমতি পায় আকাশে, বাতাসে।
যাদের সময় আছে আকাশ দেখার,
এই ছাদে বেড়াবার তার অধিকার।

মুকুল ।। সত্যি, উপাসনা, এ আমি ভাবতে পারিনি!
আজকে এত ভাবে তোমার কাছে আমি ঋণী
বোঝাতে পারব না। কী দেবো এর বিনিময়ে?
এ ঋণশোধ নয়। এ শুধু পূর্ণ হৃদয়ে
উপচে যেতে চাওয়া।—কিছু কি দিতে পারি আমি?

উপাসনা ।। (সকৌতুকে)
হ্যাঁ তুমি দিতে পারো। কিন্তু সেটা ভারি দামী!
শুনেছি তুমি কবি। আমি কবিতা ভালোবাসি।
যা পাই তাই পড়ি। অপরিমিত। রাশি রাশি।
বই বা পত্রিকা—যখন যেখানে যা পাই।
আমাকে দিতে পারো তোমার সেই কবিতাই।
নতুন লিখে এনে, পুরোনো লেখা বার করে,
আমরা প্রতিদিন ছাদের কবিতা-আসরে
মিলিত হতে পারি, তুমিও থাকো যদি রাজি—

মুকুল ।। হ্যাঁ, রাজি! কবিতা তো এখনই হতে পারে। আজই!

উপাসনা ।। শোনাও তবে। দ্যাখো, এখনও আলো। কিছু পরে
অন্ধকার হলে না হয় নেমে যাব ঘরে।
তোমার তাড়া আছে? নেই তো? বেশ, শুরু করো।

মুকুল ।। করছি, উপাসনা, কিন্তু, শুনবার পরও
যদি না ভালো লাগে সে কথা দ্বিধাহীন ভাবে
আমাকে বলে দিও—

উপাসনা ।। সেসব পরে দেখা যাবে।
কবিতা শুনি আগে। এস না, বসি এইখানে।
শব্দ মেলে দাও যোগাযোগের সন্ধানে ...

● **দু'জনে মুখোমুখি বসে পড়ে। মুকুল কাঁধব্যাগ থেকে খাতা বার করে কবিতা শোনাতে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।**

দৃশ্য : ৬

● **উপাসনার ঘর। সে একা বসে আছে। মগ্ন।**

উপাসনা ।। কখন বিকেল হবে! কখন মুকুল
নতুন কবিতা হয়ে ঝরে পড়বে আমার বাগানে!
আমি আজ এত তীব্র, এমন আকুল,
এ কেমন অস্থিরতা! কী আমার হৃদয়ের মানে
সে কি তুমি জেনে গেছ, অরণ্যযুবক?
তোমার কবিতা বুঝি বিষুবীয় বর্ষা-বনভূমি,
ভেজা ভেজা জলবায়ু অতি মারাত্মক!
দুঃসাহসী বৃষ্টি হয়ে আমাকে ভিজিয়ে দিতে তুমি
কেন এলে, বলো, কেন এলে!

● **মায়ের প্রবেশ। হাতে একটি পত্রিকা।**

মা ।। ওরে, তোর বন্ধু ঐ ছেলে—
এই দ্যাখ্, এই পত্রিকায়
ওরই লেখা প্রথম পাতায়।
ও তোকে বলেনি বুঝি আগে?
—ওকে কিন্তু বেশ ভালো লাগে।
কথা কম, মেধাদীপ্ত চোখ,
কবিতায় বেশ সাবালক,
অথচ কিশোর মুখখানি।
—উপাসনা, আমি কিন্তু জানি

তুমি পড়ে গেছ ওর টানে।
শোনো মেয়ে, খুব সাবধানে
রাশ রেখো নিজের আবেগে।
অবাঞ্ছিত কোনও ধাক্কা লেগে
যেন ভেঙে না পড়ে হৃদয়—
আমার যে তোকে নিয়ে ভয়!

● **মা উপাসনার মাথায় হাত রাখেন। সে পত্রিকাটা নিয়ে পড়ে। তারপর হাসতে হাসতে মাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ের কোলে মাথা রাখে। এখন সে হাসছে না।**

উপাসনা ।। জানি মা, আমারও ভয় করে।
আমি তো শুধু স্বপ্নই দেখেছি।
কখনও ভাবিনি ঘুণাক্ষরে
সে স্বপ্নের এত কাছাকাছি
এসে পড়লে কী ভাবে কী হয়!
মাগো, আমি কী করি বলো না!
ও যেন কারোর মতো নয়
অথচ এমন চেনাশোনা ...
ও আমার সব কথা বোঝে,
আমি বুঝি ওর কবিতাকে ...
(উঠে বসে)
কেন বুঝি জানো! মাগো, ও যে
কবিতার মধ্যে ডুবে থাকে।
ওর কবিতার শব্দগুলো
লেগে থাকে ওর সারা গায়ে
যেমন পথের সব ধুলো
প্রতি পদক্ষেপে দুই পায়ে
লাগবে, যদি পথ হাঁটতে থাকো—
ও তেমনি কবিতায় হাঁটে।
পার হয় কবিতার সাঁকো,
শুয়ে থাকে কবিতার মাঠে।
আমি যদি ওর হাত ছুঁই
স্পর্শ করি কবিতা, কবিতা ...

মা ।।　মুগ্ধ হয়ে পড়েছিস তুই।
মুগ্ধতার রেণুগুলো থিতা
যত্ন নিয়ে, বুকের গভীরে।
তবেই তো স্বচ্ছ হবে জল,
শান্ত হয়ে যাবি ধীরে ধীরে।
কাকচক্ষু হৃদয়ের তল
তখনি তো দেখতে পারবে খুঁজে,
সে অতলে কার নাম লেখা!
আমার কথাটি দেখো বুঝে
যে কথা জীবন থেকে শেখা।

উপাসনা ।।　বুঝেছি মামণি। তাড়াহুড়ো করব না।
চুপ করে থাকি আপাতত কিছু দিন।
যেমন চলছে চলুক কবিতা শোনা,
এখনি নিজেকে ভাসানো অসমীচীন ...

● মা হেসে চলে যান। উপাসনা একা বসে থাকে।

উপাসনা ।।　ভাসাব না। না হয় না ভাসালাম। ডুবে যেতে পারি।
তাকে না-ই জানালাম। জানানো যে খুব দরকারী—
এমন ভাবি না আমি, হয়তো বা এরকমই ঠিক।
হতে পারে সে ছেলেও আর কোনও মেয়ের প্রেমিক!
আমি যদি তাকে বলি—ভালোবাসি, সে আর কখনও
হয়তো আমার কাছে আসবে না। কোনদিনও কোনও
কবিতাও শোনাবে না। আমি মরে যাব একা একা।
তার চেয়ে এই ভালো, মাঝেমাঝে বিকেলের দেখা ...
এই যে কবিতা থেকে জ্বলে ওঠে চোরা বিদ্যুৎ
কোমল আলোয় দেখি, ও আমার সেই দেবদূত,
যার দুই ডানা থেকে ঝরে পড়ে নীল শুশ্রূষা,
বদান্য দুই হাতে কবিতার মণিমঞ্জুষা
তুলে ধরে, খুলে দেয়, ঢেলে দেয় অতি অনায়াসে
এমন কী ক্ষতি যদি সে আমাকে না-ই ভালোবাসে!

আমি তাকে ভালোবেসে ডুবে যাব গভীরে গভীরে
না হয় না ভাসি ... আর, না-ই পৌঁছই কোনও তীরে

● **মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।**

দৃশ্য : ৭

● **মঞ্চ ফের আলোকিত হয়। উপাসনা আছে। মুকুলের প্রবেশ। সে উত্তেজিত।**

মুকুল ।। উপাসনা, কত তাড়াতাড়ি
তৈরি হতে পারবে তুমি বলো,
আজকে যাব একজনের বাড়ি—
তাঁর ইচ্ছে, তুমি সঙ্গে চলো

উপাসনা ।। তাই বুঝি? কে সে নামীদামী,
আমাকে চেনেন নাকি তিনি?

মুকুল ।। না না, তিনি নন। আমি, আমি
চিনি গো তোমারে বিদেশিনী!

উপাসনা ।। বা রে, এ তো দারুণ মেজাজ!

মুকুল ।। কার কাছে যাবে জানো আজ?
তিনি যে তোমার বড় চেনা!
আসলে কি, ওঁকে যে চেনে না
এমন পাঠক কেউ নেই
বাংলাদেশে। তুমি তো তাঁকেই
শ্রেষ্ঠ কবি মনে করো, জানি—

উপাসনা ।। **(উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে)**
তার মানে! নিজের দু'কান-ই
অবিশ্বাসে শ্রবণ-বিস্মৃত!
কে সে কবি! তিনি তো অমৃত!

অমৃতর কাছে নিয়ে যাবে?
আমাকে? এখন? এইভাবে?
যাঁকে তীব্র চিনি কবিতায়
তাঁর কাছে সত্যি যাওয়া যায়!
(সে মুকুলের হাত ধরে ঝাঁকাতে থাকে)
আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না যে! কী করে কী হলো!

মুকুল ।। শান্ত হও, উপাসনা। বলছি। আগে তৈরি হয়ে চলো।

● **মঞ্চ আবছা আলোতে ভরে থাকে। মুকুল ও উপাসনা একই জায়গায় থেকে হাঁটার ভঙ্গিমা করে চলে। উভয়ের উপর আলো পড়ে।**

মুকুল ।। তোমাকে বলিনি আগে। আমি কিন্তু ওঁর কাছে যাই।
নিয়মিত, বহুদিন, ওঁরই কণ্ঠ থেকে শুনতে পাই
নতুন নতুন লেখা। আমার সৌভাগ্য আশাতীত,
—এ কথাই বলবে তুমি। আমি বলি, আমি যে জীবিত
সে তো শুধু ওঁরই জন্য। ওঁরই জন্য কবিতায় আছি।
কী করে যে চলে আসা ওঁর এতখানি কাছাকাছি,
আমি তা জানি না, উনি টেনে নিয়েছেন, তা-ই জানি
আমার কবিজীবনে ওঁরই দেয়া প্রাণে আমি প্রাণী।
ওঁর সঙ্গে কথা বলি। কবিতা ছাড়াও নানা কথা।
মাঝেমধ্যে জানতে চান কার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা।
বন্ধুদের গল্প করি, যদিও তাদের সংখ্যা কম।
উনি বড় সঙ্গীহীন। মনে হয়, কিছু উপশম
যদি ওঁকে দিতে পারি বন্ধুদের টুকরো ছবি এঁকে ...
সেদিন তোমার কথা বলছি, উনি তাকালেন;—'একে
দেখতে চাই আমি। ওকে নিয়ে এস আমার এখানে—'
আসলে কি, আমি ওঁকে বলেছি যে কবিতা ও গানে
তুমি এত মগ্ন আছ ... ওঁর লেখা তোমার কী প্রিয়!
...যে গান গেয়েছ রোজ, আজ তাঁকে সে গান শুনিও।

● **মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।**

দৃশ্য : ৮

● **অমৃতর ঘর। মুকুল ও উপাসনা রয়েছে। উপাসনা অমৃতর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে ভূমিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে, বহুক্ষণ ধরে। অমৃত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।**

অমৃত ।। (সংকুচিত ভাবে)
ওঠো মেয়ে, আমি এই প্রণামের যোগ্য লোক নই।
সমস্ত জীবন ধরে দু'চার কবিতা লেখা বৈ
কিছুই করিনি আমি, যাতে এই শ্রদ্ধা পেতে পারি ...
ওঠো। বড় সংকুচিত লাগে। এ তো মহত্ব তোমারি—
আমি যা যা লিখি তুমি সে সব সামান্য লিপি পড়ো।
কবি মনে করে—তুমি পাঠক, কবির চেয়ে বড়

উপাসনা ।। (নতজানু অবস্থাতেই অমৃতর দিকে তাকিয়ে)
আমি তা জানি না, কবি! আপনি যাকে সামান্য বলেন
তোমার সে বিন্দুখানি আমার যে সমুদ্র সফেন!
জানি না কতটা বুঝি। সত্যি সত্যি কিছু বুঝি কি না।
শুধু এইমাত্র বুঝি — তোমার ধ্বনি ও শব্দবিনা
আমার নিজেকে চেনা বাকি থেকে যেত কতখানি—
তোমার কবিতা দিয়ে আমি সারা পৃথিবীকে জানি।
কবিতা তো কিছু নয়। কবিতা তো সত্যটুকু বলে।
আমি সে সত্যকে শিখি, মন্ত্র শিখি, কবিতার ছলে।

● **অমৃত স্তম্ভিত হয়ে থাকে। তার মুখটুকু আলোকিত রেখে মঞ্চ আবছা হয়ে যায়। সে আত্মগতভাবে উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে—**

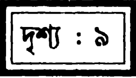
অমৃত ।। এ কী তীব্র উচ্চারণ! এ কী!
এ কেমন মেয়ে। এ মেয়ে কি
পাঠিকা? না কবি সে নিজেও?
ও মেয়ে, আমাকে বলে যেও
আমার রচনাদের মানে,
আমি যে কী লিখি তা কে জানে!

এ কী বাক্য শোনালে, তরুণী!
বলো, তুমি বলো, আমি শুনি...

● **মঞ্চে আলো স্বাভাবিক হয়ে আসে। অমৃত গিয়ে তার শয্যায় বসে। উপাসনার দিকে তাকায়।**

অমৃত ।। মুকুলের কাছে আমি শুনেছি যে, তুমি ভালো গাও।
কথা থাক। তুমি সেই গানই আজ বরং শোনাও।

● **উপাসনা গান শুরু করে। 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।**



● **অমৃতর ঘর। অমৃত পাগলের মতো পায়চারি করে। দু'হাতে মাথার দু'পাশের চুল চেপে ধরেছে সে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে।**

অমৃত ।। উপাসনা উপাসনা উপাসনা, তুমি সেই মেয়ে,
চিনেছি তোমাকে। আর তুমিও অমন গান গেয়ে
না চিনেই চলে যাবে এ কি আমি হতে দিতে পারি!
উপাসনা উপাসনা উপাসনা, তুমি সেই নারী!
আমাকে চেনোনি তুমি! তুমি এই কবিরই কবিতা,
নিজেকে কি চেনো তুমি? তুমি যেই রূপে পরিচিতা
সে যে পূর্ণ তুমি নও! তুমি শক্তি! কবির লেখনী
এস স্পর্শ করো। যদি স্পর্শ করো, আমিও এখনি
জানি না কোথায় মুক্তি পাব—মৃত্যু, না কি উজ্জীবনে
তোমার গানের সুরে মৃত্যু এসে শুয়েছে শ্রবণে—
ওহো মৃত্যু কী সুন্দর! ওহো, মৃত্যু কী যে প্রাণোচ্ছল!
আমাকে পাগল করে কোথায় পালাবি তুই বল
তোর পিছু পিছু যাব, ওরে মেয়ে, অবাক প্রেরণা,
এক দিকে তুই, আর অন্যদিকে ... জানি ... প্রতারণা
(অমৃত হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। তার মাথা ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপরে)

হোক প্রতারণা। হোক জগতের ঘৃণ্যতম পাপ।
কলঙ্ক আমার হোক। এস গ্লানি, এস হে সন্তাপ।
তবু তাকে সঙ্গে এনো, ও কবিতা, জানোই যখন
তাকে ছেড়ে বাঁচব না যে—এ আমার ললাট'লিখন ...

● মুকুলের প্রবেশ।

মুকুল ।। এ কী কবি! এ কী দশা! শরীর খারাপ কেন এত!
চোখ দুটো লাল যেন সারারাত অনিদ্রার মতো!

অমৃত ।। ও, মুকুল! এস এস। না, শরীর খারাপ তো নয়,
রাতে ঘুমোইনি, ঠিকই। তুমি জানো, এরকম হয়।
কাল সন্ধ্যাবেলা এসে কী যে গান শোনাল মেয়েটি
সারারাত ধরে তার সুর নিয়ে সে কী খিটিমিটি!
সবার প্রথমে যেটা গাইল, ঐ যে, অমল ধবল—
মনে মনে গাইছি বেশ, অন্তরাতে এসে কী যে হলো!
সুর ছিঁড়ে গেল। ভাবি, গেল যাক। তবু সেই গান
সমস্তটা রাত ধরে আমাকে দিল না পরিত্রাণ—
মুকুল, তুমি তো জানো, যতক্ষণ না সে গানের সুর
ঠিক ঠিক লাগবে, আমি যন্ত্রণায় পাগল কুকুর ...

মুকুল ।। না না, এ তো সমস্যাই নয়,
অধীর হওয়ার কিছু নেই।
তাকে ডেকে আনলেই তো হয়,
সে মেয়ে তো গানের জন্যেই।
আমি তাকে যতদূর জানি
—গানে সে দারুণ ক্লান্তিহীন,
যাই, গিয়ে তাকে ডেকে আনি;—
ততক্ষণ একটু শুয়ে নিন।

● মুকুলের প্রস্থান

অমৃত ।। সে কি আসবে! সে কি আসবে? সে কি সাড়া দেবে এই ডাকে!
ও মেয়ে, জানো না তুমি কী পাগল করেছ আমাকে।
সে কি বুঝবে আহ্বান, সে কি ভাববে নিছক পাগলামি?
এস, উপাসনা, এস, তোমার আসার পথে আমি
কবিতা সাজিয়ে দেবো যত চাও। তার বিনিময়ে
তোমার হৃদয় রেখো ছিন্নভিন্ন কবির হৃদয়ে.....

● **অমৃতের স্ত্রীর প্রবেশ। অমৃতকে খানিকক্ষণ জরিপ করেন তিনি।**

স্ত্রী ।। কী হয়েছে শুনি? চেহারার এ কী ছিরি!
মুকুল কোথায় গেল? ওর চেলাগিরি
আমি আজ বার করছি। দুটোই সমান।
খাওয়া নেই দাওয়া নেই, পাহাড়-প্রমাণ
কাগজ জমিয়ে ঘর নোংরা করে রাখা—
ঘর না তো, ঠিক যেন নিষিদ্ধ এলাকা।
ঢুকতে গেলে ভয় লাগে। এ জঙ্গল না কি!
একে কি সংসার বলে! একই সঙ্গে থাকি
অথচ দূরত্ব দ্যাখো, যোজন যোজন।
কবিদের বুঝি কোনও সংসার, স্বজন
থাকতে নেই? স্বার্থপর! এত স্বার্থপর!
টুনিটা না থাকলে কবে তোমার এ ঘর
ফেলে রেখে যেতাম যেদিকে চোখ যায়—
তুমি নও, তুমি নও, মা হওয়ার দায়
আমাকে রেখেছে বেঁধে এই যন্ত্রণাতে।
যাকগে। শোনো, দুটো আলু ফেলা আছে ভাতে।
মাছ ভাজা আছে। দয়া করে খেয়ে নিও।
মাসিমার কাছে যাচ্ছি। ওখানে টুনিও
চলে যাবে স্কুল থেকে। বাস-এ বলা আছে
—ওকে যেন ছেড়ে দেয় এন্টালির কাছে।
ফিরতে বেশ রাত হবে। ধরো এগারোটা।
...যাচ্ছি। দরজা খোলা রইল। দিয়ে দিও ওটা।

● **স্ত্রীর প্রস্থান। অমৃত দরজা অবধি গিয়ে দরজা না দিয়েই ফিরে আসে।**

অমৃত ।। আর কত দেরি করবে উপাসনা। তাড়াতাড়ি এস।
এ গল্পের শুরুটা কি চেনাচেনা! এ গল্পের শেষও
তোমাকে মাতিয়ে দেবে, সে কথায় ধরতে পারি বাজি।
ওগো মেয়ে, আমাদের গল্প তবে শুরু হোক, আজই।

● **উপাসনাকে নিয়ে মুকুলের প্রবেশ। উপাসনা অমৃতকে পূর্বের মতো করে প্রণাম করে।**

অমৃত ।। এস, উপাসনা, এস। আহা, কেন আবার প্রণাম।
তোমাকে ডাকিয়ে এনে আমি বড় বিরক্ত করলাম—

উপাসনা ।। না কবি, বিরক্ত নয়। এ আমার মহৎ সম্মান।
তোমাকে শোনাতে পাব আবার তোমারি প্রিয় গান
—এ আমার কতখানি পাওয়া!

অমৃত ।। কাল সারারাত ধরে বেজেছে তোমার গান গাওয়া
আমার এ নিদ্রাহীন ঘরে।
তোমার সুরের দানা জমিয়ে রেখেছি থরে থরে ...
অমল ধবল পালে লেগেছে মধুর কোন্ হাওয়া,
দেখি নাই কভু দেখি নাই, ... এমন পাগল তরী বাওয়া!
(সে মুকুলের দিকে ফেরে)
মুকুল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?
বসার সময় নেই যেন!
তুমি কি এখনই চলে যাবে?

মুকুল ।। **(ইতস্তত করে)**
বাড়িতে তো বলেও আসিনি।
দুপুরে না ফিরলে; — মাকে চিনি,
নির্ঘাৎ খাবে না। এত ভাবে!

অমৃত ।। তবে, তুমি ফিরে যাও বাড়ি।
বিকেলের দিকে তাড়াতাড়ি
চলে এস এখানে আবার।
ততক্ষণ আমি গান শুনি।
উপাসনা, তোমার এক্ষুনি
তাড়া নেই তো, বাড়িতে ফেরবার?

উপাসনা ।। না, মুকুল, সেই ভালো হবে,
স্নান করে খেয়ে এস তবে।
আমি থেকে যাচ্ছি এখানেই।
গান গাইব, আর তুমি এলে
লেখা শুনব জমাট বিকেলে,
—আমার কোনওই তাড়া নেই।

● **মুকুলের প্রস্থান। অমৃত শয্যায় বসে সোজা হয়ে। উপাসনাকে তার পাশে বসার জন্য আহ্বান করে, উপাসনা মাথা নেড়ে ভূমিতেই বসে পড়ে।**

অমৃত ।। না না, উঠে এস, উপাসনা
তুমি ঐ মাটিতে বসো না,
মাটিতে তোমার স্থান নয়—

উপাসনা ।। এ মাটি তো তোমারি আশ্রয়!
তোমারি ছায়াতে বসে আছি,
এর চেয়ে আর কাছাকাছি
যাওয়া যায়? তুমি যে ঈশ্বর!
এই গান, সুর, কণ্ঠস্বর,—
এ যেন প্রণাম হয়ে স্পর্শ করে তোমার পা দুটি,
তাই আমি গান গেয়ে উঠি।

● **উপাসনা গান গায়। 'অমল ধবল পালে লেগেছে ...'। অমৃত শয্যা থেকে নেমে তার মুখোমুখি একটু দূরে বসে। গান শেষ হওয়ার পরও উপাসনা একভাবে বসে থাকে চোখ বন্ধ করে। অমৃত আরও কাছে এসে তার কাঁধ স্পর্শ করে। উপাসনা চমকে কেঁপে উঠে মুখ তুলে তাকায়।**

অমৃত ।। শোনো মেয়ে, কাকে তুমি ঈশ্বর ভেবেছ! আমি নই।
আমি এক ছিন্নভিন্ন, মানুষের মতো দেখতে লোক
অথবা মানুষও নই। কবি শুধু। নিয়তি-তাড়িত,
সে নিয়তি কী তা জানো? অহরহ খোঁজা, খুঁজে চলা।
উন্মাদের মতো আমি খুঁজে চলি পরশপাথর,
যার স্পর্শমাত্র আমি জন্ম নেব। আমার কবিতা
অশরীরী আত্মা হয়ে ঘুরে মরছে ধু ধু বায়ুস্তরে ...
তুমি তাকে জন্ম দেবে? দেবে প্রাণ? হৃদয়? শরীর?

উপাসনা ।। (বিহ্বল স্বরে)
আমি! আমি! না না, প্রিয় কবি!
এ কী কথা বলে চলেছেন!
ঘূর্ণনের মতো ঠেকছে সবই,
এত কাছে নেমে এসেছেন
আমার ঈশ্বর!—কেন! কেন!
এই মুখ দ্যাখেনি তো আমার চরমতম ধ্যান-ও!

অমৃত ।। স্থির হও উপাসনা, শোনো,
আমি যে ঈশ্বর নই! ছিলাম না, হব না কখন—
তাকাও, এদিকে দ্যাখো, আমার মুখের দিকে চোখ
তুলে দ্যাখো, দেখতে পাবে আমি এক নিরুপায় লোক
আমাকে ঈশ্বর বলে দূরে দূরে রেখো না মানবী!
আমার কবিতা তুমি! তোমাকেই লেখে এই কবি,
তোমাকে খুঁজেছি আমি কতদিন! আজ তুমি এলে;
আমার এ কবিজন্ম ধন্য হবে তোমাকেই পেলে

● **উপাসনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। মূর্ছাহতের মতো চলতে শুরু করে। অমৃত তার সামনে নতজানু হয়।**

অমৃত ।। চলে যাচ্ছ উপাসনা? চলে যাচ্ছ? ফিরে তাকাবে না?
কাব্য মূর্তিমতী! তুমি চলে গেলে কোথায় দাঁড়াব!
(তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কথা বলতে কষ্ট হয় তার)

মুখ ফেরাবার আগে শুধুমাত্র একটিবার ভাবো—
...আমার কবিতাভাণ্ড ... শূন্য ... তুমি কবিতা দেবে না?

● **অমৃত হাঁপায়। বোঝা যায় তার বুকে কষ্ট হচ্ছে। উপাসনা ফিরে আসে। অমৃত তার দিকে দু'হাত বাড়ায়। উপাসনা অতি ধীরে সে হাত স্পর্শ করে নিজের দু'হাতে। শুধু তাদের ওপর আলো পড়ে। বাকি মঞ্চ অন্ধকার হয়ে থাকে।**

উপাসনা ।। তোমার সৃষ্টির কাছে আমার এ মনপ্রাণ ঋণী
হয়ে আছে আজীবন। এ কখনও কল্পনা করিনি
তোমার কবিতা আমি হতে পারি! দিতে পারি কিছু!
সুদূর ঈশ্বর ছিলে, তোমার পায়ের কাছে নিচু
হওয়ার সৌভাগ্যটুকু আশাতীত মনে হয়েছিল।
এর বেশি স্বপ্ন নেই। ছিল না কখনও, একতিলও।
কবিতা আমার সত্য। তুমি সেই কবিতায় শ্রেয়
কবিতার অঙ্গীকারে কিছু নেই তোমাকে অদেয়;—
তবু ... কবি, ... এ যে বড় পাপ!

অমৃত ।। পাপ যদি হয় তবে সে আমার। তীব্র অভিশাপ
আমার ললাটে দিক আগুন জ্বালিয়ে। ছারখার
হয়ে যাক আর সব। পুড়ে যাক সমাজ, সংসার।
আমার জীবন জুড়ে অশান্তির দাউ দাউ চিতা
জ্বলে তো জ্বলুক। তবু তুমি এস, আমার কবিতা!
এস, আজ সশরীরে স্পর্শ করো আমাকে, প্রেরণা—
এ তোমার পাপ নয়। এ তোমার করুণা ... করুণা ...

● **বলতে বলতে অমৃত উপাসনাকে চুম্বন করে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।**

দৃশ্য : ১০

● **মঞ্চ ফের আলোকিত হয়ে ওঠে। অমৃতর ঘর। সে ভূমিতে এলিয়ে বসে আছে খাটে হেলান দিয়ে। তার একটি উত্তোলিত জানুতে কপাল ছুঁইয়ে বসে আছে উপাসনা। উভয়ের পোশাক এলোমেলো। উপাসনার নীল ওড়না পড়ে আছে খাটের মাথার কাছে।**

মুকুলের প্রবেশ। প্রথমে সে কিছু খেয়াল করে না। টেবিলের ওপর কাঁধঝোলা রেখে তার থেকে কিছু বার করতে থাকে।

মুকুল ।। দরজাটা তো খোলাই পড়ে ছিল
সারা দুপুর, আমি যাওয়ার পরে।
এমনকী ঐ বারান্দাটার গ্রিলও
তালাবিহীন। সবাই যে যার ঘরে।
—এমন কিন্তু করাটা ঠিক নয়।
এখন এত চোর-ডাকাতি হয় ...

● **অমৃত নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু উপাসনা মূর্তির মতোও নিঃস্পন্দ। মুকুল এবার লক্ষ্য করে তাদের দিকে। সেও স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।**

মুকুল ।। ক্ষমা করবেন কবি ... এমন সময়ে
বুঝেছি আমার আসা উচিত হয়নি ... এই ঘরে ...
আমি যাই—

অমৃত ।। না, দাঁড়াও! অযথা বিনয়ে
ঘৃণাকে আড়াল করে লাভ নেই বুকের ভিতরে!

● **মুকুল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উপাসনা ধীরে ধীরে তার পাশ দিয়েই বাইরে চলে যায়। তার ওড়না পড়ে থাকে। মুকুল তার দিকে তাকায় না।**

অমৃত ।। মুকুল, জানি না, এর ক্ষমা আছে কিনা। হয়তো নেই।
এই অপরাধী আজ দাঁড়িয়েছে তোমার সামনেই।
তীক্ষ্ণতম শাস্তি দাও, দাও হিংস্র ঘৃণা, তবু শোনো—
একমাত্র কবিতার কাছে আমি কোনও দিনও কোনও
অন্যায় করিনি। আমি সত্যবদ্ধ শুধু তার কাছে।
আমার বিবেক শুধু কবিতায় বিক্রি হয়ে আছে।
আমি জানি উপাসনা তোমার প্রেমিকা, প্রিয়তমা।
সে আমার কাম্য নয়। জানি আমি ... সে যে কন্যাসমা,

কারণ, ... মুকুল, আমি তোমাকে মানস-পুত্র মানি,
অথচ, কী করব আমি! আমি তাকে দেখামাত্র জানি
এ আমার সেই মেয়ে ... আজীবন আকাঙ্ক্ষার নারী,—
যে মেয়েকে একটিবার স্পর্শ করে মরে যেতে পারি ...

মুকুল ।। একটি শুধু প্রশ্ন আছে কবি ... এ কি চেয়েছিল সেও?

অমৃত ।। সে শুধু জানিয়েছিল কিছু নেই আমাকে অদেয়—

মুকুল ।। বেশ! তবে আমারই বা কী বলার আছে!
কোনও দোষ নেই কোনও হৃদয়ের কাছে।
আমার যা ভেঙে গেছে তা থাক আমারই—
কোন্ অধিকারে অভিমানী হতে পারি?
ঘৃণা নয়, রেখে যাব কবিতার খাতা,
ছিঁড়ে যাক, উড়ে যাক, ঝরে যাক পাতা।
কবিতা জীবন ছিল,—পুষ্টি, জল, বায়ু।
অকস্মাৎ আজ যেন সেই পরমায়ু
বড় বৃথা মনে হয়। সব মিথ্যা লাগে!
নিজেকে এমন রিক্ত ভাবিনি তো আগে!
(তার কবিতার খাতা বার করে অমৃতর পায়ের কাছে রাখে)
এ যদি জীবন হয়, এ জীবন আপনারই হোক।
আমি বীতরাগ, বীতশোক —
তোমারি দেওয়া এ প্রাণ ফিরিয়ে দিলাম তোমাকেই।
আর কোনও বন্ধন নেই।

● **মুকুল চলে যায়। অমৃত নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে একা। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।**

দৃশ্য : ১১

● **মঞ্চ অন্ধকার। অমৃতর স্ত্রীর প্রবেশ।**

স্ত্রী ।। আমাকে কি পাগল করে দেবে!
দরজাটা সেই খোলাই পড়ে আছে!

একাই আমি মরব কেবল ভেবে
আর তুমি ঠিক চলবে নিজের ধাঁচে।
আলোটালোও নেই নাকি এই ঘরে,
অন্ধকারে যেন ভূতের বাড়ি—

● সুইচ হাতড়ে হাতড়ে আলো জ্বালিয়ে দেন তিনি। দেখা যায় অমৃত মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার একহাতে ফল কাটার ছুরি। অন্য হাত ক্ষতবিক্ষত। জামা কাপড়ে রক্ত। কণ্ঠে অস্ফুট গোঙানি। স্ত্রী ছুটে এসে তার পাশে বসেন।

স্ত্রী ।। (ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে)
টুনি, টুনি! দৌড়ে যা ওপরে
কাকিমাদের ডাক দে তাড়াতাড়ি—

● স্ত্রী অমৃতর উপর ঝুঁকে পড়েন। টুনির সঙ্গে দু'তিনজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। একজন ডাক্তার। তিনি স্টেথো দিয়ে অমৃতকে পরীক্ষা করেন। সবাই সবার সঙ্গে মূকাভিনয়ে কথা বলে। দৌড়াদৌড়ি করে। দু'জন একটি স্ট্রেচার বহন করে নিয়ে আসে ও অমৃতকে তুলে নিয়ে যায়। স্ত্রী সবার শেষে বেরোতে গিয়ে দেখতে পান নীল ওড়নাটা। শয্যার ওপর থেকে তুলে নিয়ে সেটা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকেন চিত্রার্পিত হয়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।

দৃশ্য : ১২

● উপাসনার ঘর। সে দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। মায়ের প্রবেশ। তাকে ডাকতে গিয়ে দ্বিধা করেন। তারপর তার কাছে গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করেন। উপাসনা সাড়া দেয় না।

মা ।। উপাসনা, একরত্তি মেয়ে,
এত দুঃখ ভাগ্যে ছিল তোর!
তোর ও-মুখের দিকে চেয়ে
বিন্দুমাত্র মায়া হয়নি ওর—
এ কেমন কবির হৃদয়!
তবু এই দুঃখকেই জয়
করতে হবে, মেয়ে! উঠে দাঁড়া।
বিষাদের বোঝাটাকে নাড়া।

(উপাসনাকে ছেড়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে আসেন)
আমি তো বিশ্বাস করি যাকে তুমি জানো সত্য বলে—
শুধু সেই পথে হাঁটো। লোভে পড়ে, মিথ্যা মোহে ভোলে
এমন মেয়ে তো তুমি নও! তবে তোমার কী দায়!
যা হওয়ার হয়ে গেছে। মন থেকে গ্লানিকে বিদায়
দাও মেয়ে। উঠে এস। এ জীবনে থেমে থাকতে নেই।
যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা ফেলে রেখে এস পিছনেই।
(তিনি উপাসনার কাছে যান আবার)
জানি মেয়ে, বহু কিছু ভেঙে গেছে। ভেঙে যাবে আরও।
তবুও নিজেকে তুমি ভেঙে যেতে দিও না একবারও।
মুকুলের সঙ্গে আর দেখা হয়তো না-ই হতে পারে,
সে তোমাকে ছেড়ে গেছে অবিশ্বাসে। একা, অন্ধকারে।
আর যিনি কবিশ্রেষ্ঠ, কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তিনি
ধ্বংস হতে চলেছেন।— প্রেমের কী ব্যর্থ বিকিকিনি!
তুমি প্রতারক নও। তোমার কলঙ্ক নেই কোনও।
সত্যকে বিশ্বাস করে কেউ জেনো হারে না কখনও ...

● **উপাসনা উঠে দাঁড়ায়। ফেরে সামনের দিকে। তার হাতে একটি কাগজে কিছু লেখা।**

উপাসনা ।। না মা, আমি হারিনি তো! দ্যাখো, আমি জিতে গেছি ঠিক।
ফের একা হয়ে গেছি। যারা ছিল বন্ধু বা প্রেমিক,
তারা তো হারিয়ে গেল। সরে গেল কাব্য থেকে দূরে।
কবিতা কোথায় যাবে? হাত থেকে হাতে ঘুরে ঘুরে
সে বুঝি বেড়াবে কোনও বাউন্ডুলে হয়ে? এলোমেলো?
না, মা, দ্যাখো! ও যে আজ আমারই বুকের মধ্যে এলো!
আমার কলম থেকে শব্দ হয়ে ঝরে পড়ল নিজে,
আমার দু'হাত আজ আমারই বৃষ্টিতে গেছে ভিজে।
হৃদয়ের কূপ থেকে উথলে উঠল যন্ত্রণার জল,
কী করে সে মুক্তি পেল কবিতায়—এ কী মন্ত্রবল!
**(সে সামনের দিকে তাকিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে দেয়।
তার মুখে আলো পড়ে)**

এস দুঃখ, এস সত্য, এস মুক্তি, এস শব্দধারা
যারা লেখে, যারা লিখবে, বা অতীতে লিখে গেছে যারা—
তাদের সবার সৃষ্টি একই সঙ্গে একমুখী হয়ে
কী অমোঘ বেগে চলে সত্যসমুদ্রের দিকে বয়ে!
আজ থেকে আমিও সে যাত্রাপথে সাহসী পথিক,
পথ ভুল হতে পারে। ভুল হয়ে যেতে পারে দিক।
তবুও এগোব আমি। পেয়ে গেছি জীবনের মানে,
সে সত্য জানিয়ে যাব আমার জীবন যাকে জানে।

● **উপাসনা মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়। দু'জন দু'জনের কাঁধ স্পর্শ করে। আলো এসে পড়ে তাদের ওপর, তাদের মুখে।**

উপাসনা ।। আমার এ কবিতার তুমি হবে প্রথম পাঠক,
তুমিই প্রথমতম শ্রোতা।
বেদনা-কর্ষিত মাঠে কবিতা-রোপণ শুরু হোক,
ফসলের সতেজ নম্রতা
ছোঁব। তার ঘ্রাণ নেব। সে শস্য ছড়াব পৃথিবীতে।

কবিতার বীজপত্র অঙ্কুরিত নতুন কবিতে।



**এই কাব্যনাট্যের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাপট কাল্পনিক।
বাস্তবের সাথে তার কোনওরূপ সাদৃশ্য সম্পূর্ণ কাকতালীয়।**

অসংকলিত কবিতা, কাব্যনাটক, সংলাপকবিতা

সূচি

কবিতার ভাষা নয়

কবিতার ভাষা নয়, কবি খোঁজে শুধু তার ভাষা...

অদ্যাবধি প্রেম নেই। নেই, তাই বিশ্বাস করলাম
গলিত যৌনতা নিয়ে মর্মভেদী মেঝেতে গড়াব।
গড়াতে গড়াতে যাব সীমান্তেরও পরবর্তী ধারে
যেখানে শব্দেরা মৃত। শুধু শবেদের ভাষাহীন
চোখ থেকে চোখে খুঁজব জমে থাকা ঠাণ্ডা আর্তনাদ
সেসব কবিতা নয়, জানি। আমাকে কি কবি বলে?

কবিতার ভাষা নয়, আমি খুঁজি আমার ভাষাকে...

কাচের ওদিকে

জলে পড়ে গেছে যে প্রতিবিম্ব
কী করে চিনব তার ভাঙা মুখ!
তার উৎসুক ভঙ্গুর ঠোঁটে
ব্যথা-বিস্ফোটে সফেদ ক্ষরণ—
কী বিস্মরণ! কতদিন আগে
ওই ব্রণদাগে আঙুল রেখেছে
আর ভিজে গেছে তোমার দু'হাত।
আজকে হঠাৎ অলীক স্পর্শ
আলোকবর্ষ পার হয়ে আসে
মাঝখানে ভাসে আকাশগঙ্গা
সহসা সংজ্ঞা ডুবে যায়, ডোবে,
সাগরে, বাড়বে। জলে ও জ্বলনে
কী প্রতিফলনে তাকে ছোঁয়া যায়!

ও মুখ কোথায়? জলের ওপাশে
ছায়াছবি ভাসে। ঐতিহাসিক।

ওই মুখে ঠিক সেই দাগ আছে
চিবুকের কাছে, প্রত্নপ্রতিম।
জল জমে হিম, কঠিন বরফে
প্রাচীন হরফে আঁকা কার ছবি?
ও তো সেই কবি, ও তো সেই জন
যাকে চুম্বন— রুদ্ধশ্বাস
এত ইতিহাস গঠন করেছে!
জলে পড়ে গেছে, জল কী জমাট!
কাচের কপাট খিল আটকানো...
যন্ত্রণা, জানো! কাচের ওদিকে
যখনই কবিকে খুঁজি দুই ঠোঁটে
ভেসে ভেসে ওঠে আমারই আদল
আমিই কেবল, আর কেউ নেই
এমনকী সেই চেনামুখও নয়...

মুহূর্তরা

মুহূর্তগুলিকে আর কারাগারে রাখা অসম্ভব
ওরা অতিকায়
স্তব্ধতাকে কী প্রবল নাড়া দিয়ে গেল নাভিশ্বাস
এত অসহায়,
চোখের সমুখে দেখি খণ্ড রাত, খণ্ড দ্বিপ্রহর
ছিন্নভিন্ন ... নাচে;
দম রাখা অসম্ভব। ও মুহূর্ত, তোর নাভিশ্বাস
মুখের কী কাছে!
মুখ বন্ধ মুখ বন্ধ মুখ বন্ধ রাখ্ মুখপুড়ি
বন্ধ রাখ্ শ্বাস
অতিকায় মুহূর্তরা ভেঙে ফেললে গরাদ, ফুসফুস
তখন পালাস ...

শরীর জুড়ে কান্নাসিঁড়ি

শরীর জুড়ে কান্নাসিঁড়ি
দুঃখ নামে বন্যা হয়ে
সিঁড়িভাঙার অঙ্ক জেনেও
পা রেখেছ পিছল ধাপে!
পা রেখেছ হৃদয় খুঁজে
হৃদয় তো নয়, অগ্নিপাথর—
পাথর ভাঙো কান্না দিয়ে।

মধ্যে মধ্যে পাথর ভাঙে
পাথর ভাঙে মাথার মধ্যে
বুকের মধ্যে হৃদয় ভাঙে
হৃদয় তো নয়, ফসিল সময়
ভাঙতে ভাঙতে ধুলোয় ধুলো

শরীর জুড়ে কান্নাসিঁড়ি
ঋজু কি আজ ভাঙতে এল?

ঋজু ও ঈশ্বর

আমার এক হাতে ঈশ্বর।
অন্য হাতে ঋজুকে ছুঁয়েছি।
এরা দু'জনেই আমার ঘরে যাওয়া আসা করে।
আমার কথা ভাবে এরা দু'জনেই।
আমি কিন্তু একজনকে ভাবি।

ঋজু তোমার কাঁধের অলিন্দে
মুখ রেখে দেখব স্বর্গের বাগান।
সরোবর আছে, সরোবরের তীরে ছাতিমগাছ
পুঁতেছে ঈশ্বর।

আর মাঝখানে উড়ছে স্বর্গের পতাকা।
স্বর্গের পতাকার রং নীল তো? ঋজু
আমার একটা নীল নীল ধনেখালি আছে।

কিছুদিন পরে মায়ের মতো আমারও শাড়িতে
মা মা গন্ধ দেবে ঈশ্বর, (অথবা তুমি?)
ছাতিমগাছের ছায়ায় আমার আঁচল, —
সেখানে দুটি শিশু খেলা করে,
ঋজু ও ঈশ্বর।

আয় তোকে দুঃখ বলি

আয় তোকে দুঃখ বলি।
তুই যেন ঠিক সেই লোক
আদিগন্ত মেঘলা হয়ে এমন গোধূলি
যার জন্যে হা-পিত্যেশ করে।

আয় তোকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটি
ফাঁকা ফাঁকা পুরনো রাস্তায়।
চেনা লোকে যে দ্যাখে দেখুক।

তুই আমি এই খোলা আধো অন্ধকারে
পরস্পরকে হৃদয় দেখাব।

করঞ্জাফুল

চৈত্রমাসে তোমার সঙ্গে দেখা।

করঞ্জাফুল ঝরেই গেল,
চোখের কোণে রক্তাভ মেঘ

ঘনায়, যেন কালবোশেখি!
উড়ালো খড়, পুড়ালো ঘর,
করঞ্জাফুল, এমনি ঝড়ে
ঝরতে বুকে বৃষ্টি জমে?

চৈত্রমাসে হলকা গরম
করঞ্জাফুল, বৃষ্টি ডাকো—
ঝড়কে ছুঁয়ে এবার বলো
শুকনো পাতা, আলগা বসত
আমায় পরম নিঃস্ব করে
উড়েই গেল, পুড়েই গেল ...

কাঁদব কখন তোমার কাছে একা?

বিশল্যকরণী

আজকাল এই এক অসুখে ধরেছে। এ অসুখ, মনে পড়বার। সারাদিন ধরে শুধু মনে পড়ে সেইসব কথা, যার মধ্যে বেশিটাই কখনও ঘটেনি বাস্তবে। মনে পড়ে একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা। ভিজে ত্বক ফুঁড়ে নেমে যাওয়া ব্যাকুল বিদ্যুৎ। পায়রার লাল ঠোঁটে ভরে দেওয়া ভুট্টার দানা, একটা একটা করে। সমুদ্রের ধারে বসে বালিতে আঁচড় কেটে লেখা কী যেন কী...

অথচ আমি তো সেই ছেলেটির সাথে সমুদ্রে যাইনি সত্যি, ভিজিনি বৃষ্টিতে, দেখিনি পাখির ঠোঁট!

আমি যেন ভেসে গেছি দুরারোগ্য ঘামে। এই ঘরে এসেছিল কে এক স্বজন, কাকের ডিমের রং জামা। বিশল্যকরণী পাতা রেখে গেছে আমার দু'চোখে...

কে সে? কার কথা মনে পড়ে?

যদি না মনে হয়

যদি না মনে হয় এখন খুব ভালো আছ
চলে এস।

তোমার নিচু খাট, তোমার মুড়ে রাখা বই
কেমন আছে ওরা? কেমন আছে ছেঁড়া পাতা
আমার হাতে লেখা তোমার বলে যাওয়া প্রেম...
বলে কোথায় গেলে! এ তো না বলে চলে যাওয়া
দুপুর ফেলে রেখে অথৈ বিকেলের দিকে
বিকেলে ছুঁতে নেই, বিকেল এত দূর পথ...

এখনও একা আছ? নাকি নতুন কোনও রোদ
এসেছে, এসে গেছে আমার ফেলে আসা মাঠে?
আবার নিচু খাট, আমার মুড়ে রাখা বই
আবার ছেঁড়া পাতা, আবার সুরে ওঠানামা
আবার কী দুপুর! আবার ও দুপুর, তুমি—
কে বলে যাও যাও, আমার যাওয়া নয় যাওয়া ...

যদি না মনে হয় এভাবে খুব ভালো আছ
চলে এস....

পরিত্যক্ত

সমস্ত পার্থিব দুঃখ তোমার বুকের কাছে রেখে
চলে যাব সেই পথে, যে পথ হারিয়ে গেছে বেঁকে
চলে যাব মুক্তকেশী, মুক্তপ্রাণ, স্খলিত বন্ধন
অন্ধকার শুষে নেবে যাবতীয় তরল ক্রন্দন
পারো যদি ভেবে দেখো কী কী ছিল পুণ্য, কী কী পাপ
পারো যদি খুঁজে দেখো অভিমানী ব্রাত্য পদছাপ
তোমার উঠোনে তার স্থান নেই — এই কথা জেনে
সে গিয়েছে বিপরীতে, নির্জনতা ভবিতব্য মেনে

যদিও তোমার বুকে পড়ে নেই তেমন অভাব
স্মৃতি, — সে তো হৃদয়ের ভাঙাচোরা পুরনো আসবাব
তোমাকে মানায় শুধু যন্ত্রণার শিল্পকলা গড়া
কেলাসিত দুঃখ নিয়ে অলস উদাস ফেলাছড়া

তবু যদি অন্ধকার নেমে আসে পরিত্যক্ত বুকে
সমুদ্রের আঁশটে গন্ধ টের পাবে গভীর অসুখে ...

যাকে ভালোবাসি, তার সঙ্গে

যাব আমি
পারানির কড়ি গোনাগুনি না করেই
চলে যাব।
এই তো রাস্তা, খুব সোজা নয়,
ধানকাটা শালুকখালির বিল—
মাথার উপর ঠা ঠা রোদ্দুরকে
ছেলেভুলোনো গল্প বলতে বলতে বলতে
আর পশ্চিমে ঠেলতে ঠেলতে চলে যাব।

অনেককে অনেক কথা দেওয়া হয়ে গেছে।
মনে রাখব না।
তোমরাও মনে রেখো না।
আসলে বড় বেশি দুঃখ
ফেলাছড়া হয়ে গেছে,
যেতে আসতে কুড়িয়ে তুলতে, ঝাড়তে ঝুড়তে
আমার নিজের জন্যে বেশ কিছু সময় দরকার।
বিনাকারণে বড় বেশি
দেওয়া নেওয়া হয়ে গেছে প্রাণ

এবার ওরা আমার সিঁড়িতে বসে থাক যতদিন পারে,
তাতে আমার কী!

ছি, খারাপ মেয়ের জন্যে অমন মনখারাপ করে না।
আমি ছাদের উপর থেকে লাফ মেরে
পশ্চিমে সুয্যি ডোবার ঢের আগে আগে
ভালোয় মন্দয় পার হয়ে চলে যাব শালুক্‌খালির বিল—
তাতে তোমাদের কী!
এলোমেলো হিসেবের খাতা ছিঁড়ে গেল
আসলে, আমি যাকে ভালোবাসি
তার সঙ্গে চলে যাব।

চারপাশে কিচ্ছু না ভেবে
অনেক কথা বলা হয়ে গেছে,
ভালোবাসা কুড়োতে গিয়ে আদেখলা তাড়াহুড়ো
গুঁড়োগাড়া জমেনি বিশেষ।
তোমাদের কিছুই দিয়ে উঠতে পারতাম না বস্তুত,
এবার কোনও
নির্জন ধসনামা খাদের পছন্দমতো খাঁজে
খোলামেলা, উদোম-গা শিকড়বাকড়ের কাছে
ভালোবাসা শিখতে চলে যাব।
কথা দেওয়াদেওয়ির মধ্যে আমি কোনওকালে নেই
ভুল করে অনেক উলটোপালটা
ডাকাডাকি করা হয়ে গেছে
কিন্তু আমি এমনকী সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পিছনে ফেলেও
পালাতে জানি, কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে।
তোমাদের কেন ভালোবাসিনি বলে
আমায় মেরে ফেলতে চাও মারো, কিন্তু
শালুকখালির বিলে লেজঝোলা ফিঙে সাক্ষী—
আমি চলে যাচ্ছি, আমি
যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

মাথায় কেন জল দিলে না

মাথায় কেন জল দিলে না
পেতেছিলাম কাঙাল মাথাখানি
আমায় কেন কোল দিলে না তুমি?
মাথায় কেন জল দিলে না,
শুকনো চুলে লাগল দাবানল
দৌড়ে বেড়ায় মরিয়া কেশকীট,
তবুও কেন জল দিলে না
দেখছ আমার অসীম উচাটন
ঝাঁকাই মাথা, ঝাঁকাতে চাই স্থিতি
তোমার কাছে হলাম নতজানু —
মাথা গোঁজার কোল দেবে না তুমি?

ঝর্নাকলম

ছিটকে ছিটকে কবিতা উঠেছে
আমার ভিতরে কবিতাকে রেখে যাও
শরীরে ঝর্না, ঝর্নাকলম, কী গরম এই
ছেঁড়াখোড়া পৃষ্ঠাও!

এখনই থেমো না, কবিতা আসছে, অক্ষরগুলি
কী ভাষায়, কোন্ লিপি?

আহা কী খনন, সমুদ্র উঠে আসে
জলে ডুবে যায় চূড়াময় সব দ্বীপই...

রাঙাফিতের একটি বিকেল

সারা রাস্তাই পাশে ছিলে তুমি, তোমার বিকেল—
সিনেমা, ক্রিকেট, রেশনের চিনি, কেরোসিন তেল ...
ভাবছিলে এইসব। রাঙাফিতে মাটিতে লুটায়।
সাড়ে চারটেয় কথা ছিল, এলে সাড়ে পাঁচটায় !

বিকেল গড়িয়ে গেলে রাঙাফিতে মুছেছিল নাক,
তুমি বলেছিলেঃ এইবার তবে বাড়ি ফেরা যাক।

শীতের মেলায় শেষ হয়ে গেল মাদারির খেল...

টানা রিকশায় পাশে বসে ছিল বিরূপ বিকেল।

মুখচোরা

কার্নিশে উড়ে এল মুখচোরা পাখি,
কাকভোরে।
তোমাকে জাগাবে বলে;
নাম জানাবে না, শুধু
নিয়ে যাবে ঘুমভাঙা আঁখি—
কার্নিশে বসে ছিল রাতজাগা পাখি,
চুপ করে।

পাখি তুই কেন বল এত মুখচোরা
মিছিমিছি!
জানলায় এসে বোস,
চুপিচুপি ঠোঁটে করে
জানলার পর্দাটি সরা—
দেখে ফেলে বলে যদি বলুক না ওরা
‘এমা ছিছি’।

ধ্বনির দরজা

কতদিন হয়ে গেল, আমি শুধু একটা
ধ্বনির দরজায় বসে আছি।
তোমার সমস্ত উচ্চারণ,
যা কিনা আমারই জন্যে একটু একটু করে
ফুটিয়েছ বিভিন্ন সময়ে—
সেই সব বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে ও কোন্ রাত্রিচর,
ওর দুই হাত দগ্ধ কেন?

ওইসব আমি দেখব না, কিছু দেখব না।
মৃত্যুর আগে শুধু শুনে যাব প্রিয়সম্বোধন!

এখনও আমি সমস্ত প্রাণবায়ু
এক করে বসে আছি,
স্মৃতির প্রাচীন জলাশয়ে
যন্ত্রণারা মাছের মতোন ঘোরে ফেরে।

শুধু একটা ধ্বনির তরঙ্গ পাঠাও
ওরা মরণের দিকে লাফিয়ে উঠুক।

তুমি বলেছ

আকাশে থমথমে মেঘ করে এল,
আর আমি ছুটে গেলাম তোমার জানলায়
বৃষ্টি আসবার খবর দিতে।

তারপর থেকে এমন হলো,
যখনই মেঘ করে, তোমার জানলায় ছুটে যাই—
আমার আঁজলা থেকে টুপটাপ
ঝরে পড়ে বৃষ্টির মতো মনখারাপিরা।

একদিন যখন সব মেঘ কেটে যাবে,
আমি রোদ্দুর হয়ে যেতে চাই তোমার জানলায়
এবং ভিতরে এসে বলতে চাই তোমার চোখ ছুঁয়ে—
দ্যাখো, শেষ পর্যন্ত তোমার কথাই সত্যি হলো!

যে রক্ত তরলমাত্র নয়

সন্দেহ করেছে সব লোকে
বরাবর, প্রতি পদক্ষেপে
ছলকাতে দেখেছে সর্বনাশ
অনুচিত এবং অথৈ
আমার চিহ্নিত চোখেমুখে।

আমিও কি করিনি সন্দেহ
নিজেকেই! যখন দেখেছি
ভালো লাগছে অসহ্য, তোমার
আঙুলাগ্রে ঈষৎ রক্তাভা...
রক্তময় অজস্র আঙুল
ছুঁতে চাইছে তোমার পল্লব,
পল্লবিত শরীরে, সংকেতে
ফুটে উঠছে সন্দিহান ফুল

দেখি, পায়ে বিঁধেই গিয়েছে
তীক্ষ্ণধার ভুলভাঙা কাচ
এত রক্ত ঝরেছে কখনও
আগে, তুমি দেখেছ পাগল!
এ রক্ত তরলমাত্র নয়
দু'চোখের শিরা রক্তময়
আঙুলেরও শিখা রক্তময়

ফিনকি দিয়ে ভুল ছুটে যায়
এই চোখ থেকে ওই চোখে।
ফিনকি দিয়ে উঠেছে সন্দেহ

রক্তকে মরণচিহ্ন ছাড়া
কী আর বুঝেছে অন্যলোকে!

তীর্থ

তোমার শরীরে যেই তাকিয়েছি
হৃদয়ে হৃদয়ে সেই যোগাযোগ
উঁচুনিচু পথ উঁচুনিচু পথ
পথে রোমাঞ্চ, পথে দুর্ভোগ

একটি চাহনি, অনেক আকাশ,
আকাশের নীচে পর্বত, মাঠ—
ভ্রমণপিপাসু ছিলাম না, শুধু
খোলা ছিল এই পুবের কপাট

তোমাকে দেখেছি জানলা পেরিয়ে
দূরে, এত দূরে, অপ্রতিরোধ্য—
উঁচুনিচু পথ হেঁটে এসে দেখি
স্বর্গ আমার মুঠোর মধ্যে!

তীর্থ! তীর্থ! সারা সংসার
হারিয়ে এসেছি ক্ষমাহীন বাঁকে

স্বর্গ আমার দু'পায়ের নীচে
স্বর্গ আমার দু'পায়ের ফাঁকে।

রক্তচাপ ১৯৯৮

১.
যখন চেতনা ফিরে আসে
আঙুলের শীর্ষে ফের জড়িয়ে যায় জটিল সংখ্যারা
তোমারই তো সংখ্যা, যারা সদাব্যস্ত থাকে
গার্হস্থ্যে অথবা প্রেমে
ক্ষরণে ও উচ্চরক্তচাপে
রক্তচাপ রক্তচাপ, গলা শোনা বারণ আমার
রক্তপাত রক্তপাত, তাই শুধু এই মাত্র শুনি
কারা এসে বলে গেল : আজ দুই তিন ফোঁটা হবে
পত্রপত্রিকায় দেখি তুমি ভাসছ রক্তগঙ্গায়

২.
চেতনা বিলুপ্ত হলো, লুপ্ত হলো চার ... এক ... তিন ...
মধ্যরাত মধ্যরাত, কোন্ সংখ্যা বারণ আমার?
সংখ্যার ওপরে সংখ্যা উঠে দ্যাখ শূন্য কত বড়
শূন্য কত শক্তিশালী শূন্য কত মহাভার শূন্য এত
উঁচু কেন হবে
আরও উঁচু রক্তচাপ, আরও উচ্চে মস্তিষ্ক ... প্রলাপ ...
আমার এবং তার আর তার অন্য সকলের
সমস্ত আয়ত্তে রাখো, রাখা চাই, রাখতেই তো হবে—
(শূন্য উঁচু শূন্য ভালো শূন্য তুমি পাপ-অপেক্ষা শ্রেয়)
তিক্তপাপ তিক্তপাপ, মুখ দেখাও বারণ আমার

৩.
সংখ্যা থেকে অসম্ভব সংখ্যাতীতে
লাফিয়ে চলেছে রক্ত, ওরাও কি শূন্যে উঠতে চায়।
শিরা ছিঁড়ে, মাটি ছেড়ে, আবহমণ্ডল ভেদ করে
ছুটে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে নেমে আসছে
শীর্ষাসনে উলটে যাচ্ছে ছটফটাচ্ছে স্তম্ভ ফাটোফাটো
শোনিতস্তম্ভকে কারা লক্ষ্যভেদে টুকরো করে তারা দক্ষ
তারা সব জানে

আমিও জানিতভাবে বিদ্ধ হই, চূর্ণ হই,
জাহাজ আছড়িয়ে ফেলি বাতিস্তম্ভে সিঁড়িতে চৌকাঠে
ফুটপাতে রক্তচাপ, চাপ চাপ রক্ত, ঢেউ,
ঢেউ গুনি ঢেউ ... এক ... দুই ...

৪.
বন্ধচোখ বন্ধস্মৃতি বন্ধশ্বাস স্থবির গুহায়
মধ্যরাতে ফিরেছে চেতনা।
ব্যস্ততা-রহিত হয়ে ঝনরঝন বেজে উঠছে ধ্বনি
আর্তনাদ আর্তনাদ আর্তনাদ আরও আর্তনাদ
সাড়া নেই জেনে তবু চেতনা বিদীর্ণ করছে ডাকে
ডাকতে ডাকতে রক্ত উঠছে ঝনরঝন শোণিতকণিকা
ঘুরছে ভাসছে, হারাচ্ছে না, চতুর্দিকে জ্বলে উঠছে তারা
মধ্যরাত মধ্যরাত, আলো জ্বালব এখনও কি আলো
জ্বালালে বাঁচানো যাবে এখনও কি তাহলে এখনও
বিন্দু বিন্দু আলো আর বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে
বাকি আছে ঘুমন্ত কপাল ...
অন্ধকার অন্ধকার, ভোর কত দূরে কত দেরি কত
ঘন্টা ... এক ... দুই ...
ছুটে যাচ্ছি নেমে আসছি রাত ভেঙে নিষেধাজ্ঞা ভেঙে
গন্ধরাজ গন্ধরাজ, ফিরে যাওয়া বারণ আমার

সমুদ্রস্নান

সুখ জাপটিয়ে ধরেছি
আমাকে
সুখ জাপটিয়ে ধরেছে
আমার
উপরে ও নীচে কলকল করে সুখ

বালিতে আছড়ে ফেলেছি
আমাকে
বালিতে আছড়ে ফেলেছে
ঢেউয়ের
মাথায় চড়েছে ফেনা ... উদ্গত ফেনা...

ফেনায় দু'চোখ অন্ধ
আমরা
গড়িয়ে যাচ্ছি গভীরে
যেখানে
বালি সরে গেছে, ওৎ পেতে আছে নীল

নীল কী ভীষণ ঠাণ্ডা
অথচ
নীল কী ভীষণ গরমও
আমরা
ডুবছি আমরা আর নিঃশ্বাস নেব না ...

যৌথ

শোনো বলি, এমন কী দোষ ছিল এতে,
এই প্রেম তোমারও কি নয়?
কষ্ট-আহরণ, সমবেত মাধুকরী
খুঁদকুড়ো নিহিত সঞ্চয়।

কাদামাটি, আধখানা চাঁদ, আরও যা যা—
আঙিনা সবুজ করা ঘাসে
তোমারও কি নয় এই সনাতন ভূমি
পর্যটনে, কিংবা বসবাসে?

ইছামতী

এখানে তো তুমি আসতে পারো।

এখানে নিবিড় ইছামতী
উত্তরে আঁচলখানি পেতে
পা মেলেছে ভাঙনের দিকে।
শিয়রের কাছে নলবন,
ভারী ঘুম হতে বাষ্প উঠে
গড়েছে নিথর স্তূপমেঘ

স্বপ্ন হয়ে ঝরেনি এখনও
এখনও কাঁপেনি ইছামতী

এখনও তো তুমি আসতে পারো?

তোমাকে এ পার্থিব হাতে

এ সমস্ত কষ্ট নিয়ে ফিরে আসি
মনে হয় ছোঁয়া অসম্ভব
তোমার দূরের হাত।
বহুদূর টেবিলের প্রান্তদেশে
ভেসে আছে দুধশাদা শার্ট,
সুভাঁজ জামার হাতা ...
স্বাভাবিক কথা বলে হেসে ওঠো
ভেসে থাকো লুকোনো ডানায়।
টেবিল সমুদ্র কোনও
মাঝখানে বিস্তৃত লবণাক্ত জলে
ভরে গেছে তিনতলার ঘর,
ওঠার সময় হয়,
তাকাতে পারি না সবিশেষে।

ওই কোণে দুধশাদা শার্ট
কোন্ দিকে চেয়ে আছে?
অসুন্দর এই মুখ নিচু রাখি।
এ সমস্ত অলৌকিক ছবি
আমার উদ্দেশ্যে নয়

শ্লথ পায়ে নেমে যাই সিঁড়ি বেয়ে।
কোনওদিনই তো ছুঁতে পারব না
তোমাকে পার্থিব হাতে!

চুম্বনপদ্ধতি

চুম্বনের কালে চোখ বন্ধ হয়ে আসে।
পুনর্বার চোখ খুলতে কেটে যায় অনেক বছর।

ততদিনে বদলে যায় প্রেমিকের মুখ,
ভয় হয়।

ঠোঁটদুটি একই রেখে বদলে যায় চোখ।
এ চোখ সে চোখ নয় যাকে আমি ... যাকে আমি ... আঃ—

আর আমি ততদিনে চুমু খেতে শিখি চোখ খুলে।

পারো তো চলে এস

পারো তো চলে এস, আমার গুহামুখ খুলে দাও
যদিও দুর্গম, যদিও কী পিছল! আলো নেই
ভেতরে থরে থরে জমাট ঢেউ, তবু নদী কই!
পারো তো চলে এস, আমার নদীমুখ খুঁজে নাও।

ব্যথা

সে এসে বিষণ্ণ বসে ছিল
ভালোবাসা যেরকম বসে
মনে হলো কিছুটা কাহিলও
হয়ে গেছে গোপন তাড়সে
তবুও সে নতমুখে ছিল
ভালোবাসা যেরকম থাকে
ঠোঁটের ওপরে ছোট তিলও
মুখ তুলে দ্যাখেনি আমাকে

ফাঁকা ঘর, দরজাবন্ধ ঘর
হালকা আলো, সে ও আমি একা
অবশেষে, কতক্ষণ পর
চোখে চোখ পড়ল, হলো দেখা
তার চোখে কষ্ট লেগে ছিল
কষ্ট কাঁধে মাথা রাখতে চায়
কাঁধ তার মাথা টেনে নিল
অজানিতে, যেন নিরুপায়!

তারপর কী জানি কী হলো
কে যে হেরে গেল কার কাছে
নিজেকে বলেছি : সব ভোলো
বৃন্তে তবু ব্যথা লেগে আছে

ট্রেন ধরবার রাত

বড় দ্রুত এই যান, তার চেয়ে হাঁটো;
আমার দু'পাশে পল অনুপল কাটো
এক এক করে, অতি ধীরে, আরও ধীরে
শেষ হয়ে গেল? চলো ফের যাই ফিরে

কোথা থেকে যেন শুরু হয়েছিল পথ?
কবে থেকে শুরু এই গূঢ় মনোরথ
তোমাকে চেয়েছি পাশাপাশি হেঁটে যেতে
প্রান্তরে পথে শহরে শস্যক্ষেতে

শেষ হয়ে গেল সে সফর এত দ্রুত!
দীন মুঠি থেকে সময়ের ধুলো চ্যুত
হয়ে যায়; যেই সাহসে বেঁধেছি হাত—
তোমার ঘড়িতে ট্রেন ধরবার রাত!

বিষ

বহন করেছি বিষ ক্রমাগত,
দু'হাতে শরীর ছুঁতে
এখন গোপনে বড় লাগে।

এখানে পুরনো সেই বিষক্ষত
কামনা রেখেছে পুঁতে
গভীর বাকল-খসা দাগে।

ঝরে পড়ে কামনার চূড়া থেকে
সুপেশল নাগফুল,
বিষের প্রকোপ দেখ মেয়ে—

আগুন ধাবিত হলো এঁকেবেঁকে
ঝরে গেল ও-আঙুল;
নতুন আঙুল যাবে ছেয়ে

তোমার শরীরময় ডালপালা
আমার দু'হাতে জল
শুধু এটুকুই দিতে পারি

শিকড়ে জড়িয়ে আছি জ্বরজ্বালা
হৃদয়ে ওষধি ফল,
আমি সেই নীলকণ্ঠ নারী।

ছিটেফোঁটা

ছিটে

ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন, হাতে কোনও প্রেম নেই?
একাবোকা মেয়ে, অথচ বলছ — এমনি!

এমনি এমনি এ শহরে কেউ একা হয়?
পথে পথে কত প্রেমের সঙ্গে দেখা হয়—

বেছে নাও সোনা, যখন যাকে পছন্দ,
একা ঘুরো নাকো। টিট্‌কিরি দেবে নন্দন ...

ফোঁটা

প্রেম তোকে কী দিয়েছে মেয়ে,
মেঘে মেঘে অবেলার চেয়ে?

তবু ফের কেন নিয়ে এলে
প্রেমভাঙা রোদ্দুরের ছেলে!

চিঠি

আজ যার চিঠি এল তার নাম শোভন না হয়ে
পার্থ হতে পারে।

আমার যথেচ্ছ দুঃখ ঝরে পড়েছিল কোনওদিন
তারও কাঁধ বেয়ে
উড়ে আসতে পারে তাই খামে ভরা যে কোনও দুপুর
যে কোনও রাত্তির।
হাতের পাতায় কার জেগে আছে দীর্ঘ সুঁড়িপথ,
কোন্ পথে যাই?

আজ যার চিঠি এল তার নাম জীবন না হয়ে
মৃত্যু হতে পারে।

প্রিয়

ও প্রিয়, তোর চোখের কোণায় মৃত্যু নাচে
মৃত্যু মানে জীবন-নদীর ওপাশ এপাশ
স্রোতের টানে খড়কুটো কি সত্যি বাঁচে!
ও প্রিয়, তুই সবুজ কোমল মৃত্যু শেখাস

ও প্রিয়, তোর হরিণ পায়ে মৃত্যু লাফায়
তাই দেখে আজ সাধ জেগেছে ঘুঙুর হবো
দেখিস যেন আনজনে কেউ শব্দ না পায়
এ মৃত্যু যে গভীর গোপন মহোৎসবও

ও প্রিয়, তোর অল্প ছোঁয়ায় মৃত্যু ফোটে
একটু বেশি ছুঁস যদি তুই, দোষ কী তাতে?
জীবনধারা মাঝবরাবর উথলে ওঠে
ওই দরিয়ায় সাঁতরে এলি তুই আমাতে!
এলিই যদি, ও প্রিয়, আয় রঙ্গ করি
তুই হ আদিম ছন্দ, আমি মুক্ত লেখা
তোর শরীরে ঠোঁট রেখে দ্যাখ কেমন মরি—

ও প্রিয়! অ্যাই অসহ্য লোক! মরতে শেখা...

টেলিফোন পিয়াসী

একা লাগে
অবসন্ন অসুখে, বিরাগে,
পালিয়ে এসেছি ভিড় ফেলে।
আজ এই মলিন বিকেলে
দাও কোনও কণ্ঠস্বর।
যাবতীয় ভুল পূর্বাপর
স্পর্শ নিয়ে কাছে এস নাকো
আজ শুধু নাম ধরে ডাকো
দূর থেকে।

ভারী জল মেখে
দীর্ঘ ঘুমে ডুবে আছে চোখ
ইতস্তত ছন্নছাড়া শোক
পুড়িয়েছে নামের বানান।
এমনকী, কোনও অভিধান
নেই, কোনও শব্দ নেই এত ধারেকাছে,
শুধু কিছু সংখ্যা পড়ে আছে।

তা হোক; শুধুই সংখ্যা ধরে
চলে এস ভিতরে ভিতরে
দূরাগত কণ্ঠস্বর!
অন্ধকার অগোছালো ঘর
এখানে কে জাগে?
কথা বলো তুমি, ভালো লাগে।

প্রেমের কবিতা

ইস্কুলের বাস দাঁড়াত যে পার্কের ধারে
তার উলটো ফুটে একটা ওষুধের দোকান।

সেই দোকানের ছোকরা,
তার সঙ্গে আমার প্রথম প্রেম
মনেমনে।
ছিল।

প্রেম মানে বুক শিরশির। গলা কাঠ। হাত ঠাণ্ডা।
আর লুকিয়ে নাম দেওয়া।
তো, আমি তার নাম দিয়েছিলাম
মৌসুম।

পাতলা পাতলা শ্যাম্পু করা চুল। ছেলেটা
ভালোমানুষ গোছের ছিল না মোটেই।
একদিন ফটাস করে
চোখ মেরে দিল আমাকে।

সেই আমার প্রথম প্রেম ভেঙে যাওয়ার দুঃখ,
আজ অবধি একমাত্র—
যা নিয়ে, মাইরি বলছি
আমি একটাও পদ্য লিখিনি।

ভোলামন

তুমি কি জানো না তবে, কবিকে মানায় ভুলে যাওয়া?
আজও এত অভিমান, এত ঘূর্ণি, ধুলোওড়া হাওয়া
তুমি কি জানো না তবে, হাওয়া ক্রমে বেড়ে ওঠে ঝড়ে
তুমি কি মানো না আজও, কবি সহজেই ভেঙে পড়ে!

ভাঙন সহজ। আরও সহজ সে ভাঙনের ভয়।
তুমি তো জানো না প্রিয়, কবিকে কী ভয় পেতে হয়
ভয় পেতে পেতে শেষে যখন দেয়ালে ঠেকে পিঠ
দেয়ালও তো ধসে যায়। সে কুড়িয়ে নেয় ভাঙা ইট

ছুঁড়তে নয়। তোকে নিয়ে দেয়ালে কবিতা লিখবে বলে
মরে যাচ্ছে, তবু বল তোকে সে কেমন করে ভোলে!

পবিত্র

এমন পবিত্র আমি আগে কি ছিলাম কোনওদিন!
আসলে, দেখিনি আগে এই গুটিশুটি শুয়ে থাকা।
গলা অবধি ঢাকা দেওয়া। ফুটে আছে ঘুমে ভাসা গন্ধরাজ মুখ,
হাত দুটি চিবুকের কাছে।

সযত্নে শিয়রে বসি। কপালে আঙুল রাখি ধীরে।
একটু একটু করে ঠিক সরে যায় ঘুমের ঝালর।
এমন আশ্চর্য হাসো —
ওই হাসি হেসে গেছে আদিতম মানবশিশুরা;
আজও সে হাসিটি হাসলে তবে পৃথিবীতে ভোর হয়।

আমি সে ভোরের সামনে শান্ত হাতে পেতে রাখি
ছোটখাটো সহজ প্রার্থনা...

এমন পবিত্র আমি ছিলাম না বহু বহু দিন।

সুজনসখা

যুবক যুবক তুমি সজিনাগাছের মতো ভালো
তোমার চিকন ডালে মানিয়েছে পাতার পাখিরা
ছোট পাখি, ঝিরঝিরে, ডানায় লুকোনো দুটি রোদ
সজিনা, তোমার ডালে পাতা না পালক চমকালো?

তাহলে তোমাকে বলি, সজিনাফুলের গল্পকথা?
তার সেই টুপটাপ ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন দিন—

এসবের সঙ্গে — ইশ, আমাকে গুলিয়ে ফেলছ নাকি!
না, শোনো, আমার তো শুধু বাঁশিতে মনের মতো ব্যথা

ব্যথা বাজে, ও যুবক, এত সুরে তুমিও বাজোনি

সজিনা সজিনা তুমি আর জন্মে হয়ো গো সজনি।

অনুরোধের আসর

এই যে নদী ...

দূর থেকে আজ শুনতে পেয়েছি নদীর গান
সুর উঠে নেমে সুর থেমে থেমে ভেসে বেড়ায়
মনে হয়েছিল সুরে খুঁজে পাব পুরনো টান
যেভাবে রেডিও তরঙ্গ তোলে ভিনপাড়ায়

অথচ এবার মরশুমে নেই তেমন ঢল
রোদ উঠে নেমে জানলায় থেমে আনমনা
মনে আছে কবে চৌকাঠ ছুঁয়ে বানের জল
বলেছিলঃ তুমি না ডাকলে ঘরে আসব না

এসেছিল। এসে ভেসে গেছে। গেছে কোন্‌দিকে
খবর রাখিনি। শুধু আজ এত বছর পর
দূর থেকে শুনে চিনতে পেরেছি গানটিকে
ভিনপাড়া থেকে ভেসে আসা মনকেমন স্বর...

কবে কোন্ নদী সাগরে গিয়েছে ফেরেনি আর
এখনও আসরে অনুরোধ আসে ভালোবাসার

সত্যি দেবাশিস

সত্যি দেবাশিস তোর মনে পড়ে সেদিনের কথা!
সেই যে যখন আমরা সারা সন্ধে শহরের পথে
কুপি জ্বেলে বেড়াতাম ফুচকাঅলাদের চোখে চোখে
বদলে পেতাম সেই অপার্থিব আলুকাবলি মাখা!

সত্যি দেবাশিস তোর সেদিনের কথা মনে পড়ে!
যখন ছিল না হয়তো তোর বা আমার ঘর বাড়ি
সারাদিন হেঁটে যাওয়া সাতমাত্রা মেলাতে মেলাতে
দিন শেষ হয়ে এলে ফিরতে না চাওয়ার আকুলতা...

সত্যি দেবাশিস সেদিনের কথা পড়ে তোর মনে!
সেই যে যেদিন তোর মেঘ দেখে কী মনকেমন —
ঘরবন্দি থেকে থেকে কেটে গেল সারাটা বিকেল
সন্ধে নেমে এলে তুই জানলা দিয়ে আকাশে তাকালি

সত্যি দেবাশিস তোর মনে আছে, কী দেখলি তখন!
ঘরে ফিরছে দুটো কাক। উড়ন্ত, অথচ, পাখা নেই...

কামিনীকাঞ্চন

যে আহ্লাদে পাতা আসে কামিনীকাননে
সুবন্ধু, তোমাকে দেবো সে সকল গুপ্ত অনুভূতি।
দেবো, মানে দিতে চাই। যে দান মূলত মনেমনে,—
অসঙ্গত মৃদু গন্ধ, মনোগত ত্রুটি ও বিচ্যুতি ...

নেবে? মানে, নিতে চাও? এই ঘোর জৈব আকুলতা
ঘন ঘন মূর্ছা যায়। তবু আমি জানাতে যাব না
কামিনীকাঞ্চন অতি সহ্যময়। অবাঞ্ছিত লতা
সে কভু হবে না জেনো। ভেবে দেখো এই প্রস্তাবনা।

এতে যদি রাজি থাকো, কাননে অপেক্ষা রেখো ধীরে

পত্রপাঠ ফুল আসবে—তরু নয়, তরুণী শরীরে।

রেলিংকাব্য

তোমার বারান্দা জুড়ে রোদ্দুরের নিঃশব্দ প্রপাত
ঝাঁপিয়ে পড়েছে আলো, আলো ভেঙে তৈরি হচ্ছে ফেনা
রোগাটে রেলিং — সে তো এত ঢেউ সামলাতে জানে না
দুরন্ত স্রোতের সামনে কোনওমতে পেতে আছে হাত

কী দিয়েছ সেই হাতে? ত্রসরেণু? অন্ধকারকণা?
রেলিং লুটিয়ে পড়ে, দীর্ঘতর হয়ে আসে ছায়া
বেলা যত বাড়ে তত মরিয়া সে, এবং বেহায়া—
বারান্দা জড়িয়ে বলে: তোকে ছেড়ে যাব না যাব না

অথচ যেতেই হয়। রোদ — সেও বড় নিম্নগামী
নির্বিকার ঝরে পড়ে রোগা আঙুলের ফাঁক থেকে
বিকেল ফুরিয়ে এলে রেলিংও যে একা থাকতে শেখে
সে কথা নিশ্চিত জেনে আমিও বারান্দা থেকে নামি

যেখানে অতল ছিল, আজ দেখি বহুদিন পর
যুবতী রেলিং, একা, ঘিরে আছে খাঁ খাঁ বালুচর ...

কী পবিত্র কী পিচ্ছিল

তরল সাবানটুকু যেভাবে গড়িয়ে পড়ে কৌটো থেকে
প্রসারিত হাতের পাতায়
সেভাবে আমার দিকে ফেরো। কথা বলো।
ঢালো প্রীতি, পরিচর্যা (ঈষৎ পিচ্ছিল)

আমার আরাম হবে। আমার আরাম —
এ কথার উচ্চারণে লালাময় হয়ে ওঠে মুখ
জিহ্বা জড়িয়ে যায়।
তরল সাবান যেন, অথবা কী হড়হড়ে লালা
সহজে বেরিয়ে আসে প্লাস্টিকের গোল কৌটো হতে
মাংসল গোলাপি তার রং (ঈষৎ দোদুল্যমান)

ওইভাবে! ওভাবে যে ঝরে পড়া যায় তুমি জানো!
যতটা সম্ভব আমি জড়ো করে রেখেছি আঙুল
তবু তার মাঝেমাঝে অন্ধ আঁচড়ের মতো ফাঁক —

কিছু তো গলেই যায়, নেমে যায় বেসিনের
বিপজ্জনক ঢাল বেয়ে ...

বাকিটা এখনও এই প্রসারিত হাতে মাখামাখি

কী পবিত্র কী পিচ্ছিল কী তরল সম্পর্ক আমার ...

অণু-স্বর

শোক ॥

আমের মুকুল আসে আমের মুকুল ঝরে যায়
আঠা হয়ে লেগে থাকে মধুনিশি গাছের দু'চোখে
সফল আসর বসে অতি-উষ্ণ-মধুর সভায়
দু'একটি পল্লব শুধু শুয়ে থাকে মুকুলের শোকে।

শান্তিনিকেতন ॥

সারাদিন সোনাঝুরি, সন্ধে থেকে ছাতিম ... ছাতিম..
শান্তিনিকেতনে এলে, বলো মন, কেন এত ঝরো?
হাওয়ায় রোদ্দুর ঝরে, ঝরোন্মুখ মেঘ থরোথরো
ঝরেও কী রইল জানো? প্রাণমন, তোমারি অসীম...

মেঘ ॥

কী নিঃসাড় মেঘ যেন অতিকায় মৃত সরীসৃপ
ভয়াবহ যুদ্ধশেষে নখদন্ত উপড়ে গেছে কবে
তবুও অপেক্ষা আছে ঝড়ের, যা মহা বিপ্রতীপ
প্রাক্-ইতিহাস এসে দিগন্তে দাঁড়াবে সগরবে।

কান্না ॥

দু'চোখের বাষ্পকণা আমার নিতান্ত আদরের
অনাঘ্রাত পুষ্পসম ধরে নিই পূত করপুটে
সযত্নে জমিয়ে রাখি শয্যাপার্শ্বে। ... ঘুম থেকে উঠে
দেখি মেঘ হয়ে তারা হৃদয়ে পালিয়ে গেছে ফের

অপেক্ষা ॥

একদিন এই যাত্রা ফুরোবে। ফুরোবে মনে হয়।
রাত্রি শেষ হয়ে এল। ক্লান্তিতে জড়িয়ে এল চাকা।
জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে পড়ে থাকবে কেবলই সময়,
দূর থেকে দেখবে ট্রেন :
রেললাইন ঘাসফুলে ঢাকা ...

চোখের বালি ॥

আয়ত চোখের ছেলে, তোর চোখে ভাসতে ইচ্ছে করে
মণি হয়ে নয়। (আর, অত দামও আছে কি আমার!)
শুধু এই ধুলোবালি হতে চেয়ে ভাঙি এতবার
দেখি তোর চোখে পড়ে—
চোখে জল ঝরে কি না ঝরে ...

মুহূর্ত ॥

অটোতে, মুহূর্তমাত্র, তোকে কাছে পাওয়ার সুযোগ।
কাছে পাওয়া কাকে বলে? চুম্বনমুহূর্তে শ্বাসরোধ?
মরে যাচ্ছি। যেতে যেতে ফিরে আসছি। আরও মৃত্যু বাকি।
চুমু নয়, কামড়ে দিচ্ছি তোর নগ্ন হাতের পাতাটি।

আদর ॥

সে এত নরম, তাকে ভালোবেসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।
দীর্ঘ আদরের পরও আদরের ইচ্ছে জেগে থাকে।
শেষ হয়ে যাচ্ছি তবু ফুরোচ্ছে না হাতদুটি তার,
ওইখানেই মনে হয় আমার এ জন্ম কেটে যাবে

ঘুম থেকে উঠে, কোনও অন্য জন্মে, চুমু খাব ঠোঁটে....

সপ্রতিভ

হাত নাই বা ছুঁলে
কিছু বলতেও হবে না

সমস্তই দারুণ ঠিকঠাক
কেবল এই সময়ই যা-একটু
এলোমেলো, একটু কাতর

আর কোনও অসুবিধে নেই

শুধু এই তোমার চোখের দিকে
তাকাব না, যতক্ষণ আছ

হাত সরিয়ে নাও,
টেবিলের ঢাকা ঠিক করো;

বিপর্যস্ত লাগে
ভিতরে ভিতরে

ভেবেছিলাম,
সমস্ত যন্ত্রণাই সহ্য করব সপ্রতিভ মুখে...

সময়

ঘাড় নিচু করে বসে থাকো
আর ওভাবেই দুঃখ পাও
সারাটা সময়।
আসলে তোমার
সময়ের মুখ দেখতে ভয়।

সময় স্বাধীন নয়, চলে যাওয়া বাধ্যতামূলক
তোমার নিজের বাঁচা,
তোমার দু'পাশে অন্যলোক
দেখে নাও
আর ওভাবেই চলে যাও,
যেতে হবে বলে;
সময়কে ছেড়ে যাও সুখ-দুঃখ-সীমানা অঞ্চলে।

সফর

ভেসে চলেছে বিচ্ছিন্ন রিকশা
আশেপাশে উড়ন্ত গোলাকৃতি আলো
ওরা সব শহরের গ্রহ ও তারকা

আর আমরা চলেছি অন্য ছায়াপথে
শরীর লুকিয়ে

এ মুহূর্ত সময়বিহীন

শিস দিচ্ছে রূপবান রিকশাচালক
আমাদের দু'জনেরই খুব
ভালো লাগছে,
চেনাচেনা সুর ...

মারণ

এসব আমি বিশ্বাস করি না একেবারে।

মধ্যরাত্রে অত বড় শ্মশান
চাঁদ কী করে হেঁটে পার হলো একা!
বরাবরের রাজকন্যে,
ওকে কি আমি আজ থেকে জানি?
বোতলের মুখ ভেঙে তোমরা যখন ফিরে গেলে,
উচ্ছিষ্ট মদ গড়িয়ে চলল পাথর থেকে ছাই থেকে জলে।

কিশোরী চাঁদের গালে ব্রণক্ষত আমি চিনি,
যার কশ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল সে চেনা নয়

রাজকন্যের মতো টিকোলো নাক কোন্ মেয়ের?
কার ডানা কামড়ে টেনে নিয়ে গেল
তান্ত্রিক কুকুর?

ভুল বারান্দা

আমি তো জানতাম, পথ বেঁকে যাবে, পথের কী দায়
আমি কোন্‌দিকে যাব সে সমস্ত সামান্য চিন্তায়!
যদিও চলাই যেত তখনও পথের অনুসারে
যে নেহাত অবজ্ঞাত সে তো যা-খুশিই করতে পারে

পথে পথে চলে যেতে পারে ধুলো হয়ে, কাদা হয়ে
তোমার বারান্দা-ছোঁয়া সুবাতাস নিতে পারে বয়ে
আমার উড়ন্ত কোষ, মৃত শিরা, ঝরা পরমাণু ...

এমন চাইনি আমি, আজও তাই হয়ে আছি স্থাণু
সেখানে, যেখানে পথ বেঁকে গেল, বেঁকে গেছে, যায়—

পথ কি জানত না, সেও চলে যাবে ভুল বারান্দায়!

ঢাকুরিয়া লেক : পশ্চিমপাড়

এখনও ও মাটি আছে
এখনও ও পিচরাস্তা পরেনি দেমাকে, সারাগায়ে।
দোয়েলের জোড়া আসে
দ্বিপ্রহর শান্ত হাতে পেতে দেয় রোদের মাদুর...
কাঠবিড়ালির নখ
সবিস্ময়ে বাদাম ভেঙেছে, আহা, আলোর বাদাম—
বাদামি আলোর খোসা
মাটি ঘেঁষে, ঢাল বেয়ে, উড়ে যাচ্ছে জলের কিনারে
এখনও ও জল আছে
এখনও সে-জল ঘিরে ন্যাংটোপুটো আগাছার শিশু
হাতেমুখে মাখামাখি করে
আলো খায়।

স্বাভাবিক অদ্ভুত গল্প

আমাকে কোনও সাম্রাজ্যের কথা লিখতে বোলো না,
আমি শুধু দেখি
            গড়ে উঠছে গ্রাম
                        কিশোরী নদীর ধারে।

সাম্রাজ্য ওঠে, পড়ে,
আমি শুধু বয়ে যাওয়া দেখি
গ্রামের কিনারে নদীটির।

আমাকে কোনও প্রতিবাদ লিখতে বোলো না।
আমি যে অঞ্চলে থাকি
সেখানে রোদ্দুর পড়ে আসে,
ঘুমিয়ে পড়ে শস্যনাশা পঙ্গপাল।
দস্যুতা করতে করতে অতর্কিতে
মায়া ঘনিয়ে আসে পুরুষের মুখে

আমাকে কোনও প্রচলিত অপরাধ লিখতে বোলো না,
তোমাদের জানাতে চাই
এইসব স্বাভাবিক অদ্ভুত গল্প
যা তোমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে বারবার...

নিশিডাক

দরজা খুলিনি।
সারারাত কড়া নেড়েছিল
ভুল রাস্তা,
বাড়ি বয়ে এসে
দিতে চেয়েছিল নিশিডাক;
সে ডাকে ভুলিনি।
বন্ধ করে কান ও কপাট
এমনকী শ্বাস চলাচলও
পড়ে আছি ভুল ঠিকানায়

তোমাকে বলিনি।

নির্জন

হাতের রেখায় আঁকা আছে
বিষাদের চেনা পথঘাট।
এই রাস্তা ওই গলি ঘুরে
পৌঁছে যায় আমার দুয়ারে
সন্ধ্যায়, কখনও দিনমানে।

দোতলার ধারে নিমডালে
রোদ বসে থাকে। আমি ভাবি
এ সময় আকাঙ্ক্ষার নয়

দুপুরের দিকে জ্বর আসে।
মাদুর গুটিয়ে নিলে রোদ
বিকেলের মুখে কান্না পায়।

কাউকে ডাকি না। একা থাকি।
মাঝবয়সী ডিভোর্সি বেকার,
পোস্ট: মনখারাপের গলি

বিষাদ না এলে, চিঠি দেয়।

গঙ্গাসাগর, এপ্রিল ৯৬

এক আকাশ মেঘের শেষে
জলে কে উপুড় হলো
বুকে তার নীলচে কাদা।
শামুকের সঙ্গ ধরে
ওখানে কেই বা যাবে,
জলেরও নেই কোনও গা
আমাকে সঙ্গে নেবার।

আমি তাই জলকে টানি,
হাঁটুডুব ভাঙছি পলি
জলের ওই গোপন বাঁকে
শামুকের নিথর সাঁতার
মনে হয় আমিও জানি।

এক আকাশ বৃষ্টি হলো
ঘুম ভাঙে চরের মাটি
নীল কাদা, বুক পেতে শো
শামুকের সাঁতার কাটি।

একাকী ও শব্দহীন

কঠিন নৈঃশব্দ্য এত, চারপাশে ছড়ানো পাথর
সরানো সম্ভব নয়। পরিশ্রমে দু'বাহু কাতর
মাথা থেকে একাকীত্ব ঝরে পড়ে মেরুদণ্ড বেয়ে
সব পথ প্রস্তরিত? আছি তবে কার পথ চেয়ে!
এ পথে হাঁটেনি কেউ আমি ছাড়া, অনুষঙ্গদোষ
রেখেছে বিলুপ্ত করে শরীরের মৃত্যুকামী কোষ
নৈঃশব্দ্য এমন উগ্র, পাথরে পাথরে ঘষা লেগে
রক্ত ঝরে, লাভা ছোটে, ঊর্ধ্বমুখে উল্কা ওঠে জেগে
অগ্নি ভেদ করে ছুটি, দেহ ঘিরে যন্ত্রণার জ্যোতি

শিখরে কি মুক্তি আছে? আছে সিদ্ধি? নাকি আত্মরতি?

মর্ষকামী

বর্শা আনো বর্শা আনো বিদ্ধ করো
ভাল্লাগে না এমনতরো গা ভাসানো
তরঙ্গ নেই, শুধুই অপার মসৃণতা
মসৃণতার টুকরোগুলো তীক্ষ্ণ করো।

তপ্ত বালি, পাশ ফিরে শুই কু-অভ্যাসে
অন্ধকারে মগ্নরতি, আনন্দহীন
হ্রদের পাড়ে শব ভেসেছে, গলছে দেহ
শবকে জাগাও শবকে ডাকো ভিন্নস্বরে

অনেক হলো রমণখেলা সিদ্ধরীতি
এইখানে এক সহজ সরল বধ্যভূমি
অ-পবিত্র যন্ত্রণাতে পুড়ছে নরক
মৃত্যু আনো মৃত্যু আনো স্নিগ্ধ করো।

শতাব্দীপ্রাচীন

শতাব্দীপ্রাচীন এই বৃষ্টিপাত, ঘোর বৃষ্টিপাত
ঘুম ভেঙে আকাশে দাঁড়াল।
তোমার পিঠের মতো মেঘ
পাশ ফিরে দু'বাহু বাড়াল
শতাব্দীপ্রাচীন মাটি ছোঁবে বলে; আর ছোঁবে বলে
সেই ভাপ খনিজ, গভীর
খুঁজে নিতে অতলান্ত থেকে
আদিগন্ত পাথর শরীর

শতাব্দীপ্রাচীন এই দৃষ্টিপাত, ভরা দৃষ্টিপাত
ঘুম ভেঙে আঁখিতে দাঁড়াল।

শীতঘুম

অন্ধকার ভালো লাগছে। পৃথিবীর ঠাণ্ডা গর্ভগৃহে
কোনও মূর্তি নেই। কোনও মুখ নেই। অন্ধকার আছে।
এইখানে শান্ত মনে শীতঘুমে কাটাব সময়।
অতিক্রান্ত হয়ে যাব বায়ুস্তরে সমস্ত বিদ্যুৎ,

ঝড় জ্বালা গতিবেগ ধুলো ধোঁয়া ধুয়েমুছে যাবে।
এখানে অপ্রয়োজনে নিঃশ্বাসও উদ্বৃত্ত পড়ে থাকে...
আবহমণ্ডল থেকে পালিয়ে এসেছি তলেতলে।
নীল পথে নেমে যাচ্ছি। নীল ক্রমে দীর্ঘ নীল হয়ে
আমাকে জড়িয়ে নিচ্ছে
আমাকে মিশিয়ে নিচ্ছে তার অঙ্গে গাঢ়ত্বের মতো ...

মৃতনগরী

শহরে বিকেল হয়ে এল।
একটু পরে চরাচর ব্যাপ্ত করে নেমে আসবে টিভি।
প্রতিদিন আসে ওরা। অন্ধকার পিঠে নিয়ে আসে।
নগরীর ঘরে ঘরে ঢুকে যায় মসৃণ হানায়...

তারপর এ শহর চলে যায় ওদের দখলে
বাস্তবিক, একেবারে বিনাযুদ্ধে। বিনা রক্তপাতে।
তবু দেখি, ঘর থেকে বারান্দায় চুঁইয়ে নামছে চটচটে আলো
চৌকাঠের পাশে সেই থকথকে আলো ঘিরে
জমে উঠছে থোকাথোকা মাছি

সমস্ত শহরে আর বেঁচে নেই কেউ।
সার সার মৃতদেহ পড়ে আছে। শুয়ে বসে আছে।

মৃতনগরীর বুকে টিভি শুরু করছে তার
নির্বিকল্প শাসনপ্রণালী ...

ছুটি

খুলে গেল স্লুইস গেট,
ওইটুকু অপরিসর ঢালুপথে
গড়িয়ে নামছে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল শাদা ঢেউ

ঢেউগুলো এতক্ষণ ক্লাসঘরে বন্ধ ছিল—
চুনাপাথরের পাহাড়ের গায়ে
একটা ছোট্ট অন্ধকার গুহা

এখন ওরা নেমে আসছে মহাবেগে
আর ওদের আঁজলা ভরে ভরে তুলে নিচ্ছে
ওদের মায়েরা, একেকজন
রংবেরঙের জলপরী!

বিপদ

আমার একজন নতুন বন্ধু হয়েছে। সে সুন্দরী নয়, কিন্তু সুন্দর। শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, চাকুরিরতা। আশ্চর্যের কথা এই, তার অফিসে বারান্দা আছে। রোজ অফিসে পৌঁছে মেয়েটি বারান্দায় দাঁড়ায়। রাস্তা দ্যাখে। আর, আকাশ।
দুপুরে সে আমায় অফিস থেকে ফোন করেছিল। বলল, তার ওড়না উড়ে গেছে ঝড়ে। ঝড়, হ্যাঁ, ঝড় একটা এসেছিল ঠিকই। সকালের ঝড়। আমি ভেবেছিলাম, ঝড় শুধু বিকেলেই হয়। কিংবা, রাতে।
সে বলছিল, আজ তার আর দেশে কবিতা দিতে যাওয়া হবে না। তার ভয় করছে। তার ওড়না নেই।

আমি তোর বন্ধু। তোকে বুঝি।

অতিথি

এইমাত্র আমার ড্রইংরুমে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।
কিছুক্ষণ গল্প করার পর
তিনি আমার হাতে একটা মুখোশ খুলে রেখে
জানলার ধারে গিয়ে দেওয়ালে থুতু ফেললেন।
বাথরুমে গিয়ে হিসি করলেন, তবে দরজা না দিয়ে

তারপর হাতমুখ ধুয়ে মুখ মুছলেন পর্দায় — মানে,
যেটা মুছলেন তাকে আমি মুখই ভেবেছিলাম, কিন্তু
ভদ্রলোক এবার সেটাও খুলে রেখে
সোজা চলে গেলেন আমার শোওয়ার ঘরে।
বিছানার চাদর উলটে, খাটের তলায়, আলমারির পাল্লা খুলে
কী সব যে খুঁজতে লাগলেন তিনিই জানেন।
আমি সবে জিজ্ঞেস করতে যাব ভাবছি,
তখনই তিনি খুলে ফেললেন তৃতীয় মুখোশটাও।
মেঝেতে বসে পড়লেন হাঁটু ভেঙে, দু'হাতে মুখ ঢেকে।
তাঁর শরীর কাঁপছে থরথর করে ... কোনওক্রমে মুখ, হ্যাঁ, মুখ—
মুখ তুলে বললেন : ক্ষমা করো।
আমি স্পষ্ট দেখলাম সেই মুখ কান্নায় ভেসে যাচ্ছে ...

কিছুক্ষণ কাঁদার পর বিদায় নিলেন তিনি।
হাতে তিনতিনটে মুখোশ নিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম
ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে,
তাঁর মাথার পিছনদিকে অন্য একটা মুখ,
নাকি
মুখোশ ...

কুয়াশা

কিছু কি লেখার ছিল? অদূরে কি ছিল কোনও ঋণ?
দৃষ্টিপথে কাঁটাতার। আমারও যে অন্ধ প্রতিদিন।
কার হাত ধরতে চেয়ে হাত থেকে ভেঙে পড়ছে ভাষা,
খাদে পড়ে যাচ্ছে শব্দ, উঠে আসছে কেবলই কুয়াশা।
কুয়াশা কুয়াশা, তুমি হাত ধরে নিয়ে চলো সখী
সেই মুখ দেখতে দাও, সেই চোখ, সেই চোখাচোখি —
দৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষা গিঁথে তুলে আনব নিহিত তড়িৎ
কুয়াশার দেহ থেকে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে শীত ...

তোমারও কি মুক্তি নেই তাতে, বন্ধু! তুমিও তখনই
লিখবে না লিখবে না সত্যি? সেই কথা?
আগে যা লেখোনি ...

নৈশ

এ কোন্ সমুদ্র আজ ফুলে উঠল বাতাসী সন্ধ্যায়?
ভারী, লম্বা পর্দা সব উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে
তারা খসানোর শব্দে উঠে বসছে কার্নিশে বেড়াল ...

কী জানি কোথায় যাব এই বারবিলাসিনী রাতে

হাওয়ায় হাওয়ায় শুধু বেদনার শব্দ শুনি
যে বেদনা ঝাঁঝালো মধুর

সমুদ্র আমিষগন্ধে আমাকে জড়িয়ে নিচ্ছে বুঝি ...

নাঃ, আমি কোথাও যাব না এই
বাতিনেভা ঝড়খানি ছেড়ে

অলৌকিক

বোবাকালা মেয়েটির জন্যে
ঈশ্বর মাঝেমধ্যে ঝড়বৃষ্টি পাঠান, বজ্রবিদ্যুৎসহ।

যাকে বোবাকালা মেয়ে বলছি, ডলি,
আমাদের রান্না করে। ঘরদোর সাফসুতরোও করে।
সে যে আসলে কোনও অলৌকিক বালিকা
এ কথা জেনেছি এক বজ্রবিদ্যুতের রাতেই।

অন্ধকারে ঝড় এল হইহই করে।
ইলেকট্রিকের তার গেল ছিঁড়ে।
দরজা জানলা বন্ধ করে বসে আছি, ভয় করছে বেশ।
বাইরে মুহুর্মুহু আলো আর শব্দের ডামাডোল।
এরই মধ্যে, ডাইনিং স্পেসে, ডলি ঘুমোচ্ছে অকাতরে।

তারপর, যেমন হয়, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ল মাথায়,
মনে হলো, বাজটা পড়ল কাছেপিঠেই কোথাও।
শিউরে উঠে মনেমনে ঈশ্বরকে বলছি : ঠাকুর শান্ত হও ...

আর ডলি ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরের বাগানে।
জানলার কাচ দিয়ে সভয়ে দেখলাম
বিদ্যুতের আলোয় ডলি ময়ূর হয়ে গেছে।

খানিক পরে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সে
চোখেমুখে বিদ্যুৎ, সারাগায়ে বৃষ্টি, ইশারায় জানাল
শুনতে পেয়েছে, সে শুনতে পেয়েছে।

তারপর থেকে ঈশ্বর প্রায়ই ওর সঙ্গে কথা বলেন
বজ্রবিদ্যুতের ভাষায়।

আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই।

তারাদের ক্লাসে

(উৎসর্গ : ড. রমাতোষ সরকার)

আমাদের কাছে ছিলে, চলে গেলে তাহাদের কাছে।
এটুকু পার্থক্য শুধু। আসলে তো আছ। সবই আছে।
লম্বা টানা ক্লাসঘর, সন্ধেবেলা ছেলেমেয়ে জোটে,
তোমার পড়ানো শুনতে এক আকাশ তারা ফুটে ওঠে।
সে তারা যে কবেকার! কী সুদূর আদিযুগ থেকে
আলোবর্ষ পাড়ি দিয়ে এই ক্লাসে এসেছে প্রত্যেকে।

নেমে আসছে ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, সেই সপ্ত ঋষি
আমাদেরই পাশে এসে বসছে, জানো! সে কী ঘেঁষাঘেঁষি!
আর তুমি অনর্গল বলে যাচ্ছ বিশ্ব ইতিকথা
আমরা বসে থাকি আর পাতা উলটে এগোয় সভ্যতা...

আমি জানি, এ সমস্ত একই আছে, ওখানেও তুমি
ক্লাস বানাবার জন্যে পেয়ে গেছ ভাসমান ভূমি
তারাদের ভারি মজা, ওরা আজ কত কাছাকাছি!
আমরা আজ দূরে, তবু, খুঁজে দেখো,— আছি, আমরা আছি
আমরা যে তোমারই ছাত্র, পার হতে শিখেছি সময়
সন্ধান শিখেছি, আর ছুঁয়ে ছেনে দেখেছি বিস্ময়
আজ তাই অনায়াসে দেখতে পাচ্ছি আকাশে আকাশে
তারারা তোমাকে ঘিরে বসে আছে অন্তহীন ক্লাসে
যেন তুমি জ্যোতিষ্কের ততোধিক জ্যোতির্ময় পিতা—
কী পড়াচ্ছ তারাদের? পৃথিবীর শেষের কবিতা?

দূর থেকে দেখছি আমরা, তোমাকে বিরক্ত করি পাছে
আমাদের কাছে ছিলে, চলে গেলে তারাদের কাছে

আলোকবর্ষপারে: জীবনানন্দ নামে তারা

১.
এত মায়া পৃথিবীতে, মনখারাপ এতরকমের
এই নিয়ে বেশ কিছু জীবন কাটানো যায়; যাবে।
সামান্য জীবনমাত্র কিছু নয়। কিছুই যে নয়,
সে কথা প্রমাণ করতে, দ্যাখো কবি, শতবর্ষ পরে
রূপসী বাংলার বুকে আজও শুয়ে আছে একা একা
মৃত্যুদাগ বুকে নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ট্রামলাইন ...

২.
মনখারাপ হলে তার দারুণ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে
তখন সে সারাদিন চাকরি খোঁজে একটুও না রেগে

বিনাদোষে, বিনাপ্রতিবাদে বিতাড়িত ... মাথা উঁচু ...
মনখারাপ হলে তার ভয় নেই কোনও দুঃখ নেই।
এরকম দিনে তার মাথা থেকে চুঁয়ে পড়ে সাধ
মাথা গুঁজিবার সাধ ধরণীর শস্যময় ক্রোড়ে
মাঝেমাঝে মনে হয় এইসব মলিন বিকেলে
দু'মুঠো সোহাগ পেলে, শান্তি পেলে, কীরকম হতো?
কে জানে কেমন হতো! আপাতত এই, আজীবন
মনখারাপ হলেই সে মাথা রাখত খাতার পাতায়

৩.

আলো জ্বালিও না, আহ্, আলো জ্বালিও না, লিখতে দাও
এখন শহর জুড়ে প্রাগৈতিহাসিক লোনা জল
আমি এ সমুদ্র চিনি, চতুর্দিকে যত কোলাহল
ততই নৈঃশব্দ্য চিনি, ক্রমাগত যত প্রেমহীন
ততই অপ্রতিহত উঠে আসে প্রেমের কবিতা
ঘুম থেকে উঠে আসে, জল থেকে উঠে আসে স্মৃতি
হাজার সভ্যতা ধরে বয়ে আসা স্মৃতি নামে নদ
যে সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে এই সেই আদিম নগর
স্মৃতি নয়, স্বপ্ন নয়, এ তো শুধু মর্মভেদী সাধ
অনন্ত গোধূলি এক, ঘরে ফিরে আসার সময়
আকাশের নীচে ঘর, চক্রবাল উপচে যাওয়া ঘর
লোনা জলে উপচে যায় ঘর তবু শরীর, শরীর—
একটুও ভিজলে না তুমি ... একটুও ভেজেনি চোখমুখ
ভেতরে ভেতরে সব খাঁ খাঁ করে ... অথচ এমন
ধানের সুবাস আসে ... কুয়াশার নীল ... এ কী রাত!
আলো জ্বালিও না, আহ্ আলো জ্বালিও না, দেখতে দাও
যতদিন বেঁচে থাকি, আলো জ্বালিও না এই মাঠে

৪.

শতবর্ষ পরে আলো এসে পড়ে নির্জন কপালে

জীবনানন্দের চোখ

চোখ দেখলে মনে হয়, তুমি বড় কষ্ট পেয়েছিলে
কষ্ট শেষ হয়ে গেল, চোখদুটি পড়ে রইল একা
যদিও সহনও শেষ, তবু ভেসে থাকে কষ্টবোধ
ভেসে থাকে, আর যেন ভেসে ... ভেসে ... ভেসে....
কবিতা ও বিষাদের দেশ থেকে ক্রমশই দূরে সরে যায়

এরপর যা কিছু পাবে সমস্তই দারুণ সুখের
সমস্ত রঙিন আর সাফল্যের উত্তাপে তরল
কাব্য ছেড়ে ভালো থাকবে, — এত ভালো, হিংসে হবে দেখে
অগত্যা আমিও তাই কবিতার যা-কিছু জ্বলন,
কঠিন বিষাদরোগ, একবাক্যে ছেড়েছুড়ে দিয়ে
তোমার বাড়িতে যাব, কে বলেছে কবি হতে হবে!
শুধুই মানুষী হয়ে দাঁড়াব তোমার কাছাকাছি
শান্তি খুঁজব শান্তি খুঁজব, শান্তি, শান্তি, শান্তি খুঁজব, শান্তি

এতকাল পরে আজ এমন অদ্ভুত কথা শুনে
জীবনানন্দের চোখে হাসতে হাসতে জল চলে আসে ...

দ্বিধা

তোমার নীল আর আমার নীল
আলাদা।
তোমার দুঃখ আর
আমার বিষাদ।
তা সত্ত্বেও এই যে আমরা পাশাপাশি ...
মন্দ কী?

তোমার শাদা আর আমার শাদায়
প্রভেদ অনেক।

শাদা বলতে তুমি ভাবো গন্ধরাজের
পাপড়ি
অথচ আমার মনে পড়ে তার
গন্ধ।

এই নিয়ে কী যে কাটাকুটি, মনে আছে?

আজ, হয়তো দুইই সত্যি, শুধু
দু'রকম ...

মন্দাক্রান্তা

সন্ধ্যা

মন্থর সন্ধ্যায়	বিরহী নদীজল	অস্তসূর্যের	পরাগ চায়
রক্তিম মুখ তার,	শরীরে শিহরণ	তীব্র স্পর্শের	আকাঙ্ক্ষায়
অস্থির অস্থির	রূপসী নদীটির	ওষ্ঠকম্পন	কী ভঙ্গুর
টলমল ছলছল	নিরালা আঁখি তার,	ঘূর্ণিসঙ্কুল	হৃদয়পুর!
ঘূর্ণির নাম প্রেম	প্রেমে যে অভিশাপ!	মৃত্যু তার খুব	কাছের জন
আজ তাই সন্ধ্যার	অতলে দিল ডুব	সূর্যচঞ্চল	নদীর মন।

মল্লিকার ঘর

গুর্জর পর্দায়	এ ঘরে পাহাড়ের	শান্ত ঢাল আর	সবুজ ঘাস
টুংটাং ঘন্টায়	গরুরা ফিরে যায়	অন্তহীন সেই	চারণমাস
তারপর সন্ধ্যায়	পাহাড়ি প্যাগোডায়	মোমবাতির ক্ষীণ	শিখার আঁচ
গুম্ফার অন্দর	সুরেলা ধ্বনিময়	সান্ধ্য জানলায়	রঙিন কাচ
এইসব অদ্ভুত	ইশারা মেলে দেয়	মল্লিকার ঘর,	জাদুর শেষ
দরজার এই পার	ধোঁয়াটে পৃথিবীর,	অন্যপার এক	অবাক দেশ।

ধর্মবেকুব

মন্দির মসজিদ	গুঁড়িয়ে দিতে চায়	ধর্মপ্রাণ কোন	বেকুব বল
নামগান হুংকার	কারও বা মুখে, আর	অস্ত্রে শান দেয়	আরেক দল
আজ ওর ঘর ভাঙ	না হলে কালই ঠিক	ভাঙবে তোর ঘর—	মজার খেল!
রাষ্ট্রের জয় হোক!	উপোসী জনগণ	ধর্মরক্ষায়	কী উদ্বেল!
দাঙ্গায় দাঙ্গায়	মরেছে কত লোক	মৃত্যু চিৎকার	কোথায় ভাই!
ডাম ডাম ডাম ডাম	দামামা বাজে শোন—	চল শতাব্দীর	চুড়োয় যাই
খুব জোর ধুমধাম	এদিকে পেছনেই	বাবরি মসজিদ	নামায় চোখ
রামমন্দির তার	গোপনে ধরে হাত।	অস্ত্রে শান দেয়	আহাম্মোক!

উপসর্গ

সমুদ্র ধরেছি আমি মাথার ভিতরে
ব্রহ্মতালু ফাটতে চাইছে, ঠেলে উঠছে জল
হাঁটছি চলছি কথা বলছি জানি না কী করে
মাথাতে ঠেকিয়ে রাখছি গুপ্ত ছলাৎছল

মাথাতে পাকিয়ে আছে যুবতী নাগিনী
মাঝেমধ্যে তুলতে চাইছে অসহিষ্ণু ফণা
হাঁটছি চলছি কথা বলছি, এখনও রাগিনি
কিন্তু জানি বেশিদিন সামলাতে পারব না

ক্রমশ মাথার মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে চাপ
পাকে পাকে খুলে যাচ্ছে সমুদ্রশরীর
চোখেমুখে ছিটকে উঠছে সমুদ্যত ঝাঁপ
হাঁটছি চলছি, একটু টলছি, সামান্য অস্থির

এখনও তো বন্ধ মুখ, চোখে অন্তরায়
ধারণ করেছি যাকে ধরে রাখা দায় ...

শিকড়

সেই অশ্বত্থের চারাকে চিনি।
একটা বুড়ো খেজুরগাছের মাথায় চেপে
যে শিকড় জড়িয়ে দিয়েছিল তার গুঁড়িতে।

এবড়োখেবড়ো, ভাঁজ-খাওয়া গুঁড়ি বেয়ে
শিকড় নামছে।

বাষট্টি বছরের অন্ধকার পেঁচিয়ে
নেমে আসছে সেদিনের শখ আহ্লাদ।

শিকড় নামছে
নামছে
নাম
ছে।

জানে না কতদূরে মাটি। শুধু অন্ধের মতো

নেমে যাচ্ছি, মা।

দিস ইজ আ ফ্রি ওয়র্ল্ড

একমিনিট নীচে নামবেন?

আমাদের ছোট কোম্পানি, নতুন কোম্পানি।
এক কৌটো পাউডার কিনলে
একটা সাবান ফ্রি।
এক বোতল শ্যাম্পু কিনলে
একটা চিরুনি ফ্রিতে পাচ্ছেন ...

একটু নীচে আসুন না, দুটো কথা বলি!

বারাসত থেকে আসছি, বাবা নেই।
দু'দুটো ডাগর বোন ঘাড়ের ওপরে।
রেশনের চাল খাই,
রেশন দোকানের সত্যেন কুণ্ডু, আমাদের
যে কোনও একজনকে বিয়ে করতে রাজি।
বড়কে বিয়ে করলে
মেজ আর ছোট ফ্রি।
মেজকে বিয়ে করলে
বড় আর ছোট
ছোটকে বিয়ে করলে ...

রোজ তার হাত এড়িয়ে উঠে পড়ি ছ'টার লোকালে

একটু নেমে আসুন, দিদিভাই
জানি এটা আপনাদের ফ্রি টাইম, বিশ্রামের সময়,
খুব বেশি বিরক্ত করব না

আমাদের ছোট কোম্পানি, নতুন কোম্পানি
ভরদুপুরবেলা আপনাকে একা পেয়ে
ঠেলে যে ঢুকেও পড়ব
গায়ে অত জোরটোরও নেই ...

স্নেহপদার্থ

বেড়াল দুধেলা শিশু। দরোজায় বসে ডাকে : মিউ।
সঙ্গেসঙ্গে মূর্তিমতী মাতৃস্নেহ, আমি, হাতে কাঁসি
কাঁসিতে একমুঠো অন্ন, দু'হাতা-মতোন দুগ্ধসহ,
দ্বারে অবতীর্ণ হই, প্রতিবেশীগণ সবিস্ময়ে
দ্যাখে আর সমস্বরে বলে ওঠে : ওমা-ওমা-ওমা
দোতলা তিনতলা থেকে বারান্দা জানলাকে ডাকে : জাগো-

অহো — দ্যাখো জীবে প্রেম — দিবারাত্র স্বর্গীয় রগড়
কোলেকাঁখে নেই, তাই যত লাই কুকুরে বেড়ালে

বেড়ালও বজ্জাত শিশু, দুধভাত খেয়েই সরে পড়ে।

পড়শিরা সান্ত্বনা দেয় : ওকে নিয়ে কবিতা লিখুন!

শহিদ

আমার ধারণা, এও একধরনের আহ্লাদই

এই কাটাকুটি, এই আকাশ চিরে দেওয়া
চিৎকার — হো ও ও ও ও ...

অথচ কী স্বচ্ছ রক্ত, ফাঁকা —
আকাশের গায়ে কোনও কলঙ্কও নেই

শুধু অস্বস্তি, আর অস্বস্তির মতো
ধারালো সুতো

আর কার্নিশে, ইলেকট্রিকের পোস্টে,
খেজুরগাছের মাথায়
লটকে থাকে তরুণ লাশ

আমার ধারণা, ওই ছোকরা
যার নাম ছিল লালঝারি
এমনি এমনি হঠাৎ মরেনি

কী একটা ছাপার অযোগ্য কারণবশত
শহিদ হয়েছিল ...

জনৈক ভারতীয়র লেখা পদ্য

কারগিলের ছড়া

কাদের ঘরের চাল ফুটো হয় কার ঢিলে?
ঝগড়া থেকে লড়াই শুরু কারগিলে।

চাল না রে ভাই, দেশের চুড়োয় বরফমাঠ
সেইটে নিয়ে রাজায় রাজায় কী ঝঞ্ঝাট

জন্ম থেকেই শত্রু এমন দু'জন ভাই
ঢিল ছুঁড়েছে কালকে। এখন কামান চাই।

ভোট-উৎসব

চতুর্দিকে ধন্যধন্য
জনগণের নেমন্তন্ন
নেতৃবৃন্দ নিজের জন্য
চাইছে সবার ভোট

আজকে আপনি হাঁচুন কাশুন
ওঁরা বলবেন — আসুন আসুন!
কালকে যতই ভালোবাসুন
ওঁরা বলবেন — ফোট্!

কতই লীলা দেখছি ভবে
বছর বছর ভোট-উৎসবে
আসছে বছর আবার হবে
সন্দেহ নেই তায়

টান পড়েছে অন্নবস্ত্রে
শান বেড়েছে অস্ত্রশস্ত্রে
ভারতসূর্য বসল অস্তে
শতাব্দী-সন্ধ্যায়।

সবাই রাজা

গুটি পাঁচ জনগণ, একজনই সরকার
আদর্শ দেশ হতে এটুকুই দরকার
তাই ওরা দেশ ভেঙে 'নিজেদের দেশ' চায়
প্রজাহীন রাজা হবে প্রত্যেকে শেষটায়!

রামরাজত্ব

অটলবিহারী বাজপাই
কী করে একটা কাজ পাই
ওদের তো আছে ভাজপা-ই
আমাদের আছে কী?

আপনি হাসান বুদ্ধ
সীমান্তে লাগে যুদ্ধ
লোক মরে দেশসুদ্ধ
একজনও বাঁচেনি!

যারা বেঁচে গেল তারা সব
মানুষ? না মানুষের শব?
রামমন্দিরে উৎসব
আমাদের লবডঙ্কা

হনুমানজীর সরকার
করছে ভারত ছারখার
এবার কি তবে দরকার
নতুন স্বর্ণলঙ্কা?

নীলহলুদ

এমনও এক দিন ছিল, ভেবে দ্যাখো,
যখন তোমার জামার রং
অনায়াসে হয়ে উঠতে পারত হলুদ

তাতে উড়ে এসেছে প্রজাপতি, নীল ডানা

আজ তুমি জানো
তোমার পক্ষে ভালো নয় এমন মিলমিশ—
অস্থায়ী শিবিরের পেছনে, মাঠে,
তাই আজকাল বসে থাকো হাঁটু মুড়ে
প্রার্থনার ভঙ্গিতে মন্ত্র আওড়াও
হলুদ ঘাসফুল
নীল প্রজাপতি
নীল ঘাসফুল
হলুদ ডানা

এমনও এক দিন আসতে পারে, স্বপ্ন দ্যাখো,
যখন তোমার ছিঁড়ে যাওয়া বাতিল জামা দিয়ে
তৈরি হবে জাতীয় পতাকা

অস্থায়ী শিবিরও হয়তো মাটি খুঁড়ে পেলে
কখনও কখনও দেশ মনে হবে

অনেক পুরনো একটা নীলহলুদ সভ্যতার দেশ...
অথবা নতুন।

সামান্য মৃদু সংকেত

সকাল হতেই কত বার্তা এল চলমান ফোনে
গত বছরের চেনা, নামটাও ছিল নাকো মনে

তারাও প্রত্যেকে বলল : নতুন বছরে ভালো থেকো
আমাদের জন্মদিনে আমাদের নাম মনে রেখো

নতুন বছর, মানে, প্রত্যেকের আরও জন্মদিন
প্রীতি ও শুভেচ্ছা লেখা কত কার্ড যথেচ্ছ রঙিন
চলমান ফোনে ফোনে আরও কিছু বার্তা চালাচালি:
মনেই ছিল না, থ্যাঙ্ক্‌স, জন্মদিনে তুইই বাঁচালি!

সেলিব্রেট করা যাক, চলে আয় কোনও রেস্তোরাঁতে
অনেক অনেক দিন বসা হয়নি বন্ধুদের সাথে ...
অনেক অনেক দিন মানে ঠিক কত? ক'বছর?
ক'বছর দেখা নেই, ক'বছর শোনা নেই স্বর!

কে বা কাকে দেখে আর কে বা কার কোন্ কথা শোনে
রোমান হরফে শুধু বার্তা আসে চলমান ফোনে।

প্রাক্তনী অধিবেশন : এক

এ সমস্ত তখনকার কথা
যখন আমি রাকেশ শর্মাকে
বিয়ে করার কথা ভাবিনি।
শুধু ভালোবাসতাম।

হৈমন্তীর মা যখন
হাসতে হাসতে বলেছিল : এই, যাঃ
ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে—
আমি পাখির মতো মুখ উঁচু করে
পিছিয়ে নিয়েছি চোখের জল

দু'বছর পর রত্নাকে বললাম : বল্
আমি কি ওসব ভেবেছি?
বলতে বলতে আবার কান্না,
ঠোঁটমুখ বেঁকে একশা

রত্না! তুই হাসছিস!

আর আমি ভাবছিলাম
এতগুলো বছর পরেও কি
বন্ধুরা এসব শুনে ...

আগের মতো ...

চমকে ওঠে বোধ

গাছের মাথায় ফুরিয়ে এল রোদ
পায়ের তলায় কয়েকটি ঘাস ভিজে
আপাদ-শির চমকে ওঠে বোধ
আজও আমি বাঁচতে পারি নিজে!

আকাশ পেরোয় বকের শান্ত ডানা
ঘরমুখো নয়, বরং পরিযায়ী
তীরের ফলার চিহ্নে দিকনিশানা—
নিজেই নিজের পথের জন্য দায়ী

কোথাও নাতিশীতোষ্ণ এক হ্রদে
ওদের সঙ্গে গা ধুয়ে নেয় রোদ
এমন কিছু ভেবেই প্রতি পদে
আপাদ-শির চমকে ওঠে বোধ

শীতের বেলা ফুরিয়ে এলে দ্রুত
পথের বাঁকে বাঘের সঙ্গে দেখা

এখন সময় এমন উপদ্রুত
তবুও আমি বাঁচতে শিখি একা।

ঘরকন্না

রাজপুত্তুর তুমি, আমি রাজকন্যা।
মাটির প্রাসাদে আমাদের ঘরকন্না।।

ছোট্ট ঘরটি দিগন্তছোঁয়া রাজ্য।
সুখের নেইকো কোত্থাও পালাবার জো।।

রূপকথা দিয়ে ঘেরা রাজ্যের গণ্ডি।
আনন্দগুলো সবাই এখানে বন্দি।।

দু'বেলা দু'মুঠো চাল ফেলে দিই হাঁড়িতে।
একই পাতে খাওয়া খুনসুটি কাড়াকাড়িতে।।

দড়ির আলনা টানটান করে বাঁধা বেশ।
ওখানে ঝুলছে গোটা দুত্তিন রাজবেশ।।

দু'জনের দুটি জিন্‌সের প্যান্ট, ছিন্ন।
বাকি জামাগুলি যৌথ আর অভিন্ন।।

বিছানাবালিশ ঢাকা সাদামাটা চাদরে।
শীতের রাত্রি কাটাই আদরে আদরে।।

যেভাবেই হোক, দুই তিনমাস অন্তর।
ঝোলা পিঠে নিয়ে বেড়িয়ে আসি তেপান্তর।।

ফিরে আসি চোখে ভরে নিয়ে কত দৃশ্য—
সমুদ্র ... বন ...পাহাড় ...বিরাট বিশ্ব।

ছোট এই ঘর ভরে ওঠে নুড়ি ঝিনুকে।
দাম দিয়ে দেখি আর পাঁচজনে কিনুক এ।।

দরোজা জানলা সাজিয়ে রেখেছি আকাশে।
স্বপ্ন ছড়ানো ঘরের এপাশে ওপাশে।।

এখানে এস না দুঃখ — না, এখন না!
এখানে পেতেছি আমাদের ঘরকন্না...

মা-র জন্যে কাঁথাস্টিচের শাড়ি

তোমায় দেবো কাঁথাস্টিচের শাড়ি
মাগো, যখন আমার অনেক পয়সা হবে।
পাঁচহাজারি সাতহাজারি কেন
দশহাজারি পারব না কি দিতে
আমার যখন অনেক পয়সা হবে?
তদ্দিন মা, দাঁড়াও একটুখানি
দ্যাখো কেমন নিজেই তুলি ফোঁড় —
তোমায় যেমন-তেমন তো দেবো না
পাঁচজনেরই যেমনতরো আছে!

তোমায় দেবো স্মৃতির ঘরে বসে
শিশুবেলার নকশা থেকে টুকে
সত্যিকারের কাঁথার কথামালা।
আবয়সের সবরকমের রং।
শাড়িতে আজ গল্প লিখে চলি
মায়ের মেয়ের, তোমার আমার সাধ
জীবনসুতোয় দুঃখসুখের ফোঁড়

তোমায় দেবো ওমনি কাঁথাশাড়ি,
মাগো, যখন তেমনি মানুষ হব আমি।

বৃষ্টিতিন

১.
একা একাই ভীষণ জ্বরে ধুঁকছে ধুলোর রাজ্যটি
জ্বরবিকারের রুগীর মতো উঠছে কেঁপে কুজ্‌ঝটি
হঠাৎ কখন বৃষ্টি এসে
তার কপালে রাখল হেসে
আরোগ্যময় শান্ত হাতে ঠাণ্ডা সবুজ জলপটি।

২.
কখনও সে ঝিরঝিরে হাসিখুশি বালিকা
কখনও পা টিপেটিপে আসে অভিসারিকা
কখনও সে ধমকায়
সে-রাগের দমকায়
খসে যায় খোঁপা থেকে জুঁইফুলমালিকা।

৩.
বৃষ্টি রে, তুই ঝরতে পারিস যখন যেমন তোর খুশি
বাদলা হাওয়ার সঙ্গে মেতে উড়তে পারে তোর হুঁশই
তাই বলে তুই শেষকালে
অবুঝ খেলার আবডালে
বন্যা হয়ে সুখের বসত ভাসাস না রে রাক্ষুসি!

চন্দ্রডুবি অথবা মদ্যপের পদ্যভ্রম

সদ্যনামা সন্ধেবেলায়
মদ্যপানে মনখারাপি ভুলে
চন্দ্রযানের চড়নদারি
করতে গেলাম চক্রবালের কূলে।

চাঁদ ডুবালাম অন্ধকারে
কাঁদলে এখন ভাসবে না তো তরী
বেশ করেছি দোষ করেছি
আনব ডেকে পোষমানা সব পরী।

পরীরা সব পর হয়েছে
ডাকলে পরে ডানার হাওয়া দিয়ে
উড়ল উধাও। চাঁদকে আমি
খাদের থেকে তুলব কাদের নিয়ে!

সাজবিলাসী সাঁঝবেলাতে
চুর হয়েছি। চুল রেখেছি এলো
চন্দ্রাহত, ভগ্নহৃদয়,
গেলাস বলে এবার আমায় গেলো।

উপুড়গেলাস রাতদুপুরে
মাতাল নামে পাতালসিঁড়ি বেয়ে
চাঁদকে ছুঁয়ে কাঁদবে এবার
মদউচাটন বদচলনের মেয়ে।

অভিমানী একাদশী

মনে হয় নীলঘুড়ি
বহুদূর কোথা থেকে উড়ছে
আকাশে অলকমেঘ
ঘুড়িতে অলীক পাখা জুড়ছে
হতে পারে নীলঘুড়ি
তোমাদের ছাদ থেকে উড়ছে।

মিশুকে সুতোটি ধরে
তোমাদের কাছাকাছি আসতে

সাধ হয়েছিল বেশ
                    এমন বিকেলে ভালো   বাসতে
সুতোখানি কেটে দিল
                    অভিমানী একাদশী   কাস্তে

শৌখিন

কুড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁটে মেরেকেটে
দশটাকা মোটে রয়েছে পকেটে

এমন কী বেশি, কী এমন কম
খোসাঅলা আলু, কাশ্মীরি দম

ওটা তো ওমনি, মানে অমূল্য
সঙ্গে ক'খানা লুচিও ফুল্ল!

ভাবের ঘরেতে কোরো নাকো চুরি
লুচি কই, বলো হিঙের কচুরি

একটা দু'টাকা, আরও কী সুবিধে
তিনটে খেলেই মিটে যায় ক্ষিধে

গেল ছয়, হাতে বাকি থাকে চার
নেহাত গরিব, নেহাত নাচার

দরাদরি করে কিনি গোটা দুই
ছোট বেল মালা, পাশে নিয়ে শুই ...

একরাত্তিরের পালা

চরিত্রলিপি

বাতি,
মিনার : বাতির প্রাক্তন প্রেমিক,
রিনা : বাতির প্রাক্তন বান্ধবী,
ছায়া : বাতির প্রতিরূপ
(চরিত্রগুলির বয়স ৩০-৩২ বছর)

দৃশ্য : ১

- **একটিই ঘর। ঘরে বিষণ্ণ আলো আঁধারি। ঘরের একপাশে একটা এক-বিছানার খাট, খাটের পাশে ক্রেড্‌ল-এ একটা কর্ডলেস টেলিফোন। এককোণে একটা টেলিভিশন, তার ওপরে রিমোট কন্ট্রোলটা রাখা, ঘরের অন্যপাশে টেবিল চেয়ার। বাতি টেবিলে বসে কিছু লিখছে মন দিয়ে। দেয়ালে একটি ঘড়ি টাঙানো। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে।**
ঘড়ির শব্দে বাতি যেন চমকে ওঠে, তার মগ্নতা ভেঙে যায়। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকায়, বারোটা ঘন্টা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করে। তারপর ফেরে দর্শকদের দিকে।

বাতি ॥ নমস্কার! প্রিয় ভদ্রমহোদয়গণ। আমি বাতি।
আপনাদের কাছে পেয়ে ভালো লাগছে, কেননা এ রাতই
আমার জীবনে শেষ রাত,
শেষ মানুষের মুখোমুখি বসা।
আজ রাতে কেটে যাচ্ছে পৃথিবী নামক গ্রহদশা।

অথচ কী ভালো লাগছে! আপনাদের এত কাছাকাছি
পেয়ে যেন মনে হচ্ছে বেঁচে গেছি, লোভ হচ্ছে—বাঁচি!
অজস্র পুরনো স্মৃতি কথা হয়ে ছুটে আসছে ঠোঁটে,
শেষমুহূর্তে এই হাত থমকে আছে সুইসাইড নোটে ...

না না, ভদ্রমহোদয়গণ!
আপনাদের কোনও চিন্তা নেই,
নাটকের শেষ দৃশ্যে যা ঘটার সেটা তো ঘটবেই।

তবে কিনা, কষ্ট হয়। সত্যি বলছি, এত হাসি লাগে!—
কাব্যনাট্য শুরু হচ্ছে আত্মহত্যাটির ঠিক আগে ...

- **বাতি হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে টিভি চালিয়ে দেয়। টিভিতে শুধুই দ্রুত সঞ্চরণশীল রঙিন আলোর বিচ্ছুরণ, সেই সঙ্গে কথাহীন সুরের উন্মাদনা। বাতি খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে আবার দর্শকদের দিকে ফেরে।**

বাতি ।। আসলে, এখনও আমি বেঁচে আছি এটা কিন্তু ঠিক।
তবে, এই বাঁচাটাই, সত্যি বলতে, — চূড়ান্ত অলীক।
জীবন নাটকমাত্র, মগজ সচল একটি টিভি,
চ্যানেলে চ্যানেলে তার আত্মহত্যামোহিত পৃথিবী ...

- **টিভির মধ্যে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কণ্ঠস্বরটা পুরুষের।**

টিভি ।। আত্মহত্যা! ওই রোগ আমার শরীরে কবে পেলে!
তুমি মিষ্টি মেয়ে, সোনা! আমিও তো মিষ্টি একটা ছেলে
তোমাকে শেখাই এস যৌনতার সাম্প্রতিক ধাপ —
তৃতীয় বোতামটি খোলো। ... জানো, আত্মহত্যা মহাপাপ?

বাতি ।। **(অন্যমনস্ক স্বরে)**
আত্মহত্যা মহাপাপ! এই কথা বলেছিল সেও,
যদিও হাসির ছলে, বলেছিল — অযথা পাগলামি—।
সেই স্বর ... সেই হাসি ... টিভির ভেতরে তবে কে ও —
সেই লোক, যাকে চেয়ে এতদিন মরে গেছি আমি!

- **টিভি শব্দহীন হয়ে যায়, আলোর বিচ্ছুরণ চলতে থাকে। মঞ্চে প্রবেশ করে মিনার, তার পোশাক নিপুণ ফ্যাশন-অনুসারী। তার সমস্ত মুখে ও অবয়বে টিভির রঙিন আলো খেলতে থাকে, যেন একটা মায়া তৈরি হয়।**

মিনার ।। এতদিন বলছ কেন বাতি! আজ নয়?
আমি জানি আজও তুমি আমাকে তেমনই ভালোবাসো
বাকি সব ভুলে যাও, ভুলে যাও পুরনো সময়,
আমি তো এসেছি ফিরে, দ্যাখো! চোখে চোখ রেখে হাসো।

বাতি ॥ (হেসে উঠে)
চমৎকার! এ যে দেখছি রীতিমতো মাদারির খেল!
এইমাত্র দেখছিলাম তুমি দিব্যি শাণিত মডেল—
টিভি থেকে নেমে এলে পূর্বতন প্রেমিকের বেশে!
মনে হচ্ছে আজ রাতে মরে যাওয়া যাবে স্রেফ হেসে!

কিন্তু, এ কি সত্যি সত্যি তুমি?
নাকি স্বপ্ন, ভুল স্বপ্ন কোনও!
এ চোখ ভুলেছে শুধু ঘুমই
স্বপ্ন দেখতে ভোলেনি এখনও ...

● **বাতি ধীরে ধীরে মিনারের দিকে এগিয়ে যায়, তার হাত স্পর্শ করে, যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না।**

বাতি ॥ না না, তুমি স্বপ্ন নও, তুমি সত্যি, প্রবল বাস্তব,
এই তো সেই স্পর্শ, সেই চোখ ... মুখ ... দেখতে পাচ্ছি সব!
একদিন তুমি স্বপ্ন ছিলে, জানি। আজ বাস্তবিক —
মিথ্যে প্রেমিকের চেয়ে বেশি সত্যি হারানো প্রেমিক।
(নিজেকে সামলে নেয় সে, স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চেষ্টা করে)
বলো, তবে কীরকম আছ, এখানে কী করে এলে আজ?
প্রেমিকারা সব ভালো আছে? ভালো চলছে, সিনেমার কাজ?

মিনার ॥ তোমাকে কয়েকটি কথা বলব বলে এসেছি এখানে।
যথেষ্ট ঘুরেছি আমি সাফল্যের জটিল ময়দানে,
আপাতত কিছুদিন বিশ্রামের বড় প্রয়োজন —
একটু নির্জনতা চাই, নির্জনে একান্ত প্রিয়জন ...
বন্ধু তো অনেক আছে, বান্ধবীও আছে একটি দুটি,
তাদের সবার কাছে চেয়ে নিয়ে ক'দিনের ছুটি
ফিরেছি তোমার কাছে, বাতি!

বাতি ॥ এ কী পালটি গুরু! রাতারাতি!
এতদিন পরে কিনা প্রয়োজন পড়েছে আমায়!

নির্ঘাৎ ফেঁসেছ কোনও বড় ধরনের হাঙ্গামায়
পালিয়ে এসেছ তাই পরিত্যক্ত পুরনো ডেরাতে,
নাটক জমিয়ে দিচ্ছ আজ এই আত্মহত্যারাতে!

মিনার ॥ বাতি! প্লিজ এমন কোরো না,
এখনও কি তোমার ধারণা
রিনাকেই সঙ্গে নিয়ে আমি চলে গিয়েছি মুম্বই?
এটা কিন্তু ভুল, সোনা! আমি আজ সে কথা বলবই —
কিন্তু তুমি এত রেগে আছ, কিছু শুনতেই চাইছ না,
যতখানি ভাবো আমি ততটা খারাপ নই, সোনা!
মানছি যে রিনার সঙ্গে হয়েছিল একটা অ্যাফেয়ার—
কিন্তু ও তোমারই বন্ধু, একসঙ্গে আড্ডা মারলে আর
কী করে আটকাব বলো প্রেমে পড়া, ... সামান্য দুষ্টুমি ...
তাই বলে এত বড় ডিসিশন নিয়ে বসবে তুমি —
আমরা, মানে, আমি আর রিনা, সেটা ভাবতেই পারিনি।
যেদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, তার পরদিনই
রিনাও আমায় ছেড়ে চলে গেল কৌশিকের কাছে।
বড্ড নেশা হয়েছিল, তবু পরিষ্কার মনে আছে
যথেষ্ট সেয়ানা আর স্মার্ট নই, রিনা সেই দোষে
আমাকে থাপ্পড় মারল, গ্লাস ভাঙল গভীর আপশোসে

তারপরই শহর ছেড়ে চলে গেছি একা, নিরুদ্দেশে ...
আজ এতদিন পর আবার তোমার কাছে এসে
চেয়েছি নিভৃত আশ্রয়!

বাতি ॥ **(ক্লান্ত স্বরে)**
না মিনার, আর তো সময়
নেই বন্ধু! ... ফিরে যাও ... ঢুকে যাও টিভির ভেতরে,
বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করছে এ সমস্ত সত্যি মনে করে।
কিন্তু কেন বাঁচব বলো! কোন্ মুখে বেঁচে থাকা যায়
যদি দেখি প্রেমিক ও বান্ধবীকে আমারই শয্যায়!

● **বাতি দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসে মিনারকে একা রেখে।**

বাতি ॥ বড় ইচ্ছে করল মরে যেতে, ভদ্রমহোদয়গণ!
ইচ্ছেটাকে আঁকড়ে রেখে বাঁচতে বাঁচতে ক্রমশ যখন
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলো, এসে গেল এই শেষ রাত —
উলটোপালটা সাধ এসে পেড়ে ফেলছে আমাকে হঠাৎ ...

প্রেমিক ও বান্ধবীকে একই বিছানায় ফেলে রেখে
যখন বেরিয়ে যাচ্ছি আমারই শোওয়ার ঘর থেকে
আত্মহত্যা করব বলে, মিনার চেঁচিয়ে বলেছিল—
হোয়াট্স্ দ্য হার্ম বেবি! ইফ্ আই ওয়ানা চেঞ্জ মাই পিলো!
(বাতি হঠাৎ হাসতে শুরু করে, তার হাসিতে যন্ত্রণা ধ্বনিত হয়।)
হ্যাঁ, ও এমনই ছিল ... এরকমই দুষ্টু ... মজাদার!
ওকে ছেড়ে থাকতে বেশ কষ্টই তো হয়েছে আমার।
ভুলে থাকা অসম্ভব, কেননা, ও বলিউডে গিয়ে
তারা হয়ে ঝরে পড়ছে টিভি-পত্র-পত্রিকা ছাপিয়ে ...
পাঁচবছর হয়ে গেল, ভাল্লাগে না এত একা একা।
নাটকে প্রথম দৃশ্যে অতএব তার সঙ্গে দেখা।
এই শেষ দেখা, শেষ কথা বলা। হোক মিথ্যে—তাও
ভালো লাগল। ... যাও ... তুমি আবার টিভিতে ফিরে যাও ...

- **কথা বলতে বলতেই বাতি রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিয়ে টিভি বন্ধ করে দেয়। মিনারের ওপর সমস্ত আলো নিভে গেলে সেও অন্ধকারে গা মিশিয়ে বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে। বাতির কথা শেষ হলে সম্পূর্ণ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।**

দৃশ্য : ২

- **মঞ্চে আবার আলো জ্বললে দেখা যায় বাতি বিছানায় শুয়ে আছে। সামান্য কিছু সময় পরে সে উঠে বসে। ঘড়ি দ্যাখে।**

বাতি ॥ রাত ঘন হয়ে আসছে। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।
আরও বাকি কত কথা! ... আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি নাকি
উলটোপালটা বকে বকে? আসলে কি, সাহস সঞ্চয়
করতে চাইছি ভেতরে ভেতরে ... তবু তীব্র একটা ভয়
নড়ে উঠছে বুকে, পেটে, ... চুঁয়ে পড়ছে মেরুদণ্ড ঘিরে ...

এমনকী প্রতিটি শ্বাস দীর্ঘ হয়ে বুকের গভীরে
ফিরে যেতে চাইছে ফের। আহা, এ যে কী টানাপোড়েন!
... আমি তো প্রথম বুঝছি, ... আপনারাও কি প্রথম দেখছেন?

- **বাতি উঠে দাঁড়ায়। ছটফট করে। দু'হাতে কপাল টিপে ধরে। তারপর অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।**

বাতি ॥ নাহ্ ... এটা ঠিক নয়। এ হতে দিতে পারি না আমি।
এ রাতের একটি পলও সমস্ত আয়ুর চেয়ে দামী।
প্রতিটি মুহূর্তে অতি সাবধানে পা মেপে মেপে
শেষ দৃশ্যে পৌঁছতেই হবে, তাই ভীষণ সংক্ষেপে
আপনাদের বলে যাব আরও কিছু প্রয়োজনীয় কথা—
(সে শান্ত হয়ে দর্শকদের দিকে তাকায়, তাদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশকরে, তার কণ্ঠস্বর তীব্র)
যে শর্তে এখানে আজ সমবেত সুধীজন,
সে শর্তের হবে না অন্যথা।
আছে, আরও গল্প আছে, কৌতূহলোদ্দীপক কৌতুক,
অতিশয় মনোগ্রাহী আমার এ বিচিত্র অসুখ।
এ অসুখে স্মৃতি আর স্বপ্ন মেশে সাধে ও আহ্লাদে,
যে মেয়েটি আত্মহত্যা করবে আর কিছুক্ষণ বাদে
তার কাছে ফিরে ফিরে আসতে চাইছে পূর্বজন্মস্মৃতি—
সব মিলিয়ে ঘেঁটে যাচ্ছে প্রচলিত সব নাট্যরীতি।

- **হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। বাতি খেই হারিয়ে ফোনের দিকে এমন অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন ফোন ধরার কথা মনে পড়ছে না তার। তারপর সে টেলিফোনের দিকে এগোয়।**

বাতি ।। কে ডাকছে আমাকে, এত রাতে!
কে গো! কে! কার আলতো হাতে
বেজে উঠছে এই জাদুস্বর!
আমাকে পড়েছে মনে কার যেন, বহুদিন পর ...
(সে ফোন তুলে নেয় কানে)
হ্যাঁ ... হ্যালো! ...হ্যালো, আপনি কে?

- **নেপথ্য থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, যেন ফোনের অপর প্রান্ত থেকেই। কণ্ঠস্বরটি নারীর।**

ফোন ॥ গলা শুনে বলো দেখি, চিনতে পারো কিনা বান্ধবীকে!

বাতি ॥ আবার পুরনো দিন! চেনা স্বর! হারানো সময়!
এই ঘর মঞ্চমাত্র, নাটকের পুনরাভিনয়
ঘটবে বলে বসে আছি, তুমি বলছ চিনতে পারছি কিনা!
এই শেষ রাত্রি অবধি তোমাকে ভুলিনি আমি, রিনা!

- **রিনা মঞ্চে প্রবেশ করে। তার কানে চাপা সেলফোন। এরা দু'জনেই কিন্তু কথা বলতে বলতে কান থেকে ফোন নামিয়ে রাখবে, ফোনালাপ মিলেমিশে যাবে সরাসরি কথার সঙ্গে।**

রিনা ॥ জানি বাতি, আমাকে যে ভোলা অসম্ভব, আমি জানি।
তারওপর, বরাবরই তুই একটু বেশি অভিমানী,
পান থেকে চুন খসলে সম্পর্ক চুকিয়ে দিস রাগে,
ভাবিসও না, এতে তোর বন্ধুদের কীরকম লাগে?

বাতি ॥ (হাসতে হাসতে)
সম্পর্ক কাহাকে বলে? লিখ, বন্ধু বলিতে কী বুঝ —
মনে বা হৃদয়ে নয়, শরীরে শরীরে তাকে খুঁজো।
... কোথায় কী খুঁজি বল্ তো, যা নেই আমার সিলেবাসে ...
পড়েছি সহজ পাঠ, পরীক্ষায় শক্ত প্রশ্ন আসে ...

রিনা ॥ আচ্ছা বেশ, ক্ষমা চাইছি, মানছি হয়ে গেছে একটু ভুলই।
অথচ বিশ্বাস কর, তোকে আজ বলছি খোলাখুলি—
মিনারের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিনি কিন্তু আমি।
ওর একটা বন্ধু জুটলো, গোয়ানিজ ছেলে, সমকামী,
তার সঙ্গে মিনারের সে কী কাণ্ড! সে কী অশ্লীলতা —
তোকে যে কী বলব বাতি, সে সমস্ত কী লজ্জার কথা ...
মুখ বুজে সহ্য করব তেমন মেয়ে তো আমি নই,

কৌশিককে বিয়ে করলাম। মিনার তো পালালো মুম্বই
ছোকরাটাকে সঙ্গে নিয়ে —

বাতি ।। থাক্ থাক্, চুপ কর, রিনা!
এ অপূর্ব রূপকথা শুনে হাসি সামলাতে পারছি না।
তোর গল্প শেষ কর। বল্ তোর এখানে কী চাই,
আত্মহত্যারাতে তুইও আবির্ভূতা হলি কেন ভাই!

রিনা ।। হ্যাঁ রে, আমি ফোন করছি ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়ে।
স্বার্থপর ভাববি তুই, কিন্তু বল্, কারই বা ওপরে
ভরসা করা যায় আর, তোর মতো ভালো বন্ধু ছাড়া —
আমি জানি, এ বিপদে একমাত্র তুইই দিবি সাড়া।
আসলে না, আমাদের কাগজের চিফ্ এডিটার
আমার রিপোর্ট পড়ে খুশি হয়ে — এই, দু'একবার
সেলিব্রেশনের জন্যে ডেকেছেন নিজের বাড়িতে,
একটু রাত হয়ে যায়, কিন্তু স্যার নিজের গাড়িতে
পৌঁছে টৌঁছে দিয়ে যান। আজকে একটু বেশি রাতই হলো,
বাড়ি এসে নক্ করছি, দরজা বন্ধ। চেঁচালাম—খোলো!
কৌশিকও ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—ইউ ব্লাডি বিচ,
গো ব্যাক টু দ্য হেল ইউ'র্ কামিং ফ্রম। ... ভাব, এত নীচ!
এরকম করবে জানলে ওকে আমি করতামই না বিয়ে!
এই অন্ধকার রাতে আমি একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে
ভেবে ভেবে শেষ অবধি তোকে ফোন করছি মোবাইলে
বাতি! প্লিজ! মরে যাব আজ একটু আশ্রয় না দিলে ...

বাতি ।। না না বন্ধু, কে যে কীসে মরে কিংবা বাঁচে
সে প্রসঙ্গ তুলো না একবারও!
কিন্তু রিনা, তোমার তো এডিটার আছে,
তার কাছে গেলেই তো পারো?

রিনা ।। **(আপশোসে হাত ঝাঁকায়)**
এডিটার! সে তো বিবাহিত।
বাড়িভর্তি বউ ছেলেমেয়ে।

এখন সেখানে গেলে কালই
সে আমার চাকরি নেবে খেয়ে।
(ফুঁপিয়ে ওঠে)
কী ফ্যাসাদে পড়েছি রে বাতি,
আমার কপালে এ কী গেরো—
প্রেমিক নামিয়ে গেল পথে,
বর বললো—বাড়ি থেকে বেরো!

বাতি ।। তুই তবে সত্যিসত্যি পড়েছিস বুড়োটার প্রেমে?

রিনা ।। উফ্, বাতি! তুইই বল্, সম্পর্ক কখনও থাকে থেমে!
প্রথমে প্রশংসাবাক্য. অতঃপর মিটিঙের ছলে
আমাকে চেম্বারে ডেকে বুড়ো কাছে টেনেছে সবলে
তারপর কয়েকটা চুমু, দু'একবার উইক এন্ড ট্যুর,
কৌশিক অফিসে থাকলে বাড়িতেও দু'একটা দুপুর ...
আমরা তো কেউই নই তুলসীপাতা, গঙ্গাজলে ধোয়া
চাকরিতে উন্নতি করতে বস্ টস্-এর সঙ্গে একটু শোয়া-
এসব তো করতেই হয়, তা না হলে বল্ কী উপায়ে
মেয়ে হয়ে এতদিনে দাঁড়িয়েছি নিজের দু'পায়ে!

বাতি ।। **(তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বরে)**
ঠিক! ঠিক বলেছিস তুই,
এই না হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে!
যে-কোনও লোকের সঙ্গে শুই,
কম নই ছেলেদের চেয়ে!
(হঠাৎ গভীর হয়ে ওঠে তার স্বর, আকুল)
কিন্তু রিনা, বল্ দেখি তবে
শেষ ভালোবেসেছিস কবে!

রিনা ।। **(চমকে ওঠে)**
ভালোবাসা! ... ভুলে গেছি, ভুলে গেছি শব্দটার মানে ..

বাতি ।। শুধু তুই নয় রিনা। প্রত্যেকেই এখন এখানে
তোরই মতো স্মৃতিহীন। যাবতীয় সত্যটুকু ভুলে
মিথ্যে সময়ের হাতে পরিণত হয়েছে পুতুলে —

- **বাতি হঠাৎ রিনার দিকে এগিয়ে যায়। তার হাত চেপে ধরে। তার চোখমুখ অস্বাভাবিক, উত্তেজিত।**

বাতি ।। না রে, রিনা! নাটকের মধ্যিখানে পুতুলের নাচ
কেমন বেয়াড়া ঠেকছে, — আয়, সুতো কেটে দিই, বাঁচ —
বাঁচতে হলে মানুষের মতো বাঁচ, তা নাহলে মর,
দু'জনে একসঙ্গে মরলে ফের বন্ধু হবো পরস্পর!

রানি ।। (সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে)
কী বলছিস উলটোপালটা! শুধু শুধু মরতে যাব কেন?
মুশকিলে পড়েছি, ঠিকই, তাই বলে দিগ্বিদিকজ্ঞানও
এভাবে হারাতে হবে! তোর দেখছি মাথার বারোটা
বেজে গেছে একেবারে, হুঁশগম্যি নেই এক ফোঁটা!
এখানে না থাকতে দিলে অন্য বন্দোবস্ত করে নেব —

বাতি ।। সেই ভালো, বন্ধু। তবে, তার আগে আরেকবার ভেব
যে জীবন বেছে নিলে, সে জীবনে এ কেমন বাঁচা?
কেরিয়ারে ব্যাভিচারে দমবন্ধ ছোট্ট একটা খাঁচা!
অবশ্য এ সব কথা কোন্ বুদ্ধিমানে আর শোনে!
দুঃখিত ... তোমাকে আমি ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি ফোনে ...

- **বাতি ফোনটা ক্রেড্‌ল-এ রাখে, রাখতেই রিনা বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে। বাতি কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে দর্শকদের দিকে তাকায়।**

বাতি ।। এ আমার বন্ধু, রিনা, নামী কাগজের সাংবাদিক।
অত্যন্ত সফল, আর জায়গা বুঝে দারুণ নির্ভীক।
অথচ দেখুন, ভদ্রমহোদয়গণ, ট্র্যাজেডিটা —
আপাতস্বাধীন এই মেয়েটিও সামান্য রক্ষিতা!

দারুণ লেখার হাত, কিন্তু সেই প্রতিভার চেয়ে
আরও বড় গুণ হলো, রিনা একটি কমবয়েসি মেয়ে
সেই গুণে, কিংবা পাপে, সে নিজেও মুগ্ধ হয়ে আছে,
অথবা সে ভয় পাচ্ছে, চাকরিটা খোয়াতে হয় পাছে
হতে পারে, এও একটি অনিবার্য জীবনসংগ্রামই!
এসব জটিল অঙ্ক ভালো বুঝতে পারি না তো আমি ...
এর চেয়ে সোজা একটি অন্য অঙ্ক নিয়ে ভেবে ভেবে
শেষমেশ আত্মহত্যা মিলে যাচ্ছে আমার হিসেবে।

- **বাতি নিজের গলায় দুটি হাত রেখে ওপরদিকে তাকায়। তার ওপরে তীব্র আলো পড়ে। তারপর মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।**

দৃশ্য : ৩

- **মঞ্চে আলো ফুটলে দেখা যায় বাতি সারা ঘরে এলোমেলো পায়চারি করছে। তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে মঞ্চে, ছায়াও চঞ্চল। বাতি এমনভাবে হাঁটছে, যেন সে তার ছায়াকে অনুসরণ করছে।**

বাতি ॥ ঘুরে মরছি, ঘুরে ঘুরে ঘুরে মরছি, বেরোতে পারছি না।
আলো থেকে অন্ধকার, ভালোবাসা থেকে ফের ঘৃণা,
ঘৃণা থেকে ভালোবাসা, অন্ধকার থেকে ফের আলো —
এ কেমন ভুলভুলাইয়া ... পথও যাতে নিশানা হারালো ...
এত আলো আঁধারিতে চোখে দেখতে পাচ্ছি না তো কিছু,
ঘুরে ঘুরে ছুটে মরছি নিজেরই ছায়ার পিছু পিছু —

- **হঠাৎ সে নিজের ছায়ার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছায়াকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে ওঠে।**

বাতি ॥ না! থামো! থেমে থাকো! অনর্থক এমন ছটফট
কেন করছ! মনে রেখো, নাটকের সব দৃশ্যপট
আগে থাকতে সুনির্দিষ্ট। তার থেকে কোথায় পালাবে?
স্থির হও, অকারণে দেরি করিও না এইভাবে —

● **ছায়া কথা বলে ওঠে। অন্ধকারে মঞ্চে প্রবেশ করে বাতির ছায়া, তার প্রতিরূপ। মৃদু আলোয় তার অবয়বটুকুর শুধু আভাস পাওয়া যায়।**

ছায়া ॥ অকারণ! না গো, অকারণে দেরি করছি না গো, বাতি!
ছটফটাচ্ছি কেন জানো? মনে পড়ে গিয়েছে হঠাৎই
কালকেই দেখেছি আমি দক্ষিণের পাঁচিলের গায়
অযত্নে জন্মানো একটা নয়নতারা গাছের আগায়
ছোট্ট একটা কুঁড়ি, তার পাপড়িগুলো খুলে যাবে কাল —
শুধু সেই ফুলটিকেই দেখব বলে আরেকটি সকাল
আসে যদি এ জীবনে, তাতে বলো কী এমন ক্ষতি —

বাতি ॥. ব্যাস্ ব্যাস্! অনেকক্ষণ থেকেই তোমার মতিগতি
সুবিধে ঠেকছে না বাপু, বুঝতে পারছি আসল ব্যাপার,
মরবে বলে ক্ষেপে শেষে বাঁচতে সাধ হয়েছে ক্ষ্যাপার!

ছায়া ॥ ধরো যদি তাই হয়, সেটা কোনও অন্যায় তো নয়!
বরং মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে মনে হয়,
মরলে তো ফুরিয়ে যাব, সে মৃত্যুতে আমার কী লাভ!
এ প্রশ্নের মুখোমুখি হাতড়ে যাচ্ছি নিজেরই জবাব ...

বাতি ॥ এ প্রশ্নের মানে নেই, এ প্রশ্নের জবাব মেলে না।
লাভ্‌ক্ষতির প্রশ্ন নয়। এ জীবন আজন্মের দেনা
যত দ্রুত শোধ দেবে, শোধ করা হবে তত সোজা,
দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে সুদ-আসলে যন্ত্রণার বোঝা।

ছায়া ॥ জানি জানি, তবু ঐ যন্ত্রণারই কী প্রচণ্ড মায়া!
সারাগায়ে রক্ত ঝরছে, তবু আমি এমন বেহায়া—
যে আমাকে ছুঁড়ে ফেলছে, আঁকড়ে ধরছি তাকেই আবার,
হ্যাঁ রে বাতি, ফুরোচ্ছে না জীবনের আকাঙ্ক্ষা আমার!

বাতি ॥ **(অধৈর্য হয়ে ওঠে)**
উফ! না, বেহায়া শুধু নয়, একটি গণ্ডমূর্খ, ন্যাকা,
ভেবেছ — এখনও তুমি বেঁচে থাকতে পারবে একা একা!

কিংবা না, একাও নয়, দুনিয়ার রীতিনীতি মেনে
দু'দিন পরেই নেবে আরেকটি মানুষকে কাছে টেনে।
অতঃপর পুনরায় গোড়া থেকে পুরনো নাটক — ,
না, প্লিজ! সেটা হলে ক্ষেপে যাবে সমস্ত দর্শক!
(দর্শকদের সাক্ষী মানে সে)
ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন তো, এ কী মহাজ্বালা!
এ শেষে ভুলেই গেল এটা ওর আত্মহত্যাপালা!

- **হঠাৎ বাতির সম্বিৎ ফেরে। সে স্বপ্নোত্থিতের মতো তাকায়। আলো আঁধারির মধ্যে একফাঁকে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় ছায়া, চুপিচুপি। মঞ্চে আলো বাড়ে। বাতি চারপাশে ও নিজেকেও, দেখতে থাকে বারবার। নিজের মনেই কথা বলে।**

বাতি॥ ওর ... মানে ... ওর নয়, ও মানে আমিই তো ... আমি ...
নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলছি ... চূড়ান্ত পাগলামি...
যতক্ষণ বেঁচে থাকব, বেড়ে যাবে এই মনোরোগ,
এ অসুখ বয়ে বয়ে বেড়ানোর কী যে দুর্ভোগ —
গলিত শবের মতো ক্ষত দেখি জীবনের মুখে
অন্যকে অসুস্থ দেখি আমারই এ মাথার অসুখে
(সে হাসতে শুরু করে পাগলেরই মতো)
সম্পর্ক জটিল ব্যামো, তারওপর দারুণ ছোঁয়াচে,
এ ব্যামো ধরেছে যাকে, সে বেচারা ঝুলতে ঝুলতে বাঁচে
সরু একটা সুতো ধরে, সে সুতোও মুহুর্মুহু ছেঁড়ে,
সুতো ছিঁড়ে পড়তে পড়তে অন্য কারও সুতো নেয় কেড়ে ...
এমত অপূর্ব খেলা চলিতেছে হেথা অবিরাম।
খেলায় হারিয়া শেষে পলাইতেছি ছাড়ি ধরাধাম।।

- **হঠাৎ মঞ্চের সমস্ত আলো নিভে যায়।**

বাতি॥ এ কী! এ যে লোডশেডিং! মধ্যরাতে নিভে গেছে বাতি —
দারুণ রূপক কিন্তু! যথোপযুক্ত, ফাটাফাটি!
শহরের বাতি গেছে, এই ঘরে বাতি কিন্তু বেঁচে,
অন্ধকারে বুঝতে পারছে তার বড্ড পিপাসা পেয়েছে!

মঞ্চে ঝাপসা আলো ফুটে ওঠে। এখনও লোডশেডিং, কিন্তু এই সামান্য আলোয় বাতিকে অল্প অল্প দেখা যায়। সে কথা বলে চলেছে।

বাতি ॥ পিপাসা! অদ্ভুত লাগছে। মরতে যাচ্ছি, তবু তেষ্টা পায়!
দূর! জল খাব কেন? এগুলো তো জৈবনিক দায় —
না মেটালে আর তো কোনও ক্ষতি নেই। ...কিন্তু গলা কাঠ...
নাহ্, জল খেতে হবে ... জীবনের শেষতম ঘাট
ছেড়ে চলে যাচ্ছি তবু প্রলোভনে উথলে উঠছে নদী —
আহা ... তোর ঐ জলে সব তেষ্টা মেটাতিস যদি ...

আবার প্রলাপ বকছি । না—ব্যাস্—এই ... এই চুপ!
চেপে ধরছি এই মুখ, সুধীবৃন্দ, আপনারা বিরূপ
হবেন না দয়া করে ... এই—এই জ্বালিয়েছি মোম...
জলের বোতল খুঁজব, ... জল খাব ...
তারপরই নাটক খতম।

বাতি মোম জ্বালিয়েছে। মোমবাতিটা হাতে নিয়ে সে জলের বোতল খুঁজতে থাকে। পায় না। অস্থির হয়ে ওঠে।

বাতি ॥ বোতলটা কোথায় গেল! এইমাত্র দেখেছি এইখানে!
রাত্রি যে ফুরিয়ে আসছে শুধু একটু জলের সন্ধানে ...
জল ... একটু জল খাব ... মরব না গো এত তেষ্টা নিয়ে ...
রাত্রি ... একটু থামো রাত্রি ... এত দ্রুত যেও না ফুরিয়ে ...

বাতি জল খুঁজতে থাকে। দরজায় মৃদু আওয়াজ হয় কড়া নাড়ার। বাতি চমকে ওঠে। মোমবাতিটা রাখে টেবিলের মাঝখানে।

বাতি ॥ কীসের আওয়াজ! কেউ কড়া নাড়ছে আমার দরজাতে!
কে! কে হতে পারে!
কে ... কে এসেছে এত রাতে!
কিন্তু কড়া নাড়ছে কেন! দরজাতে তো রয়েছে কলিং —
(কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে হেসে ওঠে, মাথা নাড়তে থাকে)
ওহো! বেল বাজবে আর কোন্ মন্ত্রবলে, — লোডশেডিং ...

আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়। এবার স্পষ্ট এবং বেশ জোরে।

বাতি ॥ ঐ ... ফের কড়া নাড়ছে ... ভয় করছে ... এত রাতে কে ও!
মনে হচ্ছে শেষমুহূর্ত সমাগত এই নাটকেও!
(সে দর্শকদের দিকে তাকায়, সামনে এগিয়ে আসে)
হ্যাঁ, সত্যি তাই, ভদ্রমহোদয়গণ!
আমি জানি কে এসেছে।
আপনারা যে এই এতক্ষণ
ধৈর্য ধরে এই তুচ্ছ কাব্যনাট্য দেখলেন সবাই
সেজন্যে কৃতজ্ঞ আমি। ... আপনারা বসুন, ... আমি যাই!

বাতি পিছিয়ে যায়। পিছন ফিরে চলে যেতে থাকে। যেতে যেতে আবার ফিরে আসে সে। দর্শকদের দিকেই তার মুখ। নেপথ্যে কড়া নাড়ার আওয়াজটা চলতেই থাকে ক্রমাগত, অপেক্ষাকৃত আস্তে।

বাতি ॥ মনে থাকবে? আমি বাতি। মনে থাকবে আমার কাহিনী?
কিংবা হয়তো আপনাদের আমি কিছু বোঝাতে পারিনি।
সম্ভবত তাই। নাকি, বুঝেছেন? সত্যি বুঝেছেন?
(তার মুখে আলো পড়ে, বাকি মঞ্চ অন্ধকার। তার মুখে অনির্বচনীয় ভয়)
আমার বড় ভয় করছে ... প্লিজ, একটু সাহস দেবেন?

কড়া নাড়ার আওয়াজ বেড়ে ওঠে। মুহুর্মুহু কড়া নাড়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় আর বৃষ্টিপাতেরও শব্দ আছড়ে পড়ে মঞ্চে।

বাতি ॥ (চেঁচিয়ে ওঠে)
যাচ্ছি! যাচ্ছি! এত শব্দ করছ কেন? আস্তে!
রাত তিনটে বেজে গেছে, তুমিই তো দেরি করলে আসতে,
নিজে নিজে দেরি করে শেষমুহূর্তে লাগিয়েছ তাড়া —
আমি তো প্রস্তুত! তবে কেন এ তুমুল কড়া নাড়া?

বলতে বলতেই মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় বাতি, যেন দরজা খুলতে। দরজা খোলার আওয়াজ হয়। ঝড় ও বৃষ্টিপাতের শব্দ বেড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরে রাখা মোমবাতিটাও নিভে যায় দপ্‌ করে।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর অন্ধকার মঞ্চের নেপথ্যে বেজে ওঠে অন্য একটি স্বর, পুরুষ, কিংবা নারীর।

নেপথ্যস্বর ।। কে নেভাল বাতিখানি? ঝড়? বৃষ্টি? নাকি অন্ধকারই?
সেকথা জানে না কেউ, জানাটা যে তেমন দরকারী
এমনও তো মনে হয় না। শেষ দৃশ্যে যবনিকা নামে।
দর্শকেরা ভুলে যান একটি মেয়ে ছিল, বাতি নামে।

আবার সকাল হবে, দিকদিগন্তে জ্বলে উঠবে আলো।
মানুষ মানুষকে বলবে—কেমন আছেন, সব ভালো!
সকলেই মাথা নাড়বে, হাসবে, যেন খুব ভালো আছে,
আসলে প্রত্যেকে জানে প্রত্যেকে কেমন করে বাঁচে।

জানে, কিন্তু ভুলে থাকে। প্রাণপণে ভুলে থাকতে চেয়ে
নিজেকে বোঝাতে চাইবে বাতি একটা উলটোপালটা মেয়ে,
আত্মহত্যা করেছিল অকারণে অবসাদে ভুগে।
এই কথা ভেবে তারা মেতে উঠবে বিবিধ হুজুগে।

হুজুগ ফুরিয়ে এলে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে
স্পষ্ট দেখবে একটা মোম নিভে যাচ্ছে বাতাসের ফুঁয়ে।
স্বপ্ন ভেবে উঠে বসবে, বুক পিঠ ভিজে উঠবে ঘামে।
দপ্ করে মনে পড়বে ... একটা মেয়ে ছিল, বাতি নামে ...

কৃষ্ণচূড়া, আগামী ফাল্গুনে ...

মেয়ে।। হ্যালো মা! সুমনা বলছি—
এইমাত্র ফিরেছি স্কুল থেকে ...
ফেরার পথেই দেখি পিচ রাস্তার পাশে পাশে
কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে কখন!
এবার বসন্তে ওরা ফুটতে বড় দেরি করল, না মা?
মনে আছে, গত মার্চমাসে
সাদার্ন এভিনিউয়ের ধার ঘেঁষে যত ফুলগাছ,
প্রাচীন, সবুজ,
প্রত্যেককে চিনিয়ে চিনিয়ে
বলেছিলে: ওরা তোর গাছ-বন্ধু,
তোকে ছেড়ে কোনওদিন কোথাও যাবে না, দেখিস!

মা।। সুমি বড্ড হাঁপাচ্ছিস তুই,
একটু আস্তে আস্তে কথা বল...
ঘরে ফিরে খেয়েছিস কিছু?

মেয়ে।। মা, আজ কী মনে হচ্ছে জানো!
তুমি যদি গাছ-মা'ই হতে
আর আমি ছোট্ট গাছ-মেয়ে
এভাবে আমাকে ফেলে চলে যেতে পারতে না তুমিও,
বলো? বলো?

মা।। আজ প্রায় তিন মাস হতে চলল ...
এর মধ্যে রোজ, কতবার
সকালে বিকেলে আর রাত্তিরেও,
চুপিচুপি, সবাইকে লুকিয়ে
এই একই কথা তুই টেলিফোনে বলেছিস
তোর এই ঘরছাড়া মা'কে ...
সুমি ... সু ..., তুমি কি জানো না,
তুই তোর মা'র কতখানি!
তুইই যে আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা, আদর, সার্থকতা,
একমাত্র আশা ও আশ্রয় ...
সবকিছু ছেড়েছুড়ে শুধু তোরই জন্যে বেঁচে আছি ...

মেয়ে।। আমারই জন্যে, বা রে!
মিছিমিছি বোলো না মামণি ঐ কথা
মেয়েকে এতই যদি ভালোবাসো,
সত্যি বলো,
কী করে রয়েছ তাকে ছেড়ে?

মা।। ছেড়ে থাকতে চাইনি রে, সুমনা!
ছেড়ে থাকতে পারছি না তোমাকে।
তুই, শুধু তোরই কথা ভাবতে ভাবতে
ক্লাস নিতে ভুল হয়ে যায়
খাতা দেখতে দেখতে নোনা সমুদ্র ঝাঁপিয়ে আসে চোখে
কলেজের ক্লাসে ক্লাসে ছেলেমেয়েদের ভিড়ে
খুঁজি তোরই মুখ ...
তোকে ছেড়ে তোর মা যে সুখে নেই, বোকা মেয়ে,
এটুকু বোঝো না?
তুই যে আমারই, সুমি!
আমারই এ রক্তে মাংসে স্বপ্নে সাধে
বুনে ওঠা আনন্দ বেদনা ...

বত্রিশ বছরের গর্ভ, তোকে নিয়ে ভয় ছিল খুব,
আসবি কি আসবি না, কিংবা,
আসবি কিনা মা'কে ছিঁড়েখুঁড়ে ...
শেষপর্যন্ত এলি তুই, সুন্দর সবল শিশু,
যেন এক স্বর্গীয় পুতুল
ছোট ছোট হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলি মায়ের কপাল
মিথ্যে হয়ে গেল যন্ত্রণারা ...
আমার সমস্ত ক্ষত, রক্তপাত থেকে উৎসারিত
তুই সেই কৃষ্ণচূড়া ফুল ...
এই সেই মার্চমাস, সু,
আসছে শুক্রবার সেই পনের তারিখ —

মেয়ে।। মাগো,
এবারের জন্মদিন কীভাবে কাটাব, তুমি ছাড়া!

মা।। জানি না রে, আমিও জানি না।
এখন প্রত্যেক রাত্রে জেগে বসে থাকি একা, আর
সমস্ত কষ্টের স্মৃতি, অসম্মান, দুর্বিষহ রাগ
ভেদ করে উঠে আসে তোমার সহস্র জন্মদিন ...
সুমি,
যেদিন তোমার মা'কে অপমান করে ওরা
চলে যেতে বলল বাড়ি থেকে
সেদিন এলে না কেন, মা'র সঙ্গে?
আমি তো ডাকলাম ...

মেয়ে।। কী করে যাব মা? আর সত্যি বলতে,
কেনই বা যাব!
আমি কি জানতাম, তুমি সত্যি আর কখনও ফিরবে না!
মা-বাবার মধ্যে ওমনি ঝগড়া তো হয়ই, আমি জানি।
আমার স্কুলের বন্ধু, প্রিয়াঙ্গিনী, আমাকে বলেছে
মাসে নাকি কুড়ি দিন ফাইট হয় ওদেরও বাড়িতে।
আমিও বলেছি, কিন্তু পুরোটা তো জানাতে পারিনি ...
বন্ধুরা কী ভাববে বলো, ওরা যদি বুঝতে পেরে যায়
তোমাদের মধ্যে সত্যি পুরো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে!
এমন কখনও হবে, মাগো, আমি বিশ্বাস করি না,
ঠাম্মা বলেছিল তুমি ফিরে আসবে ভুল বুঝতে পেরে,
তাছাড়া ... বাবাই ...,
মাগো, বাবাইকে যে বড্ড ভালোবাসি
মা বাবা আলাদা থাকবে এ তো আমি ভাবতেও পারি না ...
বলো না মা, কেন এই অর্থহীন পরীক্ষা আমার,
কার কাছে যাব আমি কাকে ফেলে রেখে?

আমি তোমাদেরই মেয়ে,
কারোর একার মেয়ে নই
কোনও এক জনকে চেয়ে ইচ্ছে করে আসিনি তো আমি!
বরং তোমরাই, মাগো,
তোমরাই দু'জনে মিলে ইচ্ছে করে চেয়েছ আমাকে ...
এখন আমাকে বলছ মা বাবার মধ্যে বেছে নিতে,

কী করে সম্ভব!
আমি দু'জনকেই একসঙ্গে চাই—
মামণি মামণি, প্লিজ, কথা শোনো, অমন কোরো না,
আমার এ জন্মদিনে ফিরে এস নিজের বাড়িতে ...

মা।। নিজের বাড়িতে মানে?
ওরে মেয়ে, শোন তোকে বলি—
তোমার মায়ের সেই বাড়ি আর তার বাড়ি নেই,
আর কোনও জায়গা নেই সেখানে ফেরার।
অথবা না, জায়গা হয়তো আছে আজও,
দাসীর মতোন,
মেরুদণ্ডহীন কোনও জীবের মতোন আজও
বুকে হেঁটে, মাথা নিচু করে,
ঢোকা যেতে পারে কোনও নিরাপদ গর্তের ভেতরে।
কিন্তু সুমি, তোর মা যে মানুষ, মানুষী,
সে কী করে মানতে পারে, সহ্য করতে পারে এত, বল,
নিজেকে প্রতিটি পদে তিলে তিলে ধ্বস্ত হতে দিয়ে
সে কেমন ধ্বংসস্তূপে গড়তে পারে তোর ভবিষ্যৎ!
প্রিয় সন্তানের সামনে রেখে যেতে পারে বল যেমন প্রেরণা,—
নিরুপায় জননীর আত্ম-অবমাননার গ্লানি,
নাকি,
নিজেকে মানুষ বলে অনুভব করার চেতনা,
সহজ স্বাধীন দুঃসাহস?
আজ যদি বলি আমি তোরই জন্যে, তোরই কথা ভেবে
প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছি,
সে কথা বিশ্বাস করবি, সু!
আজ যদি বলি তুমি যাকে বাবা বলে ভালোবাসো
সে আসলে ঘৃণ্য অমানুষ ...

মেয়ে।। এসব কী বলছ তুমি, মা!
আমার বাবার মতো এত ভালো বাবা কেউ আছে?
সবসময় যা চেয়েছি কিছুতেই আপত্তি করেনি,
সিঙ্গাপুরে গরমের ছুটি,

উইকএণ্ডে গাড়ি করে ডায়মন্ডহারবার ঘুরে আসা,
ব্লু ফক্সে ডিনার কিংবা ল্যাপটপ, সিন্থেসাইজার ...
তোমাকেও বাবাই কি কখনও কিছুই দেয়নি, বলো!
বাবাকে কক্ষনো আমি কড়া কথা বলতেই শুনিনি,
সবসময় হাসি মুখ, আর এত ডিপেন্ডেব্‌ল!
হ্যাঁ, মানছি, বাবা বড্ড ব্যস্ত, কিন্তু সেটা তো হবেই,
অত বড় চাকরি, আর অত বাইরে বাইরে ঘুরতে হয় ...
একটু আধটু ড্রিঙ্ক করা, সেটাও তো রিল্যাক্সেশন,
বাবাই ভীষণ খাটে... বলো মাগো, তুমি কি জানো না?
এর মধ্যে তুমি যদি অকারণে সবসময় অত রাগ করো,—
ঠাম্মা বলে, ওতে নাকি বাবাইয়ের ডিপ্রেশন হয়!

মা।। ডিপ্রেশন!
সুমি, তুই ডিপ্রেশন মানে কি, জানিস?
কিংবা তোর বাবা জানে কীসে কার ডিপ্রেশন হয়?
কিংবা তোর ঠাম্মা, যিনি সারাদিন তোকে
বোঝান যে তোর মা-টা রাগি, নোংরা, ঝগড়ুটে,
আর তোর বাবা বড় ভালো!
অন্যদিকে তোর মা যে সারাদিন কলেজের পর
রান্নাঘরে ঢোকে বাড়ি ফিরে,
তোর বাবা ফিরে এলে তাঁর ছাড়া প্যান্টের পকেটে
খুঁজে পায় মুডের প্যাকেট ...
এর পরে, বল্‌ তো সুমি, ডিপ্রেশন কার হতে পারে?

মেয়ে।। কীসের প্যাকেট বললে, মা?
আমি ... ওটা কী ... ঠিক জানি না!

মা।। জানি সোনা, এ তো সত্যি তোমার জানার কথা নয় ...
কী তীব্র দুর্ভাগ্য হলে লজ্জাহীনা মাকে
নিষ্পাপ কন্যার সামনে উচ্চারণ করতে হয়
এই পাপ, এমন নগ্নতা ...
কিন্তু আর কতদিন না জেনেই-বা থাকতে পারবি তুই,
আর বেশি দেরিও তো নেই,

তোর ঐ স্বপ্নমাখা অকলঙ্ক চোখের সম্মুখে
অসহ্য বিস্ময়ে,
একদিন খুলে যাবে জীবনের, দুনিয়ার,
অন্ধকার সহস্র দরোজা ...
সেদিন কীভাবে তোকে সান্ত্বনা জোগাব, সুমনা!

মেয়ে।। সে কেমন অন্ধকার, মা?
আমাদের সঙ্গে তার কেমন অশুভ যোগাযোগ!

মা।। সে কথা তোমাকে বলা যেমন কঠিন, সুমি,
বুঝি তার দ্বিগুণ জরুরি ...
জানি না কতটা আমি এ মুহূর্তে বলতে পারব তোকে,
তবু, যদি জানতে চাও,
কেন আমি তোমার বাবাকে ঘৃণা করি,
শুনে রাখো একটা দুটো কথা ...
তোমার বাবার কাছে তোমার মায়ের চেয়ে
বেশি প্রিয় অন্য মহিলারা,
সেই মেয়েদেরই সঙ্গে তিনি বাইরে যান অফিসের কাজে,
আসলে যা প্রমোদভ্রমণ ...
এবং একথা তিনি সগৌরবে স্বীকারও করেন,
পৃথিবীর সব নারী তাঁর কাছে গণ্য শুধু
শারীরীক রূপের বিচারে ...
নারীপুরুষের মধ্যে একটিই সম্পর্ক ছাড়া
বাকি সব তুচ্ছ, মূল্যহীন,
সে সম্পর্ক কেবলই ভোগের ...
মা ... স্ত্রী ... কন্যা ... বোন ... কিংবা শুধু বন্ধু হিসেবেও
নারীকে মানুষ বলে ভাবতে তার অনীহা প্রবল ...
এ কথা তোমাকে আর কীই বা বলব,
তুমি তো জানো না
কী নিপুণ প্রতারণা আছে তার নিখুঁত মুখোশে।
তুমি ঘুমোনোর পর, রোজ রাত্রে, তুমি কি শুনেছ
তোমার বাবাই তোর মাকে ক'টা থাপ্পড় মেরেছে!
মেরেছি আমিও, মানি, শেষমেশ, লজ্জায় ঘেন্নায়
একটা একটা করে জমিয়েছি ঘুমের ওষুধ ...

মেয়ে।। মা!

তোমার মেয়েকে ফেলে পারবে তুমি,
পারবে মরে যেতে!
তার চেয়ে ভালো হয় ... আমি ... হ্যাঁ ...
আমিই যদি মরি —
আমার মৃত্যুর পর শ্মশানে আমার দেহ ছুঁয়ে
তোমরা কাঁদবে তো, মাগো, অন্ধকারে পাশাপাশি বসে?
বলো, বলো, বলো মাগো, তখন নিশ্চয়ই
সব রাগ ভুলে গিয়ে তোমাদের মিল হয়ে যাবে ...

মা।। ছি সুমি, পাগল মেয়ে, চুপ কর ... শোন ... চুপ কর—
এত বড় কথা, সোনা, কখনও কি বলতে আছে মা'কে!
একথা শোনার চেয়ে আমারই তো মৃত্যু ভালো ছিল,
অথচ বিশ্বাস করো, সু ...
সেদিন যে মরব বলে শেষমুহূর্তে পিছিয়ে এসেছি
সে তো শুধু তোর কথা ভেবে...
কেননা তোমার সামনে মৃত্যু নয়, হেরে যাওয়া নয়,
তোর মা যে তোর জন্যে রেখে যেতে চেয়েছে লড়াই,
অন্যায়ের মুঠো থেকে কেড়ে আনতে তীব্রতম জিৎ
মেয়ের আগে যে তার মা'কেই এগিয়ে আসতে হয় ...
তাছাড়া মা, বাস্তবিক, সত্যিকথা এই—
অতিবড় সর্বনাশও তাদের তো এ জীবনে
কখনওই মেলাবে না আর,
যাদের চেতনা, বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা আলাদা,
তাদের যে কোনও মূল্যে আপোসের প্রয়োজন নেই।
যাদের জীবনপথ বেঁকে গেছে ঘোর বিপরীতে
হোক তারা তোমারই মা বাবা
তোম.র জন্মই যদি এ ভাঙন ঠেকাতে না পারে,
তবে মৃত্যু ...
সে যে আরও বৃথা, সোনা,
আরও আরও আরও অনর্থক!

মেয়ে।। মামণি, কী করব তবে আমি!

আমি যে জানি না মাগো কোনটা ঠিক,
সত্যিটা কোথায়!
জীবন আমার কাছে এখনই যে জটিল কুয়াশা ...
আমি যে বাবাকে অত বাজে লোক ভাবতেই পারি না,
সে কি অপরাধ?
অথচ তোমার কথা এ জীবনে কোনওদিনও
অবিশ্বাস করিনি মামণি!
এ সমস্ত ভয়ঙ্কর আবর্জনা, লুকোনো জঞ্জাল
যত অবিশ্বাস্য হোক, আমি জানি এও মিথ্যে নয় ...
তোমার গলার স্বরে সে প্রমাণ পেয়েছি মামণি,
বুঝতে পারছি মাগো, আর সহ্য হয়নি, চলে গেছ তাই—
তবু বলো,
এই যে তুমি সরে গেলে, এইই কি লড়াই?
সব কিছু ছেড়ে এই চলে যাওয়া, আমাকেও ফেলে,
এই কি তোমার সেই জিৎ!

মা।। না সুমনা, এ তো জিৎ নয়,
এ তো শুধু হারতে হারতে, পড়ে যেতে যেতে ছিটকে ওঠা,
এ তো শুধু শেষমুহূর্তে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে
দাঁড়ানোর চেষ্টা করা সাহসে, বিশ্বাসে ভর দিয়ে ...
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ, অমসৃণ, অসহ্য খাড়াই
আমাকে এগোতে হবে ওই পথে,
একা নয়, তোকে সঙ্গে নিয়ে,
তুমি, তুমি, তুমিই তোমার
অপমানবিদ্ধ মা'কে দিতে পারো জয়ের গৌরব—

মেয়ে।। কী করে মা? তুমি কি এখনই
আমাকে তোমার কাছে চলে যেতে বলছ বাড়ি ছেড়ে?
যেতে রাজি আছি মাগো, কিন্তু জানো, ঠাম্মা যে আমাকে
বড্ড চোখে চোখে রাখে,
আজকাল একটুও একা একা বেরোতে দেয় না বাড়ি থেকে!

মা।। না সুমনা, এখন এস না,
এখনই সে সময় আসেনি,

সত্যিমিথ্যে না জেনে যে কক্ষনো সিদ্ধান্ত নিতে নেই।
তোমার সে বয়েস নয়,
যেদিন ততটা বড় হবে
আমাকে সেদিন হয়তো ডাকতেও হবে না, সেই দিন—
ঘুম ভেঙে অকস্মাৎ শুনতে পেয়ে যাবে তুমি
তোমারই ভিতর থেকে উঠে আসা সেই আহ্বান,
আকুল, অমোঘ,
যা তোমাকে এনে দেবে তোমার মায়ের কাছাকাছি ...

আর নয়, অনেকক্ষণ কথা বলেছিস টেলিফোনে,
ঠাম্মা দেখতে পেলে তোকে বকবে, জানি, তার আগে
তাড়াতাড়ি বলে নিই আর দুটো কথা,
আগামী পরশুই তুমি এগারো বছরে পড়বে,
দূর থেকে এই জন্মদিনে
আদরের সু'র জন্যে এটুকুই আশীর্বাদ,
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা মায়ের—
বড় হও, বড় হও, ... বড় হয়ে ওঠো তাড়াতাড়ি
ফুটে ওঠো মার্চমাসে কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতোন
ফুটে ওঠো বোধে ও হৃদয়ে,
মস্তিকে, মননে, আর
ফুটে ওঠো মানবিকতায়।
পাপড়িতে পাপড়িতে জ্বালো অনিন্দিতা আলো ও আগুন
পরিণত হও তুমি সম্পূর্ণ নারীতে, মানুষে,
সহজে ও সমারোহে বিকশিত হও মর্যাদায় ...
ছুঁয়ে দ্যাখো দিগন্ত, আকাশ—
তারপর যেদিন তুমি শিরা আর ধমনীতে
খুঁজে পাবে শিকড়ের টান,
আমি আজ কাল গুনি সেই ফাল্গুনেরই পথ চেয়ে।
যেদিন কুয়াশা নয়, অবারিত অগাধ রোদ্দুরে
সগর্বে দাঁড়াবে এসে জননীর পাশে কন্যা হয়ে
যেমন দাঁড়াতে চায়
নারীর সপক্ষে নারী,
মানুষের সপক্ষে মানুষ ...

সেইদিন, সেইদিন জিতে নেব এ জন্মের বাজি।

ততদিন আমি একা, অপেক্ষায়, ওরে কৃষ্ণচূড়া
প্রতিবাদে, প্রাণে, প্রত্যাশায়
তোর জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছি বাহু মেলে,

তোমারই পাপড়ির জন্যে গচ্ছিত রেখেছি এই
ক্লোরোফিল, সালোকসংশ্লেষ ...



অনূদিত কবিতা

সূচি

পাবলো নেরুদার একটি কবিতা

প্রেমের কবিতা

১.

মুক্ত করো আমার দু'হাত
আর এ হৃদয়, ওগো, মুক্ত করো আমার বন্ধন!
আমার আঙুলগুলি ইচ্ছেমতো ভ্রমণ করুক
তোমার তনুর পথে পথে।
উন্মাদনা — শোণিত, আগুন, চুম্বনেরা —
আমাকে পোড়াতে থাকে কম্পমান শিখায় শিখায়।
তুমি তার অর্থ তো জানো না।

সে আমার বোধের তুমুল ঝঞ্ঝাবাত
যা নুইয়ে দিতে থাকে স্পর্শপ্রবণ এই স্নায়ুর জঙ্গল
কীভাবে যে এই দেহ মেলে দেয় তার সেই
আকাঙ্ক্ষাপ্রদীপ্ত জিহ্বাগুলি!
সে যে কী আগুন!
এই তো তুমি, হে রমণী, যেন এক কুমারী কিরণ,
যখন আমার এই অর্ধদগ্ধ ঝলসানো জীবন
পাখা মেলে উড়ে যায় তোমারই তনুর দিকে,
নক্ষত্রখচিত সেই তনু, যেন রাত!

মুক্ত করো আমার দু'হাত,
আমার হৃদয়, ওগো, মুক্ত করো আমার বন্ধন!

শুধু তোমাকেই চাই, শুধু তোমাকেই ভিক্ষা করি।
প্রেম নয়, এ শুধু কামনাবহ্নি, নিজেকে যা নিঃশেষে পোড়ায়।
যেন এক ক্ষুব্ধ বৃষ্টিপাত,
যেন এক অন্বেষণ, অসম্ভব কিছু পেতে চাওয়া,
তবু সেখানেও তুমি আছ
তোমার সমস্ত কিছু আমাকেই দান করবে বলে,
কেননা, তোমার জন্ম এ কারণে,
আমাকে সমস্ত দেবে বলে,

যেমন আমার জন্ম তোমাকে ধা.্রণ করতে,
তোমাকে কামনা করতে,
তোমাকে গ্রহণ করতে!

২.
কেননা এ সত্য, প্রিয়া, ভগিনী আমার, এ তো সত্য!
ধূসর পশুর দল, যারা পর্বতের ঢালে চরে
তাদেরই মতোন এই শরীরে শরীরে ভালোবাসা!
মত্ত জনজাতি, যারা পৃথিবী ভরিয়ে তুলছে ভিড়ে
তাদের মতোই এই খুনোখুনি, আর ভালোবাসা!

খোলা পাপড়িগুলি থেকে উঠে আসা তাপের মতোন
ছড়িয়ে চলেছে যেন শস্যফলনের যত আগামী বৈভব
উন্মুক্ত পাপড়ির সেই তাপ ...

যেভাবে এ পৃথিবীর আকৃতির হেতু
সমুদ্রে বাধ্যত ঢেউ ওঠে, সেভাবে তোমাকে চায়
আমার শরীর,
আর তুমি ভরে রাখো তোমার শরীরে
তৃষ্ণাময় সেই চোখগুলি,
যে চোখে আমিই দৃষ্টি ফিরে পাব
আমার নিজের চোখ মাটি লেগে নষ্ট হয়ে গেলে।

৩.
নর ও নারীর পুত্র!
শতাব্দীর ফল,
আমাদের ধমনীতে ঢেলে দিচ্ছ তোমার নির্যাস!
আমারও তো আত্মা আজ নিজেকে নিঃশেষে ঢালে
প্রসারিত তোমার শরীরে
তোমার থেকেই আরও পূর্ণ হয়ে জন্ম নেবে বলে,
হৃৎপিণ্ড নিজেকেই ভেঙেচুরে ছত্রাখান করে,
টানটান হয়ে থাকে যেন এক চিতা।
আর এ জীবন, ভেঙে চৌচির, নিজেকে তোমার সঙ্গে বাঁধে
যেভাবে তারার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখে আলো!

তুমি তো আমাকে নাও যেভাবে হাওয়াকে নেয় পাল
আমিও তোমাকে নিই চষা মাঠে বীজের মতোন।
যদি না আমার দুঃখ তোমাকে ঝলসায়,
এস, এই বিষাদে ঘুমোও।
নিজেকে জড়াও আজ আমার ডানায়।
হয়তো বা এই ডানা দিতে পারে তোমাকে উড়ান।
পাকে পাকে খুলে দাও আমার জটিল ইচ্ছাগুলি
ওদের সংঘাত হয়তো তোমাকেই রক্তাক্ত করে!

নিজস্ব বেদনাটুকু হারিয়ে ফেলেছি যবে থেকে,
আমার তো তুমিই শুধু আছ!
আমাকে খণ্ডিত করো তীক্ষ্ণধার তরবারি হয়ে,
অথবা আমাকে মৃদু ছুঁয়ে দাও আকর্ষে তোমার!
আমাকে চুম্বন করো,
আমাকে দংশন করো,
আমাকে জ্বালিয়ে দাও দাউদাউ করে।
আমি যে এখন এই পৃথিবীতে আসি
সে তো শুধু আমার এ পুরুষালি দু'চোখের
তোমারই দু'চোখভরা অতল অথৈ জলে
জাহাজডুবির জন্যে, নারী!

৪.
সে যেন জোয়ার এক, সে যখন আমাকে জড়ায়
তার চোখে বিষাদের রং।
যে মুহূর্তে বুঝতে পারি তার শুভ্র নড়ন্ত শরীর
আমার দেহের পাশে শক্ত হচ্ছে প্রত্যাশায়,
দপদপিয়ে উঠছে তার শিরা,
সে যেন জোয়ার এক, যতক্ষণ সে আমার পাশে।

শয্যায় এলিয়ে ওই দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে চেয়ে
আমি দেখি জলরাশি পাক খায়, আর, খুলে যায়
অনন্ত সময়ে ধরে
মারাত্মক সেই খেলাধুলো
দেখতে থাকি সকালে বিকেলে।

প্রাচীন পায়ের ছাপ, তার ওপর ফেনাভাঙা জল
পুরনো পথের রেখা, পুরনো যা কিছু
ফেনাভাঙা সেই জল, যারা সেই তারাগুলি থেকে
নিজেদের মেলে ধরে অতিকায় গোলাপের মতো।
সেই জল, যে ঝাঁপিয়ে বালির ওপরে ধেয়ে আসে
পোশাকের নীচে কারও দুঃসাহসী হাতের মতোন।
পাথরে পাথরে ধাক্কা খেতে থাকা সেই জলরাশি।
কী নিপুণ জলরাশি, যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ,
শব্দহীন, যেন হত্যাকারী।
অশুভ রাতের সেই জলরাশি
পড়ে থাকে বন্দরের তলদেশে হাঁ করা শিরার মতোন
অথবা তা যেন এই সমুদ্রেরই হৃৎপিণ্ডখানি
বিচ্ছুরিত হতে থাকা কম্পিত ভীষণ বিকিরণে।
সে যেন এমন কিছু যা আমায়
আমারই ভেতর থেকে টেনে বার করে।
আমার পাশে সে আছে যতক্ষণ
আমি আরও পরিপূর্ণ হই।

সে যেন জোয়ার এক,
তার দু'চোখের বাঁধ উপচে যাওয়া সে এক জোয়ার
চুমু খেতে থাকে তার বুকে, মুখে এবং দু'হাতে,
ব্যথাকাতরতা, আর অসম্ভবের সেই ব্যথা,
তীব্র কামনার সেই বৃত্তখানি—
অর্থাৎ, আমার আর তার দেহ হতে আরও আরও কিছু
সারারাত্রিভর—
সুতীক্ষ্ণ তীরের মতো লক্ষ্যভেদী আকাশে আকাশে!
কোনও এক প্রবল উড়ান
যা মেলে না পাখা, শুধু আঁচড়ে চলে ভেতরে ভেতরে
কিছু, যা আমার শব্দে খুঁড়ে চলে গভীর গহ্বর
কিছু, যা সমস্তকিছু সত্ত্বেও ভেঙে ধ্বসে যায়
ভূগর্ভস্থ কারাগারে প্রাচীনে হেলান দেওয়া বন্দিদের মতো।

সে, রাতের হৃৎপিণ্ড কুঁদে গড়ে ওঠা ভাস্কর্য, সে,
আমার বিভ্রমময় দু'চোখের যাবতীয় অশান্তির পাশে;

সে— আমার এ দুটি হাত ছেনি হয়ে উঠে
খোদাই করেছে যাকে অরণ্যে, গাছের ডালে ডালে।
সে— আমার সুখের পাশে তার সুখ।
সে— তার কালো ওড়নাবৃত চোখ।
সে— তার হৃৎপিণ্ড— রক্ত-লাল প্রজাপতি এক,
যে তার দুখানি অতি ইচ্ছাময় আকর্ষতে ছুঁয়েছে আমায়!
আমার জীবনে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাকে ধরে না ধরে না।
সে তো এক ভেসে পড়া স্বাধীন বাতাস।
যদি বা আমার এই শব্দগুলি সূচ হয়ে বিদ্ধ করতে জানে,
তারা যেন খণ্ড খণ্ড করতে পারে লাঙল বা তরবারি হয়ে।
সে যেন জোয়ার এক, যা আমাকে টেনে নিয়ে চলে
দুমড়ে দেয় আমার শরীর,
সে যেন জোয়ার এক যতক্ষণ সে আমার পাশে!

ডবলিউ. এন. হারবার্টের একটি কবিতা

নিচু রাস্তা

অভিনন্দন। তুমি প্রবেশ করছ এমন এক অঞ্চলে
সমস্ত সংকেতগুলি যেখানে, বিনয়বশত, দ্বিভাষিক,
তবে সে বিনয় তোমার ভাষার প্রতি নয়। যেখানে সমস্ত উল্লেখ,
যদিও তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ, নির্দেশ করে এক অচেনা
সংস্কৃতির দিকে। এখানে তুমি ছাড়া প্রত্যেকেই রাস্তা চেনে:
লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা পার হয়ে যায় সারিসারি
দোকানের মাঝখানে নির্লিপ্ত রাস্তার মতো অস্বাভাবিকতা;
তারা বোকাটে ও অগভীর আলাপ আলোচনার মধ্যে
অন্ধ কোলাব্যাঙের মতো সাঁতরায়।
তুমিই একমাত্র,
যে এখনও আশা করছ, একদিন অতিক্রম করে যাবে এইসব।

কেননা এখানে জয়বার্গ শহরটির যমজ সম্পর্ক পাতানো
হয়েছে প্যানিকভিলের সঙ্গে,

কিন্তু ওরা গড়ে উঠেছে এতই কাছাকাছি, যে তুমি
সমানে মিলিয়ে দ্যাখো
তোমার পকেট-গাইডবইয়ের পাতা, যা রাস্তাদের
নতুন নতুন নাম দিতে পছন্দ করে; সীমান্ত ধুয়ে ধুয়ে যায়
পিঁপড়েদের পায়ে চলা পথের মতোন। তার প্রচ্ছদে আঁকা
থাকত কোনও এক মূর্তি, যাকে উচ্চারণ করা যায় না,
সেটা এখন নতুন সংসদভবন — সম্ভবত —
আর 'থাকত' বলতে বোঝায় পূর্ববর্তী দিন — কিংবা বোঝাত।
তুমি নিশ্চিত থাকতে,
যে, তুমি পার হয়ে যাচ্ছিলে সেই সব ...

কিন্তু যখন তুমি গাড়ি করে কোথাও যাও
সাত বছর লেগে যায়—সে তুমি যেখানেই যাও,
যত কাছেই হোক কিংবা দূরে, যদিও সে দূর কখনওই
তার পক্ষে যথেষ্ট দূর নয় যে চেষ্টা করছে পালানোর।
অন্তত তুমি তো আয়না-অনুযায়ীই বুড়িয়ে
যাও না কক্ষনো। বাইরের খোলস-টোলসগুলো সব এক
অদ্ভুত অসুখে ভোগে :
জলকলমি মানে SKUM
দুগ্ধজাত দ্রব্য হলো GUK আর চর্বি HARDON।
তুমি নিজেকে বলো 'তাহলে?
আমি যা খাই, তাই বয়ে চলেছে।'

তুমি মিলিত হও অন্যদের অনুপস্থিতির সঙ্গে—
'*সেই শব্দগুলি কোথায় যাদের আসার কথা ছিল, এসেও ছিল*
বছরের পর বছর ধরে, যে সময় থেমে থাকতে থাকতে
নষ্ট হয়ে এল...' —যা লুকিয়ে আছে
কফিখানার কাগজে পুরনো আঁকিবুকিতে,
সেই পোস্টকার্ডগুলোর মতো, যা কেউ তোমাকে পাঠালই না;
'অভিনন্দন। এই পণ্যটি তার
বিক্রয়যোগ্যতার তারিখ পেরিয়ে গেছে। তাতে এটির মূল্য স্থায়ী হয়
এবং এটি গ্রহণ ও হজম করার পক্ষে নিরাপদ হয়ে ওঠে
(তোমার ইচ্ছে এমনটা নয়)।'

এইসবই এতক্ষণে
(তুমি আশা করো) তোমার পার হয়ে চলে যাওয়াই উচিত ছিল।

ইতিমধ্যে এক মহিলা তোমাকে চিহ্নিত করে ফেলেছে, —সেই মহিলা,
যে-কোনও শহরেই যে সবসময় তোমার আগে আগেই
গিয়ে বসে থাকে;
হয়তো এই সব দেয়াললিখন, এ সমস্ত তারই কাজ।
তুমি তাকে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যাও,
সে বিড়বিড় করে ওঠে:
'আমরা অপেক্ষা করছি সেই জিনিসের জন্য, যা
বিজ্ঞান বলেছিল আমাদের নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে :
আমরা কীভাবে মরব।
একটা একটা করে ইট তুলে তুলে, ফ্যারাওদের পাহাড়গুলোকে
আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে এনে ফেলি
আর স্তূপাকার করতে থাকি আমাদের মাথায়।
দুর্দান্ত দৃশ্য,
যদি না তুমি থাকো তার তলায়, আর ভাবো
তুমি অতিক্রম করে যাচ্ছ এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে'।

শিমাদা মাসাহিকোর একটি কবিতা

একজন মুক্ত মানুষের প্রার্থনা

১.
আমি প্রার্থনা করছিলাম।
যেন মৃত মানুষেরা একঘেয়েমিতে বিরক্ত না হয়ে ওঠে।

তুমি কি জানো পৃথিবী কেন গোল?
ঈশ্বর পৃথিবীকে গোল বানিয়েছেন,

যাতে বিচ্ছিন্ন মানুষেরা কোথাও আরেকবার
মিলিত হতে পারে।

২.
বাচ্চারা অপেক্ষা করে চলেছে
ছাড়া পাবার জন্যে।

বাচ্চারা, যারা একা একা খেলছে, ওদের পিঠে
ছাপ পড়ে গেছে বিষণ্ণতার

দূর কোনও অতীত থেকে বয়ে নিয়ে আসা যে বিষাদ ...

৩.
তার কোনও ফেরার জায়গা নেই,
সে অনাদি অনন্তে পড়ে আছে।

এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা
তার টুকরো টুকরো অংশ
আমি চেষ্টা করছি জড়ো করার।

এই পৃথিবীতে সে ভ্রমণ করেছিল ক্লান্তির পরোয়া না করে,
ক্ষুধায় ভীত না হয়ে, কোনও ক্ষোভ না রেখে
সে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি
শুধুমাত্র সেই খণ্ডগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে
তার স্বপ্নকে গড়ে তোলার জন্যে ...

তাকে মনে পড়ে
যখন একা থাকি, আমার ফিসফিসানির ভিতর
আমি বুনে তুলি সেইসব কথা,
চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমার মা আমায়
যে গান শুনিয়েছিলেন

জগতের নিঃসঙ্গতম মানুষটিকেই ভালোবেসো ...

৪.
সে ফিরে এল অবশেষে, জাগরণের নতুন এক ঋতু ...
একটি পাথর, যে টিঁকে গেছে
দশহাজার বছরের নিঃসঙ্গতা সহ্য করে,

মনে হচ্ছে কাল থেকে সে আমার সঙ্গী হতে পারে।
মনে হয়, সময় থেকে মুক্ত হয়ে আমি ঢুকে পড়ব
চিরকালের মধ্যে—
তবু আমায় চেপে ধরছে আমার অন্তিম মুহূর্তগুলি।
সুতো খুলে যাওয়া স্মৃতিগুলি আমি বুনে তুলব ফের,
নিঃশেষে নিংড়ে নেব আমার যেটুকু আবেগ—

আমি আঁকড়ে ধরি আমার শৈশব,
শুরু ও শেষহীন চিরায়মানতা বড় ক্লান্তিকর।
আমার জন্যে গাছ পুঁতো, কোনও পাথুরে স্তম্ভ না গড়ে
কেননা, গাছেদেরই ক্ষমতা আছে আমাকে বাঁচিয়ে তোলার।
বাতাস কিংবা পাখিদের পিঠে চড়ে, আমি
উড়তে থাকি, উড়তেই থাকি
নাম-না-জানা সব দেশে আমি ফুল ফোটাই,
ফল ধরাই গাছে গাছে,
আর, যারা ভালোবাসে আমার সেইসব ফুল,
গ্রহণ করে আমার ফসল,
তাদের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই
আমি ফিরে যাই আমার শৈশবে, আরও একবার—

শৈশবে, যখন আমি গান শুনে খুশি হয়ে উঠতাম,
জেগে উঠতাম সৃষ্টির আনন্দে
আর জানতাম, কাকে বলে ধ্বংসের আহ্লাদ ...

৫.
বিশেষ কারও জন্যে নয়,
আসলে সবার জন্যেই
সঙ্গীত তার সুর শোনায়।

কেবলমাত্র, যদি, আমি সঙ্গীতকে আমার দোসর বানাই,
খুলে যাবে জীবনমৃত্যুর মধ্যের সীমানা—
আর আমার হৃদয় কথা বলবে মৃতদের সঙ্গে।

যদিও তুমি আমার শত্রু, আমি তোমায় ভালোবাসব,
এবং থাকবে না কোনও রক্তপাতও।
সঙ্গীত সর্বদা রক্ষা করবে তোমাকে
তোমাকে সান্ত্বনা দেবে
এমনকী যদি তোমার মা বাবা মারা যান,
যদি কিছু মুখে দেওয়ার না থাকে,
যদি তুমি দোষী সাব্যস্ত হও সবকিছুর জন্যেই,
যদি তুমি বিতাড়িত হও মাতৃভূমি থেকে
যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রিয়জনেরা

আলগাসুন্দরী এই পৃথিবী, তাকে
সত্যিকারের সুন্দর করে তুলতে
তোমাকে তো গান গাইতেই হবে!

রুক্মিনী ভায়া নায়ারের দুটি কবিতা

সন্ন্যাসিনী

যখন শূন্যতার কথা ভাবি,
তাঁর কথা মনে হয়।

পেছনদিকে উঁচু করে ফোলানো
একসহস্র ভাঁজঅলা স্কার্টের নীচে

গাদাগুচ্ছের কপিকল, যেন
হাওয়াবাতাসের ধূর্ত ঠেক্‌নো

সিস্টার মারিয়া ব্লান্ডিনা জোসেফ
তিনি কি আছেন, ওখানে?

রক্তিমার মধ্যে থেকে ঝিকিয়ে ওঠে
তাঁর কারুকার্যময় কাঁচি

বেগুনিগুলো ঝলসে উঠেই মিলিয়ে যায়,
মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা

জাদুকরের পোশাকে সেজেগুজে,
কল্পনার পোশাকে

ঈশ্বরের প্রতিনিধি, লিঙ্গবিহীন সন্ন্যাসিনী
সবসময় জিতে নেন সব কিছুই
অথবা, কিচ্ছু না ...

হুড্রু ফল্‌স, রাঁচি

জলের চেয়ে বেশি জনতা।
চতুর্দিকে আবর্জনার মতো
ছড়ানো ছিটোনো গলার আওয়াজ।
বিশাল পাথরখণ্ডের এক দিক পোঁতা রৌদ্রে,
অন্য প্রান্ত শূন্যতায়।

উড়ে আসা জলকণা ভিজিয়ে দিচ্ছে সব কিছু,
খাবারদাবার, সিগারেটের টুকরো, এমনকী
ওর বাপের গোব্‌দা জুতোজোড়া।
ছেলেটা খুঁজে বার করতে চাইছে সেই জলরেখা,

তার উৎস। ওর মা হাসে,
বিচ্ছিন্ন, ভাবভালোবাসার স্বপ্ন দেখতে দেখতে
সে শুনতেই পায় না ছেলের কথা।
ইতিমধ্যে, ছেলেটা বহুদূরে, ঝাপসা।

পাথরগুলোও নড়ে, পেছোয়, নাচে,
জলের সঙ্গে তাদের কোনওই ফারাক নেই।
ওপরে হট্টগোল মিলিয়ে যায়,

জলকণার কুয়াশা ঢেকে ফেলে ছেলেটার চোখমুখ

সে তো তেমন ছেলে নয় এক্ষুনি এক্ষুনি যার না-থাকাটা টের পাওয়া যাবে,
যখন অনুসন্ধানকারীরা তাকে খুঁজে বার করে,
অনেকদিন পর,
তখন ওকে ফিসফিসানো নদীর থেকে
আলাদা করাই কঠিন ...

সুচেতা মিশ্রর দুটি কবিতা

একদিন চলে যাবে নারী

একদিন চলে যাবে নারী
রাশিচক্রের সেইসব তথাকথিত সারিতে
দমবন্ধ নারী
চলে যাবে একদিন।

রুটি তৈরির জন্যে বের করা আটা,
আর কাটা সবজির স্তূপ পড়ে থাকবে সেরকমই
বাচ্চারা ইস্কুল থেকে ফিরে
পড়ার বই খুলে বসে জিজ্ঞেস করবে
মা আর নারীর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

যুগের পর যুগ ধরে
স্পর্শানুভূতির মধ্যে শ্রদ্ধা খুঁজতে খুঁজতে, আর
বিশ্বাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে করতে
একদিন
সমস্ত প্রেম, অহঙ্কার আর অভিশাপকে অর্থহীন করে দিয়ে
চলে যাবে নারী।
বিপ্লব, বিশ্বাস কিংবা নির্জনতা—

কোনওখানেই তাকে আর খুঁজে পাবে না তুমি।

তার অনুপস্থিতি তোমাকে মনে করিয়ে দেবে
প্রেম শাশ্বত,
আর হতাশাও,
তোমার অবজ্ঞাকে সহ্য করেছে সে
যে সহনশীলতায়,
সেইটাও ...

একদিন চলে যাবে নারী
তখন তোমার ভোগ আর অমরত্বের জন্যে
প্রার্থনা করার মতো আর কেউই থাকবে না।

মেয়েরা হঠাৎ মরে না

হঠাৎ হারিয়ে যায় সিংহাসন
হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ঘড়ির কাঁটা
নারী কিন্তু হঠাৎ মরে না।

কলম থেকে চুঁয়ে পড়া কালির মতোন,
বহুব্যবহৃত শব্দের ঘষে যাওয়া অর্থের মতোন,
গল্প শুনতে শুনতে ঘুম পাওয়ার মতোন,
হাওয়ার সঙ্গে শূন্যতার গল্প করতে করতে
ভিজে শাড়ির শুকিয়ে আসার মতোন,
জ্বলন্ত উনুনে ভিজে কাঠের মতোন, কিংবা
হাঁড়ির মধ্যে ফুটতে থাকা ধপধপে চালের মতোন
নারী একটু একটু করে মরে।

তার শরীর নয়, — আকাঙ্ক্ষা।
কত কত ভাগ্যরেখাকে
জমির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে

সে বসন্ত নিয়ে আসে,
বসন্তে ভরে দেয় ফুল,
আর ফুলে রং।
হঠাৎ নয়,
ফুলের ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধের মতোন
নারী একটু একটু করে মরে।

একটা দেশলাই কাঠি,
একটা দড়ির ফাঁস,
কোনও অস্ত্র অথবা
তোমার শরীর—
কিছুই তাকে মারতে পারে না।
সে গান হয়ে যায়,
বেদনা আর বাঁচতে চাওয়ার গান।
হাওয়ায় হাওয়ায়, আগুনে আগুনে,
সমুদ্রে, তুফানে,
লজ্জায় অপমানে আর লাঞ্ছনায়,
তোমার স্মৃতিতে, তোমার আত্মায়,
সে গান হয়ে যায়,
নিস্তব্ধতায়,
যে গান তোমার নিঃশ্বাসের মতোই
সারা জীবন ধরে গড়ে ওঠা
আর ভেঙে যাওয়া

ত্রেতা থেকে দ্বাপর
দ্বাপর থেকে কলি
নিজের ভেতরে
নিজের বরাদ্দ মৃত্যুকে
নিজেরই জন্যে
একটু একটু করে খরচ করে নারী

সে কখনও হঠাৎ মরে না।

নোয়া হফেনবার্গের পাঁচটি কবিতা

কিচ্ছু না সম্পর্কে তোমাদের যা যা জানা দরকার

একজন লেখক ছিলেন যাঁর লেখার কিছু ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লিখতেন কেননা লেখার ব্যাপারটা একটা প্রক্রিয়া, কোনও পণ্য-উৎপাদন নয়।

অতএব তিনি লিখলেন এবং লেখাটা একটা প্রক্রিয়া ছাড়া কিছুই হলো না।

তবুও, যেভাবেই হোক, প্রক্রিয়াটি রূপান্তরিত হলো একটি ৭০০ পৃষ্ঠা সংবলিত পাণ্ডুলিপির পণ্যে, যা ছিল দারুণ বিক্রয়যোগ্য। সেটা এক লেখককে নিয়ে লেখা একটা উপন্যাস, যাঁর কিছুই লেখার ছিল না।

তিনি প্রক্রিয়াটি শেষ করার প্রায় অব্যবহিত পরেই সেটা প্রকাশিত হলো এক বড়সড় প্রকাশনা থেকে। সম্পাদকরা চটপট তার নামকরণ করলেন *কিচ্ছু না*।

ভূয়সী প্রশংসা করে সমালোচকরা তাকে নব্য ক্লাসিক আখ্যা দিলেন, কেননা সেটা প্রথাগত বিষয় ও আঙ্গিককে ভেঙেচুরে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। *কিচ্ছু না* আঙ্গিক হিসেবে ব্যবহার করেছিল আঙ্গিকহীনতাকে, উদ্দেশ্যহীন একটা প্রক্রিয়ার সহ-উৎপাদিত পণ্য।

শেষমেশ জনগণও বেশ অনেক সপ্তাহ ধরে *কিচ্ছু না* নিয়ে খুব হইচই করল। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের বেস্ট সেলার লিস্টে *কিচ্ছু না* উঠে গেল একেবারে এক নম্বরে। সেখানে বইটা টানা ১০৮ সপ্তাহ থাকার ফলে লেখকের বিলক্ষণ দু'পয়সা আয়ও হলো।

কিচ্ছু না লিখে ফেলার পর দু'বছর যাবৎ কিচ্ছু না লেখার পর, আর রয়্যালটির সব টাকা উড়িয়ে ফেলার দরুণ, এবং গুণমুগ্ধদের ক্রমাগত কান্নাকাটিতে বাধ্য হয়ে, লেখক আরেকবার লেখার রাস্তা দেখলেন। একটা যাত্রা, যার কোনও লক্ষ্য নেই। একটা লেখার প্রক্রিয়া, যার কোনও ফলাফল নেই।

এবার তিনি সত্যিই কিচ্ছু না সম্বন্ধেই লিখলেন। বস্তুত, তিনি আদৌ কিছু লিখলেন না, আর কিচ্ছু না বিষয়ে তাঁর সমস্ত লেখকসুলভ চিন্তাভাবনা রেখে দিলেন নিজের ভেতরে।

শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর কিচ্ছু না লেখা সাঙ্গ হলো, তিনি কিচ্ছু না বিষয়ে একটা ৭০০ ফাঁকা পৃষ্ঠা সংবলিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সম্পাদকদের কাছে। তাঁরা যথেষ্ট সম্পাদকীয় আহ্লাদের সঙ্গে এর নাম রাখলেন *একেবারে কিচ্ছু না*।

সমালোচকরা লেখকের *একেবারে কিচ্ছু না* নিয়ে এবারেও প্রচুর ভালো ভালো কথা বললেন। পাবলিশার্স উইকলি বলল : "যেমন করেই হোক, লেখক কিন্তু নব্য ও পরীক্ষামূলক ঝাঁকুনি-সংস্কৃতি এবং সত্যিকারের কিচ্ছু না-র মধ্যেকার বিপজ্জনক খাদটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।"

জনগণ এতটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি যদিও, আর বিক্রিবাটাও মার খেয়ে গেছিল।

বুদ্ধ-হত্যা

সেই প্রাচীন জাপানি প্রবাদে আছে : *যদি তুমি বুদ্ধকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দ্যাখো, তাকে হত্যা করো।*

বেশিরভাগ তাত্ত্বিকই খুব সহজে এর মানে করবেন এই যে, যদি কেউ বুদ্ধকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে থাকে, সেটা তার কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়, কেননা বুদ্ধ মানুষের ধারণার অতীত। পার্থিব জগতে বুদ্ধের যে কোনওরকম আবির্ভাব, সেহেতু, কেবলমাত্র বাঁদুরে বুদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ, বিশ্বজনীন মতবাদের নয়।

প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধ বিষয়ে *চিন্তা*-কেই হত্যা করা উচিত।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রায় দুই সহস্রাব্দ আগে, একটি লোক বুদ্ধকে হেঁটে যেতে দেখেছিল জেরুজালেমের রাস্তায়।

এই বুদ্ধ মানবদেহে আধৃত আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত উত্তরণ. তিনি পরে ছিলেন মেহনতি মানুষের সাধারণ আলখাল্লা, আর তাঁর হাতে ছিল স্বর্গ মর্ত্য উভয়ের প্রতি আশীর্বাদের মুদ্রা।

একইরকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এই যে, যে লোকটি বুদ্ধকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিল, সেও শুনেছিল পূর্বোল্লেখিত প্রবাদটি। সে নিশ্চিত করেছিল সেই নিখুঁত সত্তাটির দ্রুত আর জরুরি হনন।

ক্রুশবিদ্ধ দেহটির নীচে গোলমাল হচ্ছিল খুব।

সেইটাই শেষবার, যখন ইহুদিরা কোনও জাপানি প্রবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

সেই লোকটি, যে তার নিজের পাশে ছিল

একটি লোক ছিল, যে তার নিজের পাশেই থাকত। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, তার ভৌত অবয়বটি দাঁড়িয়ে থাকত তার অদৃশ্য সচেতন অস্তিত্ব থেকে কমবেশি তিন ফুট ডানদিকে।

লোকটি তার নিজের পাশে থাকত সর্বদাই, কেবলমাত্র ক্রোধে কিংবা ঈর্ষায় কিংবা আনন্দেই নয়— প্রাচীন প্রবাদে যেমনটা করতে বলা হয়েছিল।

লোকটির দ্বৈত সত্তা বিশেষ কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠত তার ভৌত শরীরের সঙ্গম কিংবা কথোপকথনে "অংশগ্রহণ"- এর সময়। এটা ছিল সেরকম একটা সময় যখন নিজের পাশে থাকা সেই লোকটির স্বচ্ছ অংশটিকে দেখা যেত বৃথাই অভ্যাস করছে কীভাবে সাজিয়ে রাখা দেখনদারি জিনিসগুলোকে হাত না লাগিয়েই এদিক ওদিক সরানো যেতে পারে যাকে বলে টেলিকাইনেসিস, কিংবা শব্দছক কষছে নিউ ইয়র্ক টাইম্সের রোববারের পাতায়, অথবা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরিশিষ্ট বাতলে দিচ্ছে নিঃশব্দে, যেখানে সবকিছুই আপেক্ষিক।

তার প্রাক্তন বান্ধবীদের মধ্যে অনেকেই তার এই অবস্থার উল্লেখ করেছিল একটিমাত্র বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে : দূরবর্তী।

এই মহিলারা লোকটির পরিস্থিতি সম্বন্ধে আদৌ যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিল না। তা সত্ত্বেও, সেই লোকটি যে কিনা তার নিজের পাশে ছিল, ঘটনাচক্রে বুঝে ফেলেছিল জুয়াতে তার দারুণ প্রতিভা।

খুব শিগগির সে জুয়ার ঠেক থেকে জমিয়ে ফেলেছিল যে কোনও হাবাগোবা তাস-গণনাকারীর থেকে বেশি পয়সা, (আপেক্ষিক) প্রেম করেছিল লাস ভেগাসের রঙ্গিনীদের সঙ্গে, এবং, কাসতানেদার ডন জুয়ানের মতো, তার মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখেছিল দশ লক্ষ মাইল দূর থেকে।

আমার মায়ের কেটে ফেলা স্তনের গোপন জীবন

পাঁচবছর আগে আমার মা হারিয়েছিলেন তাঁর একটি স্তনকে। প্রাথমিকভাবে সেটিকে তুলে ধরেছিলেন একজন তলেতলে-হাত-চালানো চিকিৎসক, যথাযথভাবে বলতে গেলে একজন ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ।

এরকম একটা গুজব রটেছিল যে, কেটে বাদ দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই, আমার মায়ের স্তনটি, উত্তপ্ত, নেমে পড়েছিল রাস্তায়। নোংরা চোরাবাজারি আর বন্ধকের কারবারিরা আমার মায়ের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে —এই চিন্তা আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল।

একবার স্কুল যাওয়ার পথে আমি এক মিনিটের জন্যে নেমে পড়েছিলাম গাড়ি থেকে, আর আমাদের সীমাহীন ক্ষতির কথা ভেবে কেঁদেছিলাম খুব।

কল্পনা করো : সেই বৃন্তটি, যা থেকে আমার ভাই এবং আমি (সেইসঙ্গে সম্ভবত আমার বাবাও, তবে জীবনধারণের চেয়ে কম জরুরি অন্য কোনও কারণবশত) চুষে নিতাম জীবনের টকমিষ্টি দুধ। এই বেজন্মাগুলোর কী চাওয়ার ছিল আমার মায়ের স্তনের কাছে? ওরা কি তাকে দেখাতে চেয়েছিল অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনে, নাকি নিজেদের ঘরে নিরিবিলিতে বসে স্তন্যপান করতে চেয়েছিল? ওটা এখন আছে কোথায়?

আমার বিশ্বাস করতে সাধ যায় সন্ধের খবরপড়ায়, যেখানে বহু বিশ্বস্ত সাক্ষীর সমর্থিত সূত্রে প্রকাশ — আমার মায়ের স্তনকে নাকি সাতটি মহাদেশেই নিপীড়িত জনসাধারণকে তরল সফেদ জীবনের স্তন্যপান করাতে দেখা গেছে। হাসপাতালের সৎকারকক্ষে বৃন্তটিকে ঠাণ্ডা মাথায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল — এমন সম্ভাবনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি কোনও দিন হাল ছাড়ব না; হার মানব না কোনও দিন।

আমি শুধু ভেবে পাই না, খুঁজে পাবার পর, শেষপর্যন্ত আমি কী বলব সেই স্তনটিকে, কীই বা করব তাকে নিয়ে।

জীবিত ও মৃত

জীবিত এবং মৃতের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মৃতরা কিছু মনে করে না যদি পোকারা হেঁটে বেড়াতে থাকে তার যৌনাঙ্গ বেয়ে।

আমি মনে করি : অতএব, আমি জীবিত।

বিক্রম শেঠের দশটি কবিতা

তোমরা যারা ঘুমোচ্ছ আজ রাতে

তোমরা যারা ঘুমোচ্ছ আজ রাতে
প্রিয়জনের থেকে অনেক দূরে,
ডাইনে বাঁয়ে হাত ঠেকে না হাতে,
ফাঁকা, শুধু ফাঁকাই আকাশ জুড়ে

জেনো, তুমি কক্ষনো নও একা।
জগৎ তোমার অশ্রু-ভাগীদার,
কারুর সঙ্গে দু'এক রাতের দেখা,
কারুর সঙ্গে সারা জীবন পার।

হাওয়া

শুভ্রতার কুচি মেখে সমুদ্র হয়েছে খুব ঘন।
হিমেল বাতাস, সেও ধারালো ও সূক্ষ্ম বড় বেশি।
চিলেরা জেনেছে আজ রাতভর পাথরে ঘুমনো,
ডানা চেপে আটকে রাখা তীব্র হাওয়া, হনন-অন্বেষী।
মনের মতোন কেউ সঙ্গে নেই, একা, বন্ধুহীন,
বাতাসের বিপরীতে, অর্থাৎ যেমন হয়ে থাকে,

আমি হাঁটি, হেঁটে যাই, একাকীত্ব-দ্বীপে অন্তরীণ
হাওয়াকে সম্মান করি, ধাক্কাটুকু যে দেয় আমাকে।

স্বর

মাথার ভেতরে শব্দের ছোটাছুটি,
মন্ত্র পড়ছে, — "চুম্বন। রুজিরুটি।
নিজেকে প্রমাণ করো। লড়ো। দাও ধাক্কা।
শেখো। আয় করো। দ্যাখো প্রেমে জিৎ আজ কার।"

অন্য একটা স্বরকে ডোবাও অতলে।
স্বেচ্ছায় চুপ, তবু শোনো স্বর কী বলে :
"শান্তিতে নাও শ্বাস, আর অন্তত
একবার স্থির দাঁড়াও আমার মতো।"

হ্যান শান মন্দিরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

আঙুল ঘুরিয়ে চলে তাঁর অন্ধকার জপমালা
করতাল বেজে ওঠে থেকে থেকে, আবার, আবার,
পিটপিটিয়ে ওঠে চোখ, সামনে ক্যামেরার আলো জ্বালা
ছবি তোলে একদল ব্যাজার জাপানি ব্যবসাদার।
ওরা চলে গেলে তিনি হাসিমুখে ফেরেন এদিকে,
জানতে চান, — "আচ্ছা, ভারতীয়রা কি নিঃসম্বল?
তারা কি সবাই বৌদ্ধ?" বলতে বলতে যেন জনান্তিকে
বলেন তাদের গল্প, যারা ছিল 'চারজনের দল'।
"দশবছর — নির্বাসিত ছিলাম"—সুদূর দৃষ্টিপাতে
গভীর ধ্যানের মধ্যে তাকিয়ে থাকেন কোনও মুখে,
যে মুখ সোনালী, শান্ত, শোকে তাপে নির্বিকার, যাতে
যন্ত্রণা, বয়স, মৃত্যু, ধ্বংস, অপমান আছে ঝুঁকে—

তারপর আমার এই হতভম্ব চোখ দেখে, ফিরে
নিজেকে নামান ফের জাগতিক তুচ্ছতার ভিড়ে।

ভুল

হেসেছি তোমার চোখে চোখ ফেলে, কেননা তোমাকে
ভেবেছি আরেকজন; তুমি হাসলে; আর সেই ফাঁকে
দু'জনের মধ্যে কিছু গড়ে ওঠে লাইব্রেরি ঘরে
কিছু, যাকে মনে হয় প্রেমই; কিন্তু আমার ওপরে
তোমার প্রণয় (যদি তা-ই বলা যায়)— কী কারণে—
কেননা, আমাকে তুমি অন্য কেউ ভেবেছিলে মনে।

শেষমেশ দু'জনেই বুঝে ফেলি গেছিলাম ফেঁসে
প্রথম সে চাহনিতে, সে প্রথম ভুল হাসি হেসে!

কিছুখন তুমি না হয় রহিলে কাছে

বোসো, একটু কফি খাও; নাহয় সমস্ত কাজ অপেক্ষা করুক একটুখানি।
এখনও তোমার সামনে সারাটা জীবন পড়ে, ছাব্বিশে পড়েছ তুমি সবে।
না, কোনও চাতুর্য নয়; সাদামাটা, সাধারণ কথা বলো, আমি তুলে আনি
কথার উত্তরে ঠিক কথাগুলি, কিংবা ধরো, শুধু হেসে উঠি উচ্চরবে।

পৃথিবী অস্বচ্ছ বড়, যন্ত্রণাদায়ক, আর সুতীব্র, প্রবল।
কুড়িমিনিটের এই দেখা হওয়া—এটুকুই সমস্ত দিনের সার্থকতা:
এইখানে এই রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকা, চতুর্দিকে শকুনের দল,
পুঁতি পুঁতি চোখ মেলে চেয়ে আছে। দুই ফুট দূরে তুমি, আর কিছু কথা।

দূর থেকে

অনেকটা দূরত্ব থেকে ইচ্ছে রাখি তোমার কুশলে।
তোমাকে কিছুই যেন ভাবিয়ে না তোলে ঘুম ছাড়া।
যেন কখনও না বোঝো কী কী আমি চলেছি না বলে।
কখনও না খাও যেন স্বপ্ন কিংবা সন্দেহের তাড়া।

এই শান্তিহীন দিনে যা লিখেছে আমার কলম
যেন কখনও না সেই পৃষ্ঠা পড়ে তোমার নজরে
ততদিন—যতদিনে পরে-ছাপা-হওয়া এই শ্রম
দেখে বলবে, তুমি নয়, ও অন্যের সঙ্গে গল্প করে।

এক্ষুনি

খুব শিগগির মরে যাব, আমি জানি।
আমার রক্তে এ জিনিস প্রবাহিত।
পালানো শক্ত এড়িয়ে এ টানাটানি।
আমারই কোষের রস তার অমৃত।

আমার রাত্রি ভিজিয়ে তোলে সে ঘামে
নিয়ে আসে দিন বেদনায় জরোজরো।
কোন্ হাতে কোন্ ওষুধে এ জ্বর নামে—
শরীর জানে না আরাম তেমনতরো।

প্রেম ছিল সেই অবাক সূত্রপাত
সে-ই বুনেছিল যন্ত্রণা তার বীজে,
ঠিক থাকে যেন ফসলের জমি, জাত—
লাভ সেইমতো নিয়ম বেঁধেছে নিজে।

আমি যাকে ভালোবাসি, ভাগ্যিস প্রভু,
কখনও বলে না সেরে উঠবার কথা।

তাতে তো আমার আরোগ্য নেই। তবু,
সে দেখে আমার নিশ্চিত প্রবণতা।

সে জানে আমার পড়া হয়ে গেছে সব
আর, সে আমাকে মিথ্যেও বলবে না।
আমাকে নয়, সে দেখছে আমার শব।
তার চোখে সেই দৃষ্টি আমার চেনা।

জানিনা কীভাবে পেরোব এ পথ-চলা—
কীভাবে সইব এই অদ্ভুত স্বাদ,
মাছেদের শাদা ডিমে ভরে গেছে গলা—
এই হাত — তার ঝাঁকুনি ও অবসাদ।

হাসপাতালের বিছানার ধারে ঝুঁকে
ছোঁও এই দেহ, শায়িত ও প্রাণহীন।
ভালোবাসা রাখো আমার নিথর মুখে,
আর, মরে যেতে দিও নাকো কোনও দিন।

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অনেক হেঁটেছি কাল রাতে
যে বাড়িতে আমাদের প্রথম আলাপ, তার পাশে,
পরিচিত প্রতি ঝোপ, প্রতি বাঁক হাতড়াতে হাতড়াতে।
চাঁদ উঠেছিল, তার ভিজে জ্যোৎস্না পড়েছিল ঘাসে।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি যতক্ষণ হেঁটেছি দু'জনে
সহজ বিষাদে। হাতে হাত ধরে রেখেছি যদিও
কথা বলিনিকো। হাত ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে গোপনে,
তবু হেঁটে গেছি যেন সেটুকুই ছিল করণীয়।

আমরা তো করিনি কোনও বাক্য কিংবা অশ্রু বিনিময়।
প্রকাশ করিনি ক্ষোভ মরে আসা চাঁদের আলোতে।

কতটা কী বদলে দিল আমাদের দু'টুকরো সময়
সেসব মাপার মতো ইচ্ছেটাই হচ্ছিল না মোটে।

আলো নিভে গেল। যারা ও বাড়িতে রয়েছে এখন,
ভাড়া গুনে গেছে আর দেখেছে বসন্ত আসে যায়
জীবনে কখনও আর শুধাবে না 'কী?' বা 'কেমন?'
তাদের, যাদের নেই জানার তেমন কোনও দায়।

জিয়াংনিঙে এক রাত

এক গেলাস চা; আর চাঁদ;
ব্যাঙ ডাকছে আগাছা জঙ্গলে।
ডানা মুচড়ে বাদুড় লাফাল
চাঁদ থেকে রুপো রুপো জলে।

দূরবর্তী বাতিদের আভা।
ধানকলে ঘর্ঘর আওয়াজ।
একা একা থাকার আরাম।
গন্ধে বুঝি, বৃষ্টি হবে আজ।

সি. পি. সুরেন্দ্রনের দশটি কবিতা

সম্ভাবনা

যতক্ষণ তোমরা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলে,

একটা কুকুর হাই তুলল রোদ্দুরে

আর দূরে কোথাও
কোনও এক সুড়ঙ্গে অন্ধ হয়ে যাওয়া

একটা ট্রেন
একের পর এক জানলায়
ফিরে পেল তার দৃষ্টি।

এই সব কিছুর কথাই আমি ভেবেছিলাম
যা ঘটতে পারত
যতক্ষণ তোমরা তাকিয়ে ছিলে অন্যদিকে,

পলক ফেলতে না ফেলতে হারিয়ে যায় যতটুকু ব্রহ্মাণ্ড।

নির্বাসন এবং সেই রাজ্যটি

যখন মেয়েটির কাচাকুচি সারা হয়ে যায়, সে দাঁড়ায়
হাওয়ায় হেলান দিয়ে, হাতে উঁচু করে
ধরা একটা শাদা শাড়ি, ধোয়া ও নিংড়ানো,
যেন তার মাথার ওপরে একটা পতাকা।
হাওয়া তাকে খুলে দিতে থাকে পাকে পাকে,
তার আঙুল থেকে বয়ে আসা এক শুভ্রতার নদী,
আলো-নদীর ওপর, জ্যোৎস্নাভেজা শাদা
সফেদ ও ভাসমান মেঘ, নক্ষত্ররাও সরে সরে যায়
গাছের ফাঁকে ফাঁকে, সেই শাড়ির ওপর দিয়ে,
ওই পতাকা
সবচাইতে অনুপুঙ্খ মানচিত্র থেকেও
নির্বাসিত কোনও রাজ্যের।

পুরুষটি দেখতে থাকে
জেগে উঠছে একটা গোটা গণতন্ত্র,

বহুদূর থেকে ত্রাণশিবিরের দিকে
নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে এক উদ্বাস্তু।

সাশ্রয়

নতুন হাফপ্যান্টটা মাপে বড়, এটা কেনা হয়েছে
বড় মাপের তার জন্যে, যা হতে তার
আরও দু'বছর লেগে যাবে। এটাকেই তার মা বলে, সাশ্রয়।

সে একটা বেল্‌ট খুঁজছে ওই সাশ্রয়ের ব্যাপারটা
মাথায় রেখেই। আমি রান্নাঘরে ওরকম একটা বেল্‌ট
দেখেছি, তার এক তুতো ভাই জানায়।

রান্নাঘরে,
নিচু কড়িকাঠ থেকে বেল্‌টটা ঝুলছে।

সে একটা চেয়ার টেনে আনে, হাত বাড়ায়।
সেটা তার হাতে আসে হিসহিসিয়ে, কালো আর ভারী, একটা
সাপ,
একটা বাজনা যা কাঁপিয়ে দেয় তার চেয়ার।

সে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে,
এক নড়বড়ে পৃথিবীর কানা ঘেঁষে
আতঙ্ক আর নগ্ন চাহিদার মধ্যে
চেষ্টা করে ভারসাম্য রাখার

আর তার ঢিলে হাফপ্যান্ট
যবনিকার মতো খসে পড়ে তার গোড়ালিতে।

মহৎ যন্ত্রণা

ছ'তলার নীচে গুঁড়ি মেরে এগনো রাস্তায়
সারাদিনের নানান ঘটনার জপমালা থেকে
ছড়িয়ে পড়া পুঁতির মতো
কালো পোশাক পরা তিনজন সন্ন্যাসিনী

গড়িয়ে যাচ্ছেন
আশ্রমের ক্রুশটির দিকে
যার ছায়া
তাঁদের সবাইকে পেরেকে বিঁধিয়ে রাখে
এক প্রাচীন যন্ত্রণার
পরবর্তী আভায়।

ঘাটতিপূরণ

খরগোশের মতো শাদা একটা নদী
ছিটকে ওঠে আমার ফুলে ওঠা পায়ের পাতা থেকে
পায়ের পাতাজোড়া, যা ঢেকে আছে অন্ধকারে।
যেখানে যেখানে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই অন্ধকার।

নদীটি লাফিয়ে পেরোয় নিচু পাহাড়
দ্রুতপায়ে ফিরে আসে রেললাইনের নীচে
আর, একটা পাথর থেকে আমাকে লক্ষ করে
লাফিয়ে উঠতে থাকে ক্রমাগত।

আমি তলিয়ে যাই আবার ভেসে উঠি
আমার নখ চকচক করতে থাকে, শাদা,
যেখানে যেখানে আমি যাব, তার আলোয়।

সৈনিক

দু'দিকে গাছের সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে
ট্রেনে চেপে ফিরতে ফিরতে
আমার পাশে পাশে ঝলসে ওঠে সেই নদী
সবুজের অনিঃশেষ খাপ থেকে
অনন্তকাল ধরে টেনে বার করতে থাকা এক তলোয়ার।

শত্রু

আমি সবেমাত্র ফিরে এসেছিলাম সেই লড়াইটা থেকে
ফিরে এসেছিলাম তেল দিতে নিজের চরকায়, আর বিয়ার গিলতে।
তখন সেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলো
যে কবিতা লিখেছিল কাগজের ন্যাপকিনের
উলটোদিকে, টমেটো কেচাপ দিয়ে।
সে বলল,
আমাকে দেখাও তোমার হৃদয়।
আমার ওসব নেই, আমি বললাম।
তবু সে বলেছিল, হৃদয়ই সেই জিনিস
যা তাকে চাগিয়ে দিতে পারে।

শেষমেশ আমি খুঁড়ে তুললাম সেই পুরনো, কালো পদার্থটা।

আর মেয়েটি বলে উঠল, আহা, এটা তো একটা গ্রেনেড।

আমি তোমাকে বলেছিলাম—বললাম আমি, আর
কামড় দিলাম সেই পেরেকে।

একটি নিরুদ্দিষ্ট বালকের কাহিনী

আমার পায়ের আঙুলগুলো যখন গুটিয়ে যেত,
জেগে উঠত পাহাড়পর্বত।

আমি যখন আড়মোড়া ভাঙতাম, ঢেউ উঠত নদীতে।
যেই আমি বেরিয়ে পড়তাম, টগবগিয়ে উঠত পৃথিবী।
আমি আম পাড়তাম, আমার মুঠোর মধ্যে
ফুলে উঠত ঋতু।

আমি লজেন্স চুরি করতাম, আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ত
আমার মুখের ভেতর।

আমি মিলিত হতাম, আয়নারা অন্ধ হয়ে যেত

আমি বিশ্রাম করতাম, হাওয়া উড়িয়ে আনত মালিশওয়ালাদের।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ফের, আর
হারিয়ে গেল একটা বাচ্চা।

স্বাদগন্ধ

সেই দুধে কিছু একটা ছিল
যা আমি খেলা-ইস্কুলে খেতাম।
বাড়ি থেকে নিয়ে যেতাম সেটা
একটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্লাস্কে করে

তুমি দু'হাতে ধরে থাকতে ফ্লাস্কটা

আর দুধ ঢেলে দিতে
সেই কোলাহলের মাঝখানে
ব্রোঞ্জের তৈরি গেলাসের গলা বেয়ে।

কে ধুতো ওই গেলাসটা?

আমার কিন্তু মনে পড়ে
আমার দু'হাত ভর্তি দুধ

আর কীভাবে তার ধাতব স্বাদ
নিস্তব্ধ করে তুলত পৃথিবীকে।

যতি

পাগলা কুকুর
ছুটে যাচ্ছে ট্রাফিক ভেদ করে
কাঁপতে কাঁপতে
পেছন ফিরে তাকাল একবার
তার পিছু পিছু ধাওয়া করে যাওয়া
অনিবার্য দুর্ঘটনাটির দিকে।

গ্রন্থ পরিচয়

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে

প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ : মামাই, বাবাই, দাদাই-কে
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন
পৃষ্ঠা : ৬৪

বলো অন্যভাবে

প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ : বুব্‌লাইকে
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী
পৃষ্ঠা : ৬৪

ছদ্মপুরাণ

প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ : শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - গভীর শ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী
পৃষ্ঠা : ৮০

এ সবই রাতের চিহ্ন

প্রকাশক : সপ্তর্ষি প্রকাশন

উৎসর্গ : কুণাল কিশোর ঘোষ, শ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রচ্ছদ : চন্দনী বসু (প্রথম সংস্করণ), মন্দাক্রান্তা সেন (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা : ৪৮

আকাশভরা বন্ধুতারা

প্রকাশক : কিশলয় প্রকাশন

উৎসর্গ : বুবলাই বেবিকে
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা : ৪০

উৎসারিত আলো

প্রকাশক : পত্রলেখা

উৎসর্গ : মা, তোমাকে
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী
পৃষ্ঠা : ৫০

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি